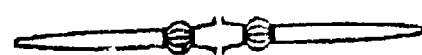
রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

~ रामचन्द्र ओ जरथुस्त्र





শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.

মূল্য ।৵০ আনা

গায়ত্রী।

১। দৈবী (অথবা ভারতীয়)

ধী = প্রজ্ঞা

ওঁ তৎ সবিতুর্ বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি,
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ

সবিতার (জগৎস্রষ্টার) ভর্গই (বিভূতিই) আমাদের অন্তরে প্রজ্ঞারূপে (Conscience—বিবেক) অবস্থিত, উহার অনুবর্ত্তনই জীবনের সাধনা। আমরা যেন নিরন্তর সেই ভর্গের ধ্যান করি।

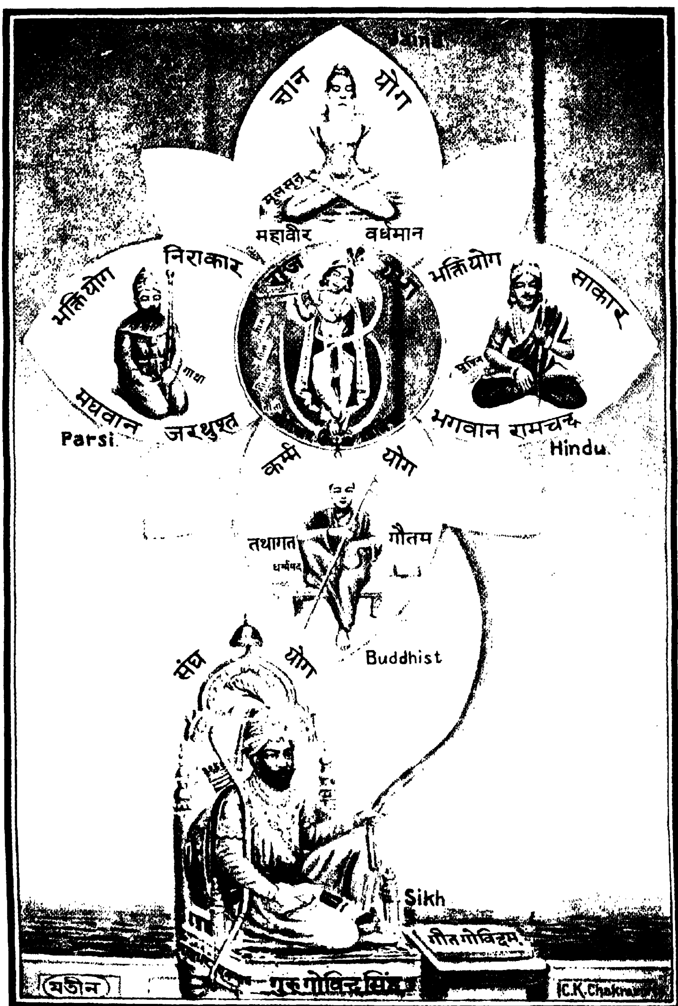
২। আসুরী (অথবা ঈরাণীয়)।

ওঁ যথা অহু বর্য্যো অথা রতুশ্, অষাৎ চিৎ হচা,
বংহেউশ্ দজ্দা মনংহো, শ্যওথননাম্ অংহেউশ্ মজ্দাই,
ক্ষথ্রং চ অহুরাই আ।
যিম্ দ্রিগুব্যো দদাৎ বাস্তারেম্॥ ওঁ

বহুমনস্ = প্রজ্ঞা
ক্ষথ্র = তিতিক্ষা

ধর্ম্মসাধনার জন্য যেমন প্রভু (অহু) তেমন গুরুও (রতু) আমাদের নমস্য। কারণ অহুর মজদার অভিপ্রেত জীবন যাপনের জন্য, রতুই আমাদিগকে প্রজ্ঞা (বহু-মনস্) ও তিতিক্ষার (ক্ষথ্র) কথা জানাইয়া দেন। উহারাই দুর্ব্বলের বল। ঈশ্বর ও অবতারকে স্মরণ করিয়া প্রজ্ঞা ও তিতিক্ষার অবলম্বনই জীবনের সাধনা।

धर्म्मराज्ञाम् तीर्थङ्कराः पञ्च वेदान्तशासकाः



धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् ।
महाजनो येन गतः स पन्था ॥

মুখবন্ধ

"রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র" পুস্তকখানি পড়িয়া লেখকের ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপর অগাধ অধিকার দর্শনে বিস্মিত হইয়াছি। ধর্ম্মের বহু বিভাগে এরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বান্বেষীর সুচিন্তিত গবেষণা-মূলক সন্দর্ভের উপর কোন কথা বলার স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমি শিক্ষার্থীর ন্যায় বিনীত ভাবেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। ইহাকে একটি রত্নের খনি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বেদ, উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ হইতে মহাভারতাদি পুরাণের সমস্ত তত্ত্ব লেখক যেন নখ দর্পনে দেখিয়া বই খানি লিখিয়াছেন। আমাকে একটি ভূমিকা লিখিতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু ভূমিকা অর্থ যদি পরিচয় পত্র হয়, তবে আমি সে ভার গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তবে একটি মেটে প্রদীপ হাতে লইয়া আমি পাঠককে এই বহু রত্নের খনির সন্ধান দিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জহুরী, তাঁহারা এই রত্ন-গুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

একটি কথা আমার বিশেষ করিয়া মনে হইয়াছে, এই পুস্তকে যে পাণ্ডিত্য ও গবেষণা শক্তি প্রদর্শিত তাহা সম্পূর্ণরূপ বিজ্ঞান-সঙ্গত এবং আধুনিক রীতি অনুযায়ী বহু প্রমাণ ও টীকা টিপ্পনী সহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের সঙ্গে ইহার প্রভেদ এই যে তিনি অসার খোলসটা লইয়া বিদ্যাবত্তা প্রদর্শনের চেষ্টা করিতে যাইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মের কথা বাদ দিয়া যান নাই। তিনি সমস্ত হৃদয়ের দরদ দিয়া শাস্ত্রের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এজন্য বিষয়গুলি জটিল ও গুরুতর হইলেও সাধারণ পাঠকের নিকট বই খানি ক্লান্তিকর মনে হইবে না। একটা সজীব রসের ধারা ইহার সর্ব্বত্র বহিয়া গিয়াছে। বই পড়িতে পড়িতে মনে হইবে যেন কোন পাঠক ঠাকুর বেদীতে বসিয়া বহু জন মণ্ডলীর নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং শ্রোতারা তাঁহার ভক্তি মাখা কণ্ঠের আবেগে তাহা স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে।

আর একটি সুখের কথা এই যে লেখক মহাশয়ের ন্যায় শাস্ত্রের মর্ম্ম-সন্ধান যে বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান কলুষিত রুচির যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা সত্য সত্য একটা শুভপ্রদ লক্ষণ। রাজকীয় গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও যে এই তরুণ লেখক প্রবীণের মত হিন্দুর চিরন্তণ অবলম্বন ধর্ম্মতত্ত্বের পথে আসিয়াছেন, তাহা যেমন গৌরবের বিষয়, তেমনি আশাপ্রদ।

বেহালা, কলিকাতা
৩-১১-৩৬।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ওঁ তৎ সৎ।

ভূমিকা।

প্রথম সংস্করণ

মত্স্য-কূর্ম্ম-বরাহশ্চ-নৃসিংহঃ বামনস্তথা।
জমদগ্নিঃ রামঃ কৃষ্ণঃ জিনো বুদ্ধোঽপি কল্কিঃ স॥

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ও রামচন্দ্রের ন্যায়, ধর্ম্মরাজ জরথুস্ত্রও আর্য্যজাতিরই আর একজন শ্রেষ্ঠ তীর্থঙ্কর,—মুখ্য অবতার। অথচ তাহার বিষয়ে আমরা কত অল্প জানি।

পয়ঘম্বরদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা পারসিক সাহিত্যের প্রচলিত প্রথা। প্রথমতঃ যাহাদের আম্নায় কোনও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; যেমন কোরাণে মহম্মদের, কিম্বা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের। দ্বিতীয়তঃ যাহারা পয়ঘম্বর বটেন, কিন্তু কোনও "প্রেরিত পুস্তক" লইয়া অবতীর্ণ হন নাই। যেমন দত্তাত্রেয়, বামন, কিম্বা ইব্রাহিম।

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মপদের ন্যায়, জরথুস্ত্রের গাথা, নিঃশ্রেয়সের তামস পথে উজ্জ্বল প্রদীপসদৃশ। জরথুস্ত্রের পয়ঘম বা অনুশাসন কী, তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। উহার সাক্ষাৎ প্রমাণরূপে গাথাই বর্ত্তমান। গাথাই জরথুস্ত্রের পয়ঘম-বরত্বের প্রমাণ। তিনি প্রথম শ্রেণীর পয়ঘম্-বর।

জরথুস্ত্রের ঐতিকহাসিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন প্রসিদ্ধ আমেরিকান পণ্ডিত Jackson, তাহার Zaroaster—The prophet of Ancient Iran নামক গ্রন্থে। তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বিশপ Moulton, তাহার (১) Treasure of the Magi ও (২) Teachings of Zarathusthra নামক গ্রন্থদ্বয়ে। Moulton সাহেবের Early Zaroastrianism নামক পুস্তকে গাথার যে অনুবাদ আছে, প্রচলিত অনুবাদগুলির মধ্যে তাহাই উত্তম।

কিন্তু তাহা বিলাতী গন্ধে দূষিত। অর্থাৎ জরথুস্ত্র যে জেন্দ সাহিত্যে "অথর্ব্বান"* উপাধিতে বিভূষিত,—অথর্ব্ববেদের ঋষি—তিনি যে যজ্ঞসূত্রধারী, গো-সেবানিরত, অগ্নিহোত্রী ঋত্বিক্, এককথায় গাথা যে বৈদিক কৃষ্টির অঙ্গ, বেদের প্রস্থান, এ অনুবাদে তাহার পরিচয় নাই। সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশস্থ নবসারি নগরের চেরাগ-আফিস হইতে গাথার একখানা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অনুবাদে বৈদিক সাহিত্যের সহিত গাথার ভাবধারার ঐক্য দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ গাথার মূল এ পর্য্যন্ত কেবল জেন্দ, ইংরেজী, ও গুজরাতি লিপিতেই মুদ্রিত ছিল; কথিত সংস্করণ দেবনাগরী লিপিতে মুদ্রিত হওয়ায়, গাথার মূলের সহিত পাঠকসাধারণের পরিচয় ঘটিবার সুযোগও প্রশস্ত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধপাঠে, ধর্ম্মরাজ জরথুস্ত্র ও তাঁহার উদানের সহিত পরিচিত হইবার কৌতূহল যদি কাহারও মনে জাগে, তবে এই রচনা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

হিন্দুর ধর্ম্ম বিষ্ণু-যজ্ঞ। পার্শীর ধর্ম্ম মজদা-যস্ন। যজ্ঞ ও যস্ন একই 'যজ' ধাতু হইতে 'ন' প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ। উভয়েরই অর্থ আরাধনা। একটী সাকার-নিষ্ঠ, অপরটী নিরাকারনিষ্ঠ। অর্থাৎ বিষ্ণু সাকার, মজ্দা নিরাকার। প্রভেদ থাকিলেই বিবাদ থাকে না। বিষ্ণু-যজ্ঞে ও মজ্দাযস্নে পার্থক্য ছিল, কলহ ছিল না। এই দুই পন্থা ইরানে দেবযস্ন ও মজ্দা-যস্ন, আর ভারতে দেব যান ও পিতৃযান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নিরাকারোপাসনাই পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল; তাহাই পূর্ব্বপুরুষের পথ—পিতৃযান। সাকারোপাসনা পরে প্রবর্ত্তিত হয়। বিষ্ণুর খর্ব্ব (Limited) আকৃতি দেখিয়া, অসুরোপাসকগণ ভ্রান্ত হইয়াছিল; তিনি যে ত্রিলোক ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন তাহা বুঝিতে পারে নাই। অসুরোপাসকরা বিষ্ণুপূজা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিল। ‡

* উস্তা নো জাতো স্পিতামো জরথুস্ত্রো যো অথর্ব্বা। ফ্রবরদিন যস্ত—৯৩

‡ শতপথ ব্রাহ্মণ—১-২-৫ (১-৭)

(যাহারা মনে করেন যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য লইয়াই হিন্দু মুসলমানের কলহের সৃষ্টি, তাহারা ভুল বুঝেন।) একেশ্বরবাদ, মূর্ত্তিপূজা নিষেধ প্রভৃতি উপাসনার প্রথা, কিম্বা জাতিভেদরাহিত্য, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথা, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পার্থক্য আছে, তাহারা কলহের প্রকৃত কারণ নহে। শিখসমাজ, আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজেও ঐ সমস্ত প্রথা অবিকল বিদ্যমান। কিন্তু তাই বলিয়া একদিকে যেমন শিখ, ব্রাহ্ম বা আর্য্যসমাজের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের করাল কলহও নাই, অপরদিকে ঐ সমস্ত সমাজের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের নিবিড় প্রীতিও নাই। ধর্ম্মমতের পার্থক্যই যদি কলহের কারণ হইত, তবে ঐ সকল সমাজের সহিতও হিন্দু সম্প্রদায়ের কলহ বিদ্যমান থাকিত। আর ধর্ম্মমতের ঐক্যই যদি প্রীতির কারণ হইত তবে ঐ সকল সমাজের সহিত, মুসলমান সম্প্রদায়ের পরম প্রীতি থাকিত।

(হিন্দু মুসলমানের কলহ, পরস্পর বিমুখীন দুইটী সভ্যতার কলহ, ধুতি ও পায়জামার কলহ, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীলিপির কলহ, ভারতীয় ও পারসিক কৃষ্টির কলহ।)

(ইহার মূলে নিবিড় অজ্ঞতা।) কারণ হিন্দু সভ্যতা যে বৈদিক কৃষ্টির বিকাশ, পারসিক সভ্যতাও সেই বৈদিক কৃষ্টিরই বিকাশ। সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায়, পরস্পর প্রীতির কারণই আছে, কলহের কারণ নাই। ইস্‌লামিক সভ্যতা যদি পারসিক না হইয়া আরবিক সভ্যতা হইত, তবে না হয় পরকীয় বলিয়া বিরাগের কারণ কতকটা বুঝা যাইত। কিন্তু দুই সহোদরের বিবাদ- ইহার মত করুণ দৃশ্য জগতে কমই আছে।

ঐতিহাসিকের চক্ষে হজরত মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরব জাতির জন্ম হয় নাই বলিলেই চলে। অসভ্য বেদুইন চিরদিন ধরিয়া, হয় রোমকের, না হয় পারসিকের অধীনতাপাশে বদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়, সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ছিল। (আমরা

ইস্‌লামিক সভ্যতা, বলিতে যাহা বুঝি, তাহা বাস্তবিক পারসিক সভ্যতা। আরবিক সভ্যতা, শশ-বিষাণের ন্যায় অমূলক।

মহম্মদের জন্মের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই, নক্সা-ই-রস্তম নামক পর্ব্বতগাত্রে অথর্ব্বান জরথুস্ত্রের যে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহাকে যখন আচকান্-পায়জামা শোভিত দেখিতে পাই তখন পায়জামাকে পর, আর ধুতিকে আপন বলিবার বিশেষ কোনও কারণ খুজিয়া পাই না।

ইস্‌লামিক কৃষ্টির চৌদ্দ আনাই পারসিক কৃষ্টি। পারসিক কৃষ্টি হিন্দু কৃষ্টির যমজ ভাই। অতএব ইসলামিক কৃষ্টির চৌদ্দ আনা অংশের সহিত হিন্দুর কোনও কলহ থাকা অস্বাভাবিক।

ইস্‌লাম সেমিতিক-জাতিতে উদ্ভূত হইয়াছে। মূলে পারসিক কৃষ্টির সহিত তাহার যে সম্পর্ক, হিন্দু কৃষ্টির সহিতও তাহার সেই সম্পর্ক। ইস্‌লাম যদি পারসিক কৃষ্টিকে আপন বলিয়া মনে করিতে পারিয়া থাকে তবে হিন্দু কৃষ্টিকেই বা আপন বলিয়া মনে করিতে পারিবে না কেন? বরং পারসিক কৃষ্টিকে আপন করিয়াছে বলিয়াই উহার যমজ ভ্রাতা হিন্দু কৃষ্টিও তাহার আপন হইবার পথেই আসিয়াছে।

হিন্দু ও পারসিক কৃষ্টির মধ্যে বিরোধ থাকা, দুই সহোদর ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ থাকার মত অস্বাভাবিক, একথা বুঝিতে পারিলেই হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের নিবৃত্তি হইবে।

হিন্দুর পক্ষে বুঝা উচিত যে ইসলামিক কৃষ্টি বলিয়া সে যাহাকে জানে, উহা বস্তুগতা তাহার সহোদরসদৃশ পার্শীরই কৃষ্টি। উহাকে অনাদর করা তাহার পক্ষে মূর্খতা।

মুসলমানের পক্ষে বুঝা উচিত যে পারসিক কৃষ্টি ছাড়া তাহার চলে না। অতএব পারসিকের যমজ ভ্রাতা হিন্দুর কৃষ্টি অবজ্ঞা করাও তাহার সাজেনা।

আর্য্যের সহায়তা ছাড়া সেমিতিক জাতি অচল। সেমিতিক জাতিতে তিনটি ধর্ম্মতন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে—ইহুদিতন্ত্র, ইসাহিতন্ত্র, ও ইস্‌লাম পন্থা। তন্মধ্যে ইউরোপের আর্য্যগণ ইসাহি পন্থাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। ইস্‌লাম পন্থাকে পারস্যের আর্য্যগণ গৌরবান্বিত করিয়াছে। আর আর্য্যের সহায়তা লাভ করিতে না পারায় ইহুদী পন্থা বিশীর্ণ বিক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

পারসিক কৃষ্টির স্কন্ধে ভর দিয়াই ইস্‌লাম দণ্ডায়মান। উহাকে পরিহার করিবার কল্পনা কুলক্ষয়া উদ্‌ভ্রান্তি। (১) Andre Servier রচিত Islam and the Psychology of the Musalman, (২) Hurgronje রচিত Muhammadianism আর (৩) Blair রচিত Sources of Islam এই তিনখানা পুস্তক পাঠ করিলেই এই উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন হইবে।

চারিজন ধর্ম্মবীর ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার মধ্যে তিনজনই পারসিক, ইহা বলিলেই পারসিক কৃষ্টির নিকট ইস্‌লামের ঋণের পরিমাণ উপলব্ধ হইবে। (১) হজরত মহম্মদের কোরাণ (২) আলবুখারির হদিস, (৩) আবু হানিফার কিয়াস, আর (৪) গজ্জলির তফসির—ইহাদের দ্বারাই বিরাট মুস্‌লিম জগৎ নিয়ন্ত্রিত। তন্মধ্যে এক হজরত মহম্মদ ছাড়া, আর তিন জনই পারসিক।

আবু সিনা বা আবু রেহান, তবারি বা জমাক্ষারি, মীর খোন্দ বা আবুল ফজল, ইস্‌লামিক কৃষ্টির যাহা গৌরব, তাহারা সকলেই পারসিক। সাদি, হাফেজ, ওমর খৈয়াম বা জালালুদ্দিন রুমির নাম আর নাই করিলাম।

পারসিক কৃষ্টিকে পরিত্যাগ করা ইস্‌লামের পক্ষে অসম্ভব। আর পারসিক কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করা হিন্দুর পক্ষে মূর্খতা। পারসিক কৃষ্টির আদর দ্বারাই হিন্দু মুসলমানের প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে।

যদিও ভক্তিযোগের অন্যতর তীর্থঙ্কর বলিয়াই ধর্ম্মরাজ জরথুস্ত্র

আমাদের নমস্য, তথাপি হিন্দু-মুসলমান প্রীতি বন্ধনের সেতু হিসাবে ও গাথার মূল্য আছে। অতএব জয়থুস্ত্রের গাথা রাজনৈতিকের পক্ষেও উপেক্ষনীয় নহে।

লেখকের অবসর সঙ্কীর্ণ, শক্তি ক্ষীণতর। কিন্তু সুধীসজ্জনের চিত্তে, অক্ষমের অপটুতা, উপহাসের পরিবর্ত্তে অনুকম্পারই উদ্রেক করে; কেবল ইহাই তাহার ভরসা।

ভাষা সম্বন্ধে একটী ভেদ লক্ষণীয়। 'চ' 'বা' 'তু' এই তিনটী নিপাত (Conjunction) শব্দবাহ। 'কিং-চ' 'কিং-বা' 'কিং-তু',— ইহারা তিনটী বাক্য-বাহ। 'চ' ও 'কিঞ্চ' র স্থান, বাঙ্গালা ভাষায় 'এবং' আসিয়া কেমনে দখল করিয়া লইল, তাহা বুঝা যায় না। 'এবং'-র এবং-অপপ্রয়োগ পরিহার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'সুতরাং' অর্থ 'অতএব' (Therefore) নয়, 'সু-তরাং' 'নি-তরাং', 'অতি-তরাং' অর্থ অধিকতর, আরও (all the more)। ধর্ম্ম শব্দের ইংরেজী Rectitude ও duty। Religion শব্দের বাঙ্গালা—তন্ত্র।

রথ দ্বিতীয়া।

২১—৩—২৪৭৬ গৌতমাব্দ।

৫—৭—১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

যশোহর।

মজদা দাসস্য গ্রন্থকারস্য।

ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

এই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ খানা পাঠক সমাজে উপেক্ষিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই মনে করি যে বাঙ্গলা ভাষায় পার্শীতন্ত্র সম্বন্ধে কোনও পুস্তক নাই বলিলেই চলে। প্রাথমিক চেষ্টা বলিয়া পাঠক ইহাকে অনুগ্রহের চক্ষেই দেখিয়াছেন।

সেই ভরসায় শিখতন্ত্র সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ইহাতে যোগ করিয়া দিলাম। শিখ তন্ত্র হিন্দু ও পার্শীতন্ত্রের সমন্বয়ের ফল। অতএব রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্রের কথা বলিতে গিয়া গুরু গোবিন্দের কথা কিছু না বলিলে পুস্তক অসম্পূর্ন থাকিয়া যায়।

বাঙ্গলা ভাষায় শিখতন্ত্র সম্বন্ধে কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। যথা জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত প্রণীত জপজী ও সুখমনী। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গুরু গোবিন্দ সিংহ। শরৎচন্দ্র রায় প্রণীত শিখ গুরু ও শিখ জাতি, আর বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গুরুগোবিন্দ সিংহ। তদুপরি বঙ্গবাসী আফিস প্রকাশিত কানিংহামের শিখ ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ।

জপজী গুরু নানকের বাণী আর সুখমনা গুরু অর্জ্জুনের বাণী। মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গেই শিখ সম্প্রদায়ের আরম্ভ। গুরু নানক বাবরের সমকালবর্ত্তী। গুরু অর্জ্জুন জাহাঙ্গীরের সম সাময়িক। জাহাঙ্গীর তাহার আত্মচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে গুরু অর্জ্জুনকে মুসলমান বানাইয়া দেওয়া তাহার আন্তরিক বাসনা ছিল।* ঔরংজীবের মৃত্যু হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের আরম্ভ। গুরু গোবিন্দ ঔরংজীবের সমসাময়িক। গুরু গোবিন্দই শিখ সাধনায় পূর্ণাহুতি প্রদান করেন। পূর্ববর্ত্তী গুরুদের কথা এই পুস্তিকায় আলোচিত হয় নাই। তাহারা উষার আলোকচ্ছটা, গুরু গোবিন্দেই সূর্য্যের প্রকাশ।

*Kartar Singh—Guru Govinda Singh—P-9,

কনিংহামের বিস্তৃত আলোচনায় সাধারণ পাঠকের অভিনিবেশ ভগ্ন হইবার আশঙ্কা আছে। তিন কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গুরু গোবিন্দকে হিন্দু প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। গোবিন্দ সিংহ যে পার্শীতন্ত্রের ও প্রতিনিধি একথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। এরূপ ধারণা শিখ গণের রুচির বিরুদ্ধ। ইহাতে শিখ তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা হয়। অপর পক্ষে গুরু গোবিন্দের যাহা প্রধান অবদান, ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির সংযোগ সাধন, রাজনৈতিকতাকে ও ধর্ম্মজীবনের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ, শরৎ বাবু তাহার নিন্দা করিয়াছেন। ধর্ম্মজীবনের সহিত রাজনৈতিক জীবনের বিচ্ছেদই হিন্দু চরিত্রের প্রধান ত্রুটি। মহাত্মা গান্ধীও অনেকবার বলিয়াছেন যে রাজনীতিকে ধর্ম্মেরই অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে হইবে। বাসুদেব গোবিন্দ গীতাতে অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। আর গুরু গোবিন্দ সেই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিয়া সমগ্র সমাজকে এই ভাবে উদ্বোধিত করিয়া শিখ সংঘকে সিংহ সংঘে পরিণত করেন। অন্যান্য গুরু হইতে গুরুগোবিন্দের ইহাই বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বকে যিনি আদর করেন নাই তাহার পুস্তক পড়িয়া গুরু গোবিন্দকে বুঝিতে পারা যায় না।

শ্রীযুক্ত বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক জাতীয়তার ভাব হইতে লিখিত। তাহা পড়িয়া গুরুগোবিন্দের শ্রীমুখের বাণী—গীত গোবিন্দম্—কানে শুনিতে ইচ্ছা করে। গুরু গোবিন্দের রচনা "দশম পাতশাহাকে গ্রন্থ" অথবা সংক্ষেপে "দশম গ্রন্থ' নামে পরিচিত। ইহা গ্রন্থশেবের দ্বিতীয় ভাগ। গ্রন্থশেবের প্রথম ভাগ, অন্যান্য গুরুদের রচনা। ইহা "আদিগ্রন্থ" নামে পরিচিত।

দশম গ্রন্থের ভাষা পঞ্জাবী। হিন্দী হইতে ইহার পার্থক্য খুব কম। বিশেষতঃ গুরু গোবিন্দ সিংহ পূর্ব্ব প্রান্তের পাটনা নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ভাষা হিন্দীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী। কিন্তু উহা গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত বলিয়া অনেকেই উহার পরিচয় রাখেন না। নতুবা যে মহাপুরুষ আর্য্য-

জাতির মৃতদেহে আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার শ্রীমুখ বাণী নবযুগের নবগীতা বলিয়া গৃহীত হইত, সন্দেহ নাই। অন্ততঃ তুলসীদাস বা কবীরের দোহার ন্যায় উহার সংগ্রহ বাঙ্গলা ভাষায় ও প্রকাশিত হইত। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা তো দূরের কথা, হিন্দীতে ও গুরু গোবিন্দের বাণীর সংগ্রহ পাওয়া যায় না। বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন অনেকেই "বন্দার" নাম "বন্ধু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শরৎ বাবুর পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই "গুরুমতা" সংস্থাকে "গুরু-মঠ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গুরুমুখী অক্ষরের সহিত অপরিচয় বশতঃ কনিংহামের Gurumata হইতে ভাষান্তরিত করাতেই এরূপ ভ্রমের উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়।

দশমগ্রন্থ একটী বৃহৎ পুস্তক। হিন্দু পুরাণের সার, বিশেষতঃ কৃষ্ণ চরিত্র ও চণ্ডী চরিত্র ইহাতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। ইহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক তুলিয়া লইয়া নাভা নিবাসী সরদার কুহন সিংহ "গুরুমত সুধাকর" নামে একখানি চয়নিকা প্রকাশ করেন। ইহা গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত। বঙ্গীয় পাঠক গণের আগ্রহ আছে মনে করিলে, ইহা হইতে কতকগুলি বাণী সানুবাদ বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

প্রধানতঃ কুহন সিংহের পুস্তক অবলম্বন করিয়া ম্যাকলিফ সাহেব শিখ ধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ম্যাকলিফের পুস্তক প্রাচ্য ধর্ম্ম পুস্তক মালার (Sacred Book of the East Series) অন্তর্গত এক খণ্ড।

সম্প্রতি অমৃতসর খালসা কলেজর অধ্যাপক সরদার করতার সিংহ গুরুগোবিন্দের একখানা সুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় ইহার অনুবাদ হইলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হয়।

পঞ্জাবের মন্ত্রী স্যার গোকুল চাঁদ নিরঙ্গ্ লিখিত Transformation of Sikhism নামক পুস্তকে শিখ সংঘের উৎপত্তির হেতু নিপুণ

ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না। ইহার হিন্দী অনুবাদ আছে। বাঙ্গলা ভাষায়ও ইহার বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ধর্ম্ম প্রচারার্থ তেঘবাহাদুর হিন্দুর সমস্ত তীর্থ স্থল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।* আসামে গমন করিয়া তিনি কামরূপের রাজাকে শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন † এই সময়ে তিনি তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনাও করিয়াছিলেন।¶ কামরূপে যাইবার সময় তিনি ঢাকা নগরীতেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। বোলাকি চাঁদ প্রমুখ ঢাকার শিখগণের ভক্তিতে প্রীত হইয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে ঢাকা শিখ সঙ্গতের ভাণ্ডার গৃহ স্বরূপ হইবে।** তাহার পদার্পণ উপলক্ষে ঢাকাতে একটী গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠিত হয়। শিখ সঙ্গতের সাহচর্য্য বশতঃ ঐ পল্লী এখনও "সঙ্গত টোলা" নামে অভিহিত হয়। ঢাকার সেই আদিম গুরুদ্বার হইতেই এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। তেঘ বাহাদুরের আশীর্ব্বাদ ইহাতে বর্ষিত হউক।

বহুল প্রচারার্থ এই পুস্তিকার মূল্য দশ আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। হিন্দুর চারি আনা, পার্শীর চারি আনা আর শিখের দুই আনা রূপে, ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদিম গুরুদ্বারের উন্নতির জন্য ব্যয়িত করিবার ইচ্ছা আছে।

মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকার এই আদিম গুরুদ্বারেই গ্রন্থশেব পাঠ করিতে শিখেন।†† বর্ত্তমান সময়ে ইহা এমন শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে, যে এমন কি ঢাকাবাসী অনেকেই ইহার অস্তিত্ব অবগত নহেন।

* Kartar Singh—Life of Guru Govinda Singh P. 17.

† Nirang—Transformation of Sikhism—Chap. 8.

¶ *বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরুগোবিন্দ সিংহ—P. 17,

** Macauliffe—Sikh Religion. Vol. 4—P. 353.

†† জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত—জপজী—মুখবন্ধ।

ঢাকাবাসী ধনবানদের মধ্যে এমন উদার হৃদয় ব্যক্তি কি কেহ নাই, যিনি এই আদিম গুরুদ্বারটীকে সহরের প্রকাশ্য স্থলে একটী আদর্শ গুরুদ্বার রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন ?

(গুরুদ্বারই হিন্দু-পার্শী-জৈন-বৌদ্ধ-শিখের মহামিলন মন্দির —আর্য্য সমাজের শক্তি কেন্দ্র।) সহরের মধ্য স্থলে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গুরুদ্বার গঠনের আদর্শ রূপে বিরাজমান থাকিয়া, ইহা গুরু গোবিন্দের অতুল্য গঠন শক্তির অপূর্ব্ব মহিমা চিরকাল ধরিয়া খ্যাপন করিতে থাকুক।

এই পুস্তিকার কোনও স্বত্বই সংরক্ষিত হইল না। শিখ ও পার্শী তন্ত্রের বৃত্তান্ত প্রচার করিয়া, হিন্দু-পার্শী-শিখের মিলনের পথ প্রশস্ত করাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি এই পুস্তিকায় সামগ্রী (whole) অথবা অংশ বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, তাহার সুলভ প্রচার করিতে চান, তাহা গ্রন্থকারের পক্ষে আহ্লাদের কথা। বঙ্গ সাহিত্য প্রচারার্থ যিনি মুক্ত হস্তে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অর্থদান করিয়াছেন, সেই দানবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

মূর্খো বদতি বিষ্ণায়
ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

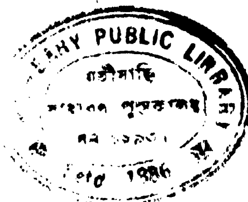
আমি "বিষ্ণবে" বলিতে গিয়া "বিষ্ণায়" বলিয়াছি। আমার দুরুচ্চারণে ক্লিষ্ট হইয়া, যিনি বিষ্ণবে বলিতে পারেন, এমন ব্যক্তি যদি জনার্দ্দনের সেবায় প্রবৃত্ত হন, তবে আমার এ অনধিকার চর্চ্চাও সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

২৮—৬—২৪৮০ গৌতমাব্দ
১৪—১০—১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ
মহালয়া ; কলিকাতা।

মজদা দাসস্য
গ্রন্থকারস্য

সূচীপত্র।

অধ্যায়



রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

প্রথম অধ্যায়।



শ্রুতি (বেদ)—গীতা-কলিকা।

[স্ফুরণ—Formation (of the Vedic church)]

যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রম্।

নমোভির্ দেবম্ অসুরং দুবস্য ॥

ঋগ্বেদ—৫ - ৪২—১১

পরম সৌমনসের (শান্তির) জন্য রুদ্রকে অর্চ্চনা কর। তিনি দেব (সপ্রকাশ—সাকার); তিনিই অসুর (অপ্রকাশ—নিরাকার)! নমস্কার দ্বারা তাহাকে তুষ্ট কর।

—:•:—

আর্য্য জাতির আদিম গ্রন্থ বেদ। সম্ভবতঃ বেদ জগতেরই আদিম গ্রন্থ—মানবের প্রাক্তন চিন্তাধারার নিদর্শন, প্রাথমিক লিপিবদ্ধ ভাষা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে ধর্ম্মরাজ গৌতম বুদ্ধের জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ অদ্যাবধি প্রায় পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বেদের রচনা হইয়াছিল। (১)

(১) (i) Tilak—Orion—P. 210

(ii) Maxmuller—History of Ancient Sanskrit Literature P. 63.

বেদ তিন ভাগে বিভক্ত—গদ্য, পদ্য ও সঙ্গীত। ইহাদেরই নাম যথাক্রমে যজুস্, ঋক্ ও সামন্ (১)। ত্রেধা বিভক্ত বলিয়াই গীতা (২) ও অন্যান্য শাস্ত্রে বেদকে "ত্রয়ী" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বেদের যাহা পরিশিষ্ট, বেদেরই উপসংহার তাহার নাম অথর্ব্ব-বেদ (৩)। অথর্ব্ব বেদ দুই ভাগে বিভক্ত (৪) ভার্গব উপস্থা ও আঙ্গিরস নিগম। এই জন্য অথর্ব্ববেদের অপর নাম ভৃগ্বঙ্গিরসী সংহিতা (৫)। গোপথ-ব্রাহ্মণে অথর্ব্ব-বেত্তাকে 'ভৃগ্বঙ্গিরো'-বিদ্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (৬)। অথর্ব্ব বেদের রচনার সময়ে আর্য্য জাতি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সাকারোপাসনার ও নিরাকারোপসনার দ্বন্দ্বই এই বিভেদের মূল।

আমরা "সাকার" বলিতে যাহা বুঝি, বৈদিক যুগে তাঁহার আখ্যা ছিল "দেব"। দেব শব্দের অর্থ দ্যোতক (Symbolic (৭)) স-প্রতীক বা সাকার। আমরা যাহাকে বলি "নিরাকার" বৈদিক যুগে তাহারই সংজ্ঞা ছিল "অসুর"। 'অসু' অর্থ প্রাণ. 'অসু-র' শব্দের অর্থ প্রাণবায়ুর মত অমূর্ত্ত, রূপহীন। 'সুর' শব্দ হইতে বিপরীত অর্থ বুঝাইবার জন্য 'অ-সুর' শব্দের সৃষ্টি হয় নাই। অসুর শব্দ হইতেই সুর শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ বেদে অসুর শব্দের ভূরিঃপ্রয়োগ আছে; সুর শব্দের প্রয়োগ মোটেই নাই। সুর শব্দটীর প্রয়োগ উপনিষদেই প্রথম দেখা যায়। (৮)

(১) জৈমিনী—পূর্ব্ব মীমাংসা—২—১—৩২।

(২) গীতা—৯—২০; ৯—২১। শতপথ ব্রাহ্মণ—৪-৬ ৭-১।

(৩) অথ = অনন্তর; ঋ = গমন করা; অথ + ঋ + বনিপ্ = অথর্ব্ব (নিঘণ্টু ৫-৫-১৩) অথর্ব্ব = পরবর্ত্তী, পরিশিষ্ট।

(৪) (i) Winternitz—Indian Literature—Vol 1 P. 120

(ii) বিষ্ণুপুরাণ—তৃতীয়াংশ—ষষ্ঠ অধ্যায় ৯-১০

(৫) Macdonell—History of Sanskrit Literature P. 189

(৬) গোপথ ব্রাহ্মণ ২-২-৫

(৭) দেবো দানান্ বা, দ্যোতনাদ্ বা, দ্যুস্থানো বা ভবতি। নিরুক্ত ৭-১৫

(৮) Macdonell—History of Sanskrit Literature P. 113

বৈদিক যুগে পরমেশ্বর রুদ্রকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ভাবেই আরাধনা করা হইত। সাকার রূপে যখন উপাসনা করা হইত, তখন তাঁহাকে **ইন্দ্র** বলিয়া সম্বোধন করা হইত, আর নিরাকার ভাবে উপাসনার সময় তাঁহাকে বরুণ নামে আমন্ত্রণ করা হইত। এই জন্য পরমেশ্বরের বিশেষণরূপ "দেব" ও "অসুর" এই উভয় শব্দেরই প্রয়োগ আছে (১) এমন কি একই ঋকে, পরমেশ্বরকে 'দেব' ও 'অসুর' এই উভয় বিশেষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইয়াছে।

(১) মহান্তা মিত্রা-বরুণা,
সম্রাজা দেবাব্ অসুরা।

ঋগ্বেদ—৮-২৩-৪

(২) হিরণ্যহস্তঃ অসুরঃ সুনীথঃ।
আস্থাদ দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ।

ঋগ্বেদ ১—৩৫—১০

বর্ত্তমানে কর্থদ-দুষ্ট হইয়া থাকিলেও, বৈদিক যুগে অসুর শব্দ যে মহিমান্বিত ছিল তাহার উত্তম প্রমাণ, ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চ-পঞ্চাশৎ সূক্ত। এই সূক্তে ধ্রুবপদ, অর্থাৎ প্রত্যেক ঋকের (শ্লোকের) অন্তিম চরণটী এই :—

"মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্"

সকল দেবদিগের মহান্ অসুরত্ব একই—সকল দেবে একই অসুরত্ব বিদ্যমান।

(১) (i) Macdonell—History of Sanskrit Literature P 112

(ii) Haug—Essay on the Sacred Literature of the Parsis—P. 268

(iii) ঋগ্বেদ—১-২৪-১৪ ; ১-৩৫-৭ ; ১-৫৪-৩, ১-১৩১-১ ; ৪-২-৫ ; ৫-৪২-১১ ; ৭-২-৩ ; ১০-১২৪-৩।

ধর্ম্মতত্ত্ববিজ্ঞানে, ঋগ্বেদের এই পংক্তিটীর মহিমা বিলক্ষণ গুরু। ইহাতে পরমেশ্বরের অদ্বয়ত্ব এমন স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে যে ইহাকে একেশ্বরবাদের মূলসূত্র বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে দেবদিগের "দেবত্ব" না বলিয়া, দেবদিগের "অসুরত্ব" বলাতে, দেবত্ব ও অসুরত্বের মধ্যে যে বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি মূর্ত্ত, তিনিই অমূর্ত্ত, (মূর্ত্তরা এক অমূর্ত্তেরই মূর্ত্তিভেদ) এই কথা বলিয়া সাকারোপাসনা ও নিরাকারোপাসনার দ্বন্দ্বের ও সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সাকারোপাসনাই হউক, আর নিরাকারোপাসনাই হউক, কোনও পথই একেবারে নিস্ত্রুটিক নহে :—

আলম্বস্যাপ্য্ অনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা।
উভয়োর্ অপি দোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥

উত্তর গীতা ১—৩৭

সাকার সীমাবদ্ধ অতএব সার্ব্বত্রিক নহে, অনিত্য। নিরাকার ধারণার অগোচর। কোনও পথই ত্রুটিশূন্য নহে। ধ্যানের উপায় কী ?

তন্মধ্যে সাকারোপাসনার এক প্রধান দোষ এই যে মূর্ত্তি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরে মনুষ্য ধর্ম্ম আরোপের প্রবৃত্তিও স্বতঃই জাগিয়া উঠে। তদনুসারে ঈশ্বরকে কাম-ক্রোধ-রিরংসা প্রভৃতি রিপুর অধীন মনে করিয়া, তাঁহার পুত্রকলত্রাদি পরিজনের কল্পনা করিবার ইচ্ছাও জন্মে— একক ঈশ্বরের স্থলে অনেকগুলি ছোটখাট ঈশ্বর গড়িয়া উঠে। অথচ অখণ্ড একত্বই ঈশ্বরত্বের ব্যাপক লক্ষণ—বহুর মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধিই ঈশ্বরাভিজ্ঞানের হেতু। ঐক্য-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরত্বও বিনষ্ট হয়। অতিবৃহৎ সান্ত ও সান্তই,—অনন্ত নহেন। খণ্ডিত ঈশ্বরও ঈশ্বর নহেন— নাম মাত্র ঈশ্বর। তাই একত্বের ঘোষণা করিয়া বেদ বলিয়াছেন

(১) হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে।
ভূতস্য জাতঃ পতির এক আসীত্॥

ঋগ্বেদ—১০-১২১-১

আদিতে কেবল হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। জন্ম হইতেই তিনি ভূতগণের এক মাত্র অধিপতি।

(২) যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা।
এক ইদ্ রাজা জগতো বভূব॥

ঋগ্বেদ—১০-১২১-৩

যিনি প্রাণের ও জ্ঞানের (দৃষ্টির) প্রাচুর্য্য বশতঃ জগতের একমাত্র রাজা।

(৩) একো বহূনাম্ অসি মন্যব্ ঈলিতো।
বিশং বিশং যুধয়ে সংশিশাধি॥

ঋগ্বেদ—১০-৮৪-৪

হে চিন্ময় (মন্যু), বহুর পুজিত তুমি, কিন্তু তুমি এক। আবার প্রত্যেকে তোমা হইতেই জীবনযুদ্ধের প্রেরণা লাভ করে।

(৪) একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ॥

ঋগ্বেদ—১-১৬৪-৪৬

তিনি এক। ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়। অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলিয়া ডাকে।

আর বেদের প্রতিধ্বনি করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।

শ্বেতাশ্বতর।

রুদ্র একজনই। দ্বিতীয় আর একজন নাই।

বিশেষতঃ সকল মূর্ত্তি সকলের নিকট সমান মনোহর বোধ হয় না। কেহ শিব, কেহ কালী, কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ লক্ষ্মী কেহ বা গণেশের মূর্ত্তি পছন্দ করেন। নানাবিধ মূর্ত্তির অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া একই জাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সমগ্র জাতির একমাত্র উপাস্য একটী ঈশ্বর আর কেহ থাকেন না। বিগ্রহ-ভেদে সম্প্রদায় ভেদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মূর্ত্তিপূজা জাতীয়ঐক্যের সুতরাং পরিপন্থী। ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই হউক জাতীয় জীবনে মূর্ত্তিপূজার অবকাশ কনীয়ান্।

এই সব বিষয় আলোচনা করিয়া ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ মূর্ত্তিপূজার তুমুল প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা "দেব" পূজার সমর্থন না করিয়া "অসুর" পূজার সমর্থন করিতে লাগিলেন অসুরোপাসকগণ তাহাদের শিষ্য হইল। ভৃগু অথবা শুক্রাচার্য্য অসুরদিগের পুরোহিত। (১)

পদ্মপুরাণে দেখিতে পাই তিনি বিষ্ণুর 'বক্ষে' পদাঘাত করিতেছেন।

তং দৃষ্ট্বা মুনি-শার্দ্দূলঃ ভৃগুঃ কোপ-সমন্বিতঃ।
সব্যং পাদং প্রচিক্ষেপ বিষ্ণোর্ বক্ষসি শোভনে॥

পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ড ২৫৫-৪৮

যাহারা দেবপূজার সমর্থন করিতেন অঙ্গিরসবংশীয়গণ তাহাদের মধ্যে প্রধান। এই জন্য আঙ্গিরস অথবা বৃহস্পতি দেব দিগের পুরোহিত। নিরাকারোপাসনার প্রথা আদৃত হইল, তিনি ক্রোধে স্রুচ্ হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অদৃশ্যেন হৃতো ভাগো দেবেন হরিমেধসা।
বৃহস্পতিস্ ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্রুচম্ উদ্যম্য বেগিতঃ॥

শান্তি পর্ব্ব—৩৩৫-১৪

(১) মহাভারত—আদিপর্ব্ব ৭৫-৬

যাহা হউক সাকারোপাসনা ও নিরাকারোপাসনার দ্বন্দ্ব লইয়া আর্য্য জাতি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। আঙ্গিরস নিগমকে ভার্গবগণ গ্রহণ করিলেন না, ভার্গব উপস্থাকে আঙ্গিরসগণ গ্রহণ করিলেন না। আঙ্গিরসগণ সিন্ধুনদের পূর্ব্বতটে অবস্থান করিতে লাগিলেন আর ভার্গবগণ রহিলেন সিন্ধুর পশ্চিম তীরে। সিন্ধুর নিকটে অবস্থান করিবার দরুণ আর্য্যাবর্ত্তবাসী আঙ্গিরসগণ কালক্রমে 'সিন্ধু' অথবা 'হিন্দু' আখ্যা লাভ করিলেন আর সিন্ধুর পরপারে বাস করিবার দরুণ আর্য্যায়ণ (ইরাণ) বাসী ভার্গবগণ পারস্য বা পারসিক সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন।

কালক্রমে দুই মহাপুরুষ আর্য্য জাতির দুই শাখা সমলঙ্কৃত করিলেন। অসুর পূজার বা নিরাকারোপাসনার যিনি বিনায়ক, তাঁহার নাম অথর্ব্বান্ জরথুস্ত্র। আর দেবপূজা বা সাকারোপাসনার যিনি বিনায়ক, তাঁহার নাম অথর্ব্বান্ রামচন্দ্র। অকাল বোধনদ্বারা দেবী-পূজার সহিত রামচন্দ্রের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে (১)। অকাল বোধনের যে মন্ত্র—দেবীসূক্ত—তাহা পৃশ্নিতেই আমরা দেখিতে পাই।

সিংহে ব্যাঘ্রে উতবা পৃদাকৌ,
ত্বিষির্ অগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্য্যে যা।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান।
সা ন এতু বর্চসা সংবিদানা॥

পৃশ্নি—৯—১৮ (আঙ্গিরসবেদ ৬-৩৮-১)

যিনি সিংহে ব্যাঘ্রে আর ভুজঙ্গে তেজোরূপে সংস্থিতা, যিনি সূর্য্যে অগ্নিতে ও ব্রাহ্মণে দীপ্তিরূপে সংস্থিতা, ঐশ্বর্য্য-শালিনী যে দেবী ইন্দ্রের ও জননী, প্রভায় দেদীপ্যমানা হইয়া সেই দেবী আমাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হউন। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে শূদ্রকমুনির দণ্ডবিধান করিতে হইয়াছিল। (২) বর্ণাশ্রম

(১) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত, বৃহন্নন্দিকেশ্বর।
(২) রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড ৮৯ অধ্যায়।

বিরোধী নিরাকারোপাসক ভার্গববেদপরায়ণ অথর্ব্বান জরথুস্ত্র, ত্রেতার প্রারম্ভে, আর বর্ণাশ্রম সমর্থক সাকারোপাসক আঙ্গিরস বেদপরায়ণ অথর্ব্বান্ রামচন্দ্র, ত্রেতার অবসানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই অমরকোষে দেখিতে পাই—

শুক্রশিষ্যাঃ দিতিসুতাঃ পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ।

অসুরেরাই পূর্ব্বে দেবতা ছিলেন, অর্থাৎ দেবপূজার পূর্ব্বে, অসুর পূজার প্রথাই প্রবর্ত্তিত ছিল। মহাভারতেও দেখিতে পাই—

অসুরাভ্রাতরো জ্যেষ্ঠা দেবাশ্চাপি যবীয়সঃ। (১)

অসুরেরা দেবতাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এই জন্য নিরাকারোপাসনাকে বলা হইত পিতৃযান অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষদের পথ। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই 'চক্ষুষ্মান্ কর্ণবান্' দেবতার যে পূজা, তাহাই দেবযান।

পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাম্,
যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি,
মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্।

ঋগ্বেদ ১০-৪৮-১

দেবযানের প্রতিপক্ষ যে পথ তাহা লোপ পাউক। আমরা চক্ষুবিশিষ্ট, কর্ণবিশিষ্ট, দেবতারই পূজা করিব।

এই প্রতিপক্ষ পথের নাম পিতৃযান। এই পথের পথিকরাও অগ্নিহোত্রী।

পন্থাম্ অনু প্রবিদ্বান্ পিতৃযানম্।
দ্যুমদ্ অগ্নে সমিধানো বিভাহি॥

ঋগ্বেদ ১০-২-৭

হে অগ্নে, পিতৃযান পথেও তোমার আদর আছে। তুমি দীপ্ত হও।

যাহা ভারতে দেবযান ও পিতৃযান নামে পরিচিত ইরাণে তাহারই নাম ছিল দেব-যস্ন ও মজ্দা-যস্ন। পার্শীতন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের যে মন্ত্র,

(১) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব—৩৩-২৫

তাহাতে দেবযস্ন পরিত্যাগ করিয়া মজ্‌দাযস্ন গ্রহণের সংকল্প, স্পষ্ট-ভাষায় রটনা করিতে হয় (১)। বেন্দিদাদে মজ্‌দাযস্নের অপর নাম দেওয়া হইয়াছে অ-দেব-যস্ন (২)। জরথুস্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেবতারা "মনুষ্যের আকারে" (৩) অবস্থিত থাকিতেন অর্থাৎ মানব আকৃতি বিশিষ্ট দেবতার পূজা করা হইত। অপর পক্ষে দেবযানে প্রবেশ করিবার সময়, অসুরযান অথবা পিতৃযানকে প্রত্যাখ্যান করা হইত।

শংসামি পিত্রে অসুরায় শেবম্।
অযজ্ঞিয়াদ্‌ যজ্ঞিয়ং ভাগম্ এমি॥

ঋগ্বেদ—১০-১২৪-৩

আমি পিতা অসুরকে বিদায় দিলাম। অযজ্ঞিয় ছিলাম, এখন যজ্ঞে ভাগ পাইব। (৪)

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র উভয়েই অথর্ব্ববেদের (৫) মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ভার্গবসংহিতার সারসর্ব্বস্ব "গাথা" রতু জরথুস্ত্রের শ্রীমুখের বাণী (৬) আর আঙ্গিরস সংহিতার যথাসর্ব্বস্ব "পৃশ্নি" বেন রামচন্দ্রের শ্রীমুখে প্রকটিত (৭)। তাই নারায়ণ জরথুস্ত্র ও নরোত্তম রামচন্দ্রের নাম স্মরণ পূর্ব্বক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, সুরনিষ্ঠ অসুরনিষ্ঠ উভয়বিধ শাস্ত্রের মর্ম্ম-পরিগ্রহণেই অন্তরায় থাকে না।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়ম্ উদীরয়েৎ॥

(১) উপস্থা—যস্ন-১২

(২) বেন্দিদাদ—১৮-৬৫

(৩) (i) হোম যস্ত ১৪-১৫ (ii) ফ্রবরদিন যস্ত—৯০

(৪) [পুরাণের রূপকে ইহারই ব্যাখ্যা হইল রুদ্র দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পাইলেন কিন্তু তাহাকে অসুরত্ব পরিত্যাগ করিয়া যোগ আনা দেবতা হইতে হইল।]

(৫) (i) তুর্য্য তুর্য্য-ত্রিপাদ রামং স্বমাত্রং কলয়ে অন্বহং। (অথর্ব্ব শিখোপনিষদ্।)

(ii) ফ্রবরদিন যস্ত—৯৩

(৬) উপস্থা যস্ন ৫৩-৮

(৭) (অথর্ব্ব) আঙ্গিরস বেদ ২-১-২ + (ঋগ্বেদ ১০—৯৩—১৪)

মঘবান জরথুস্ত্রের উদান গাথাকে বীজরূপে অবলম্বন করিয়া মহর্ষি যমাশ্ব (১) ভার্গব বেদ, আর ভগবান রামচন্দ্রের উদান পৃশ্নিকে বীজরূপে গ্রহণ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ (২) আঙ্গিরস বেদ রচনা করেন। পৃশ্নি ও গাথা যথাক্রমে হিন্দু ও পার্শীসমাজের ভিত্তিভূমি।

হিন্দু ও পার্শীর মধ্যে, দেব ও অসুরের মধ্যে, প্রতিযোগিতা ছিল বটে শত্রুতা ছিল না, প্রতিজিগীষা ছিল বটে, প্রতিজিঘাংসা ছিল না। শত্রুতা ছিল দানবগণের সঙ্গে—দানবরা দেবের ও শত্রু, অসুরের ও শত্রু, অর্থাৎ দেবোপাসকের ও শত্রু, অসুরোপাসকেরও শত্রু (৩)। অনার্য্যরাই দানব।

আর্য্যজাতির মধ্যে যাহারা দেবপূজা বা অসুরপূজা কোনটাই গ্রহণ করে নাই, অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারা প্রধানতঃ য়ূনিয়া (Ionia) অথবা গ্রীসের অধিবাসী ছিল বলিয়া তাহাদিগকে বলা হইত যবন। পারসীকগণও তাহাদিগকে যবন বলিত (৪)। গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলিয়া, বর্ত্তমান ইউরোপীয়দিগকে ও যবন বলা যাইতে পারে—অবশ্য বিদ্বেষ সূচনার জন্য নহে। পাণিনির বার্ত্তিককার কাত্যায়ন যাবনী লিপিতে অভিজ্ঞ ছিলেন। (৫)

অনার্য্যদিগের মধ্যে সেমিটিক জাতিই প্রধান। তাহারা মলোচ (হিব্রু-Moloch, আরবী-মালেক) দেবতার পূজা করিত বলিয়া তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে। (৬)

---

(১) Jackson—Zoroaster (The prophet of Ancient Iran) P. 97

(২) ভরদ্বাজো ন হুশম্ উকথানি শংসতি। আঙ্গিরস বেদ—২—১২—২

(৩) Haug—Essays on the Sacred Literature of the Parsis P. 279.

(৪) Ray chaudhuri—Early history of the Vaisnava sect. P. 17

(৫) Panini—4—1—49 (Vartika)

(৬) Bannerjee Sastri— Asura India—P. 95

পরবর্ত্তী কালে 'যবন' 'শক' ম্লেচ্ছ' 'অনার্য্য' প্রভৃতি শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ভুল। যবনগণ জাতিতে আর্য্য, ধর্ম্মে অনার্য্য। শকগণ জাতিতে অনার্য্য, ধর্ম্মে আর্য্য—যেমন বৌদ্ধতন্ত্রাবলম্বী চীন জাপান ও বর্ম্মীগণ, অথবা হিন্দুতন্ত্রাবলম্বী দ্রাবিড়গন। শবর, কাফরী, খশ প্রভৃতি গোষ্ঠী, জাতি ও ধর্ম্মে অনার্য্য। আর্য্য ও অনার্য্যের প্রভেদ যাহারা রক্ষা করিয়া চলিতে চান, তাহারা স্মৃতির পথিক—হিন্দু ও পার্শী। আর্য্য ও অনার্য্যের প্রভেদ যাহারা মানেন না তাহারা তন্ত্রের পথিক—শিখ।

ভগবান্ বিবস্বান্ ভাস্করের দুই পুত্র—বৈবস্বত মনু ও বৈবস্বত যম (১)। বৈবস্বত মনুর সন্ততি ইক্ষ্বাকুর বংশে রামচন্দ্র, ও বৈবস্বত যমের সন্ততি মন্যুশ্রীর বংশে জরথুস্ত্র জন্মগ্রহণ করেন (২)। অথর্ব্বান্ রামচন্দ্র সূর্য্যবংশে, আর অথর্ব্বান জরথুস্ত্র অগ্নিকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ যেমন মূলতঃ একমাত্র মনুরই সন্ততি, অগ্নিবংশ ও সূর্য্যবংশ ও তেমনই একমাত্র বিবস্বানেরই সন্ততি। বংশলতাদ্বারা নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। আদিপুরুষ বিবস্বান হইতে জরথুস্ত্র একচল্লিশ পুরুষে, রামচন্দ্র পঁয়ষট্টি পুরুষে, আর শ্রীকৃষ্ণ চুরানব্বই পুরুষে জন্ম গ্রহণ করেন।

(১) Macdonell—Vedic Mythology P. 133 (ii) Hopkins Epic Mythology—P. 201

(২) Jackson—Zaroaster (The Prophet of Ancient Iran) P. 19 and 180

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

ভাস্কর বিবস্বান্

(ভারতবর্ষ) — (ইলাবৃতবর্ষ)

মনু (সূর্য্যবংশ) — যম ‡ (অগ্নিবংশ)

মন্যু-শ্রী (২৭)

ইক্ষ্বাকু (সূর্য্যবংশ) — ইলা (চন্দ্রবংশ)

যযাতি (৬)

মান্ধাতা (২১)

যদু (৭) — পুরুষাশ্ব (৪০)

জরথুস্ত্র (৪১)

রামচন্দ্র (৬৫)** — শ্রীকৃষ্ণ (৯৪) **

নরপতি দশরথের ঔরসের, মাতা কৌশল্যার গর্ভে, আর্য্যাবর্ত্তের অযোধ্যা নগরে, চৈত্রা শুক্লা নবমীতে রামচন্দ্র, আর ক্ষত্রিয়র্ষভ পুরুষাশ্বের ঔরসে, মাতা দুগ্ধবার গর্ভে, আর্য্যায়ণের (ইরাণের) রজিনগরে † চৈত্রা কৃষ্ণা সপ্তমীতে ‡ জরথুস্ত্র জন্মগ্রহণ করেন।

‡ পারসিক ভাষায় যমের নাম যম শেদ (যমঃ ক্ষেতঃ)। তাঁহা হইতে পার্শী ধনিকের নাম রাখা হইয়াছিল যমশেদ জী নশিরবান জী তাতা। তাহার নাম হইতেই সাকচীর নাম হইল যম্‌শেদপুর। মন্যু-শ্রীর নাম শাহনামায় মনু-চেহর।

** Pargiter—Ancient Indian Historical Traditions P. 147—148.

† Pour-i-Davoud—Gatha (Translation) Introduction

[পার্শী ও হিন্দুর অন্যতম তীর্থ রজিধাম পারস্যের রাজধানী তিহারাণের তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।]

‡ 6th Farvardin—7th day after Vernal Equinox Bharucha—Zaroastrian Religion and Customs P. 42

[গৌতম পূর্ণিমায়, ও মহাবীর বর্দ্ধমান অমাবস্যায় তিরোধান করেন। জরথুস্ত্র সপ্তমীতে ও রামচন্দ্র নবমীতে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ইহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার, সপ্তমী ও নবমীর মধ্যস্থল।]

ইহারা ভক্তিযোগের যুগল তীর্থঙ্কর, জাতীয় সাধনার যমল প্রতিনিধি। রামচন্দ্র ভারতীর কৃষ্টির, ও জরথুস্ত্র পারসিক কৃষ্টির মহাবিনায়ক। কিন্তু উভয়েই আর্য্য সভ্যতার অঙ্গ—শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের ন্যায় মাসের অর্দ্ধাংশ দিবা ও রাত্রির ন্যায় বাসরের অর্দ্ধাঙ্গ। উভয়েই মাতৃস্বরূপিনী বৈদিক কৃষ্টির অন্যতর স্তন্যপানে পুষ্ট—বেদমাতার প্রিয়সন্তান। কাহাকেও মুখ্য কাহাকেও গৌণ, কাহাকেও পর, কাহাকেও আপন বলিবার অধিকার আমাদের নাই।

বৈদিক সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ও সূত্র। (১) ঈশ্বর বিষয়ক স্তোত্রগুলির নাম মন্ত্র। মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা, ইতিহাস, ও প্রয়োগের নিয়ম যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহার নাম ব্রাহ্মণ। আর ধর্ম্মজীবনের বিধি নিষেধ যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহার নাম সূত্র। ইহার পরবর্ত্তী কালে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহারা বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহাদিগকে শ্রুতি বলিয়া গণ্য করা হয় না, স্মৃতি বলিয়া গণ্য করা হয়।

বেদের মন্ত্রভাগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে--মূল বেদ, আর বেদের পরিশিষ্ট বা অথর্ব্ববেদ। শব্দযোজণার প্রণালী অনুযায়ী মন্ত্র গুলিকে আবার যজু (গদ্য) ঋক্ (পদ্য) ও সাম (সঙ্গীত) এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে (২)। এই তো গেল মন্ত্রের কথা। ব্রাহ্মণের ভাষা গদ্য, আর সূত্রের ভাষা অতি সংক্ষিপ্ত গদ্য।

ব্রাহ্মণগুলিকে তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে--মূল ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ্। মূল ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞাদির আলোচনা আছে, আর আরণ্যকে যাগযজ্ঞাদির চরম উদ্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

(১) Maxmuller—History of Ancient Sanskrit Literature P. 76.

(২) Bloomfield—The Religion of the Veda, P. 33

আরণ্যকের সার সংগ্রহ করিয়া উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। যাগযজ্ঞ প্রতিপাদক মূল ব্রাহ্মণগুলিকে কর্ম্মকাণ্ডের গ্রন্থ আর (উপনিষদ্ সহ) আরণ্যক গুলিকে জ্ঞান কাণ্ডের গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা হয়।

সূত্র গুলি ও তিনভাগে বিভক্ত—কল্প সূত্র, গৃহ্য সূত্র ও সময় সূত্র। কল্পসূত্রে অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রণালী বর্ণিত আছে। গৃহ্যসূত্রে বিবাহ উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পারিবারিক জীবনের বিবিধ সংস্কারের বিধান উল্লিখিত আছে। আর সময়সূত্রে বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতি সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্যগুলি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সময় অর্থাৎ পরস্পরের সম্মতি (Mutual understanding) এই সকল সংস্কার মূল বলিয়া ইহাদিগকে সময় সূত্র বলা হয়।

সময় সূত্রগুলির সার সংকলন করিয়া, পরবর্ত্তিকালে মনু-অত্রি-বিষ্ণু-হারীত প্রভৃতি বিশখানি ধর্ম্মসংহিতা রচিত হইয়াছিল (১)। ইহারা লৌকিক সংস্কৃত পদ্যে রচিত, অর্থাৎ ইহাদের ভাষা রামায়ণ মহাভারতের ন্যায়।—ইহারাই বিশেষ করিয়া স্মৃতি নামে পরিচিত। চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থগুলি হইতেই ব্রত প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান দিয়া হিন্দু সমাজকে শাসিত করেন। আবার ব্রিটিশরাজের বিচার বিভাগে হিন্দু আইন রূপে গৃহীত হইয়া, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ প্রভৃতির মীমাংসা ইহারাই করিতেছে।

হিন্দু সমাজে যাহা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ও সূত্রনামে পরিচিত, পার্শীসমাজে তাহাদেরই নাম যথাক্রমে যস্ন (যজ্ঞ—যজন) যস্ত (ইষ্ট—ইজ্যা) ও বেন্দিদাদ (বিদেব দাত—বিদেব বিধি)।

(১) Maxmuller—History of Ancient Sanskrit Literature—P. 200.

সূত্রযুগের অব্যবহিত পরেই মহাভারতের রচনা হইয়াছিল (১)। ইহাই পৌরাণিক যুগ (২)। মহাভারতের অনুকরণে পুরাণ গুলির রচনা হয়—অষ্টাদশ পর্ব্বের সংখ্যার অনুকরণে অষ্টাদশ পুরাণ। আবার তাহার অনুকরণে অষ্টাদশ উপপুরাণ। বেদব্যাস রচিত মহাভারতের অনুকরণ বলিয়া, ইহারা ও বেদব্যাস রচিত বলিয়া কথিত হয়। পুরাণগুলিতেই আমরা হিন্দু ধর্ম্মের বর্ত্তমান রূপ প্রথম দেখিতে পাই। বৈদিক বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্রের পূজা অপ্রচলিত হইয়া পরিয়াছে, ও তত্‌স্থানে যথাক্রমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার অল্প পরেই জৈন ও বৌদ্ধপন্থার সূচনা। সূত্রের প্রভাব তখন ও লুপ্ত হয় নাই। জৈন গ্রন্থ 'মূল-সূত্র' (উত্তরাধ্যয়ন সূত্র) ও বৌদ্ধ গ্রন্থ 'সূত্র-পিটকের' নামাকরণে সূত্রের প্রভাব স্বীকৃত—যদিও ইহাদের ভাষা সংক্ষিপ্ত গদ্য নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে গৃহ্যসূত্র রচয়িতা আশ্বলায়ন, প্রায় গৌতম বুদ্ধের সম-সাময়িক (৩)।

যে যুগে বেদের রচনা হইয়াছিল, তাহার নাম সত্যযুগ। তত্‌-পরে অথর্ব্ববেদ সংকলিত হয়। ইহার নাম ত্রেতাযুগ। পারসিক রাম বা পরশু-রামের (৪) আবির্ভাবের সহিত ত্রেতাযুগের উত্‌পত্তি, ভারতীয় রাম বা রঘুরামের তিরোধানের সহিত ত্রেতাযুগের অবসান (৫)। তত্‌-পরে দ্বাপরযুগের আরম্ভ।

---

(১) Maxmuller—History of Ancient Sanskrtt Litera-cture—P. 215

(২) Keith—The Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads P. 29

(৩) Hem Chandra Roy Chowdhury—Political History of Ancient India P. 21.

(৪) পাণিনিতে পারসিকদিগকে "পর্শু" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "পর্শ্বাদি-যৌধেয়াদিভ্যো অন্-অঞো ৫-৩-১১৭। [পর্শু = পরশু]

(৫) মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব ৩৩৯-৮৪

ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থগুলি দ্বাপরযুগে রচিত হইয়াছিল। ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে মহারাজ পরীক্ষিত্ ও জনমেজয় ও তত্ পরবর্ত্তী বিদেহের রাজা সম্রাট করাল-জনকের উল্লেখ বার বার পাওয়া যায় (১)। উপনিষদ্ গুলি এই যুগেরই রচনা। ইহার অব্যবহিত পরেই মূল মহাভারত রচিত হইয়াছিল। সকল উপনিষদের সার সংকলন করিয়া (২) যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে গীতাতত্ত্ব প্রচার করেন, (৩) তাহা মহাভারতেরই অন্তর্গত। আশ্বলায়নের গৃহ্য সূত্রের পূর্ব্বেই মহাভারত রচিত হইয়াছিল। কারণ গৃহ্যসূত্রে মহাভারতের উল্লেখ আছে। পাণিনি ব্যাকরণেও মহাভারতের উল্লেখ আছে। পাণিনি গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী। মহারাজ বিম্বিসার গৌতম বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী। অতএব মহারাজ পরীক্ষিতের পরে, আর মহারাজ বিম্বিসারের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে মূল মহাভারতের রচনা হইয়াছিল।

মহাভারতের রচনা দ্বাপর যুগে। পৌরাণিক কাল কলিযুগের অন্তর্গত। সত্যযুগের বেদ, ত্রেতাযুগের পৃশ্নিগাথা, দ্বাপরযুগের গীতা, আর কলিযুগের মূল-সূত্র (জৈন), ধর্ম্মপদ (বৌদ্ধ), ও গীতগোবিন্দ (শিখ) আর্য্যজাতির পবিত্র হোমাগ্নির উজ্জ্বল শিখা স্বরূপ।

বৈদিক যুগে উপাসনার প্রণালী সরল ছিল। প্রজাপতিরুদ্রের— ইন্দ্র ও বরুণের স্তোত্র পাঠ করিয়াই লোকে উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। অথর্ব্ববেদের যুগে (৪) সর্ব্ববেদের রহস্য স্বরূপ রামচন্দ্রের পৃশ্নি, আর জরথুস্ত্রের গাথাই ছিল উপাসনার প্রধান অবলম্বন। অথর্ব্ববেদের পরে ব্রাহ্মণ যুগের আবির্ভাব। ধর্ম্ম তখন আচার সর্ব্বস্বতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, নিষ্ঠার স্থান অনুষ্ঠান আসিয়া দখল

---

(১) H. C. Roy Chaudhuri—Political History of Ancient India—P. 3.

(২) Telang—Bhagavad Gita (Introduction) Sacred Books of the East Series.

(৩) Vaidya—Mahabharata—a criticism P. 40.

(৪) Bloom field—Atharva Veda & Gopatha Brahmana P. 2

করিয়া লইয়াছে, উপাসনার পরিবর্ত্তে যাগযজ্ঞই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। কোথা হতে সোমলতা আহরণ করিতে হইবে, কেমনে সোমকে প্রক্ষালন করিতে হইবে, যজ্ঞের বেদি কত বড় হইবে, যজ্ঞের অগ্নি কোন কোণে স্থাপন করিতে হইবে, তাহাই লোকের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে (১)। এই সময়কার সমাজের ছবি আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে। যাগযজ্ঞই ইহার অবলম্বন, আর সেই যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ভারতে এই গ্রন্থের নাম হইয়াছিল ব্রাহ্মণ। ইরাণে ইহার নাম ছিল যস্ত অথবা ইষ্ট (২)। বেদের পর অথর্ব্ববেদ, অথর্ব বেদের পর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পর সূত্র, বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসের এই চারিটী সোপান। ব্রাহ্মণগ্রন্থের সংখ্যা আট। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ও কৌষিতকী। যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ও শতপথ। সামবেদের ব্রাহ্মণ তলবকার ও পঞ্চবিংশ। অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ গোপথ ও যস্ত—অথর্ব্বাঙ্গিরসের গোপথ, ও অথর্ব্ব-ভার্গবের যস্ত।

ব্রাহ্মণযুগের অন্তিম ভাগই আরণ্যকের যুগ। আরণ্যকের সারভাগের নাম উপনিষদ্ (৩) বলিয়া, কেহ কেহ এই যুগকে উপনিষদের যুগ বলিয়াও অভিহিত করেন। উপনিষদ্ শব্দের অর্থই সার। 'উপ' পূর্ব্বক 'নি' পূর্ব্বক 'সদ' ধাতু হইতে উপনিষদ্ শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ যাহা কোনও বিষয়ের কেন্দ্রস্থানে অধিষ্ঠিত, উহার মর্ম্মস্থলে বসিয়া আছে, উহার মর্ম্মবাণী ও রহস্য, তাহার নাম উপনিষদ্।

যাহারা চিন্তাশীল প্রকৃতির লোক, তাহারা নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া তত্ত্বকথার আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন, এই জন্য তাহাদের রচিত গ্রন্থগুলির নাম হইয়াছিল আরণ্যক। আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থের

(১) Winternitz—Indian Literature P. 197.

(২) Haug—Essays on the Sacred Literature of the Parsis—P. 194.

(৩) Bloomfield—The Religion of the Veda P. 50

সঙ্গে সঙ্কলিত, তাহাদেরই অন্তিম ভাগ (১)। উপনিষদ্ আবার আরণ্যকের অন্তিম ভাগ। মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদের সর্ব্বান্তিমভাগ বলিয়া উপনিষদের অপর নাম "বেদান্ত" (২)। কালক্রমে অনেক নূতন উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। এইজন্য কোন উপনিষদ্‌গুলি মৌলিক, তাহা আলোচনার যোগ্য।

পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ, জটা-পাঠ, ঘন-পাঠ প্রভৃতি নানাবিধ পরিপাটীতে বিন্যস্ত করিয়া, ঋষিগণ বেদমন্ত্রের শব্দগুলিকে এমন ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যে বেদ-সংহিতায় কোনও নূতন রচনা যোজনা করিয়া দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এরূপ অব্যর্থ ব্যবস্থা জগতের সাহিত্যে আর কোথাও দেখা যায় না (৩)। কিন্তু উপনিষদ্ সম্বন্ধে সেরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছিল না। অথচ বেদের পরেই উপনিষদের প্রাধান্য দেখিয়া, অনেকেই নিজ নিজ রচিত নিবন্ধ উপনিষদ্ নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কালে কালে উপনিষদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে প্রায় দুইশত পুস্তক উপনিষদ্ নামে বিখ্যাত আছে। এমন কি 'আল্লার উপাসনা ও উপনিষদের অনুমোদিত' ইহা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, 'আল্লোপনিষদ' নামে একখানি গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এই অদ্ভুত উপনিষদে 'আল্লা' 'অল্লা' প্রভৃতি শব্দকে সংস্কৃতমূলক গণ্য করিয়া উহাদের ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হইয়াছে (৪)। তাবৎ উপনিষদের মূল্য সমান নহে, কোনওটী আসল কোনওটি নকল, কোনওটি প্রাচীন, কোনওটী অর্ব্বাচীন। কিন্তু আসল আছে বলিয়াই নকল হইতে পারিয়াছে (৫)। অতএব কোন উপনিষদ্ গুলি আসল তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

---

(১) Milburn—Religious Mysticism of the Upanisads (Introduction)—P. XXV–XXVI

(২) Bloomfield—The Religion of the Veda P. 51

(৩) Macdonell—History of Sanskrit Literature P. 50

(৪) স্বামী দয়ানন্দ রচিত সত্যার্থ প্রকাশে আল্লোপনিষদ খানি আগাগোড়া উদ্ধৃত করা আছে। কৌতূহলী পাঠক তথায় অনুসন্ধান করিতে পারেন।

(৫) Keith—Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads—P. 505.

মুক্তিকোপনিষদে ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন মুণ্ড-মাণ্ডুক্য-তিত্তিরি' প্রভৃতি শ্লোকে, একশত আটখানি উপনিষদের নাম ধরিয়া গণনা করা আছে। অবশিষ্ট উপনিষদ্গুলি যে পরবর্ত্তী যুগের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মুক্তিকোপনিষদ্ও প্রাচীন নহে। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট-পুত্র দারা-শিকোর প্রচেষ্টায় পঞ্চাশখানি উপনিষদ্ সংস্কৃত হইতে পারসিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পর্য্যটক আঁকেতিল দুপারেঁ, ফারসী হইতে লাটিন ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন (১)। এই অনুবাদের অনুবাদ লাটিন ভাষায় পাঠ করিয়া, অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্ম্মাণ দার্শনিক শোপেনহাউর বলিয়া গিয়াছেন 'উপনিষদই আমার জীবনে সান্ত্বনা ও মরণে শান্তি" (২) উপনিষদের উদাত্ত ঝঙ্কার তাত্ত্বিকগণের কর্ণে চিরদিনই মধুবর্ষণ করিয়া আসিতেছে (৩)।

মোগলগণ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। (৪) অবশ্য চট্টগ্রাম-বাসীর মত নির্জীব বৌদ্ধ নহে, নেপালী বা জাপানীর মত দুর্দ্ধর্ষ বৌদ্ধ। 'খাঁ' উপাধি দেখিয়াই যদি কেহ চেঙ্গিস খাঁকে মুসলমান বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি মহা ভুল করিবেন। মোগলশ্রেষ্ঠ কুবলাই খাঁ চীনদেশে বৌদ্ধসাম্রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেন। (৫) তাঁহার ভ্রাতা হলাকুখাঁর মুসলমান বিদ্বেষ (৬) এত প্রবল ছিল যে তিনি ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ লুণ্ঠন করিয়া আরব সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য ধ্বংস করিয়া দেন (৭)। এমন কি দেশের মস্জিদগুলিকে আস্তাবলে পরিণত

(১) Deussen – The Philosophy of the Upanishads P. 35
(২) Macdonell—History of Sanskrit Literature P. 424
(৩) Ranade—A Constructive Survey of Upanishadic Philosophy (Introduction) P. 14
(৪) Ross--Islam P. 53
(৫) (i) Browne—Literary History of Persia Vol II P. 452
(ii) Farquhar—Out line of Religious Literature P. 277.
(৬) Sykes—Persia P. 63
(৭) (i) Browne—Literary History of Persia Vol I P. 274
(ii) Cash – The Expansion of Islam P. 74

করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই (১)। কিন্তু পারস্য দেশ জয় করিবার পর পারস্যে থাকিয়া থাকিয়া মোগলেরা কালক্রমে ইস্‌লামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হলাকু খাঁর প্র-পৌত্র গজন শাহ প্রথম ইস্‌লাম গ্রহণ করেন (২)। ভারতবর্ষের মোগলদিগকে আমরা মুসলমান-রূপেই দেখিতে পাই। তথাপি মৌলিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তাহারা একেবারে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাই তাহাদের কাহাকে কাহাকেও হিন্দু ভাবাপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। হুমায়ূন নিরামিষ আহার অবলম্বন করিয়াছিলেন (৩)। আকবর যজ্ঞ করিতেন (৪) ও রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন (৫)। দারাশিকো নিরন্তর বেদান্ত পাঠে মগ্ন থাকিতেন। তিনি স্বীয় অঙ্গুরীয়কে "প্রভু" এই কথাটী নাগরী অক্ষরে খোদিত করিয়া নিয়াছিলেন ৬)। সম্রাট মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮) শিবনারায়ণী সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন (৭)। মোগলাগমনের পূর্ব্বেও দাস বংশীয় নরপতি সম্রাট নাসিরুদ্দিন খসরু, রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন (৮)।

---

(১) Browne—Literary History of Persia Vol II P 12

(২) Levy—Persian Literature P. 53

(৩) Ghani—A History of the Persian Language and Literature of the Mughal Court Vol II P. 187

(৪) Ain—i—Akbari—Vol II—P.393

(৫) (i) Badauni—Vol II—P. 321

(ii) মহম্মদী—১৩৩০—মাঘ—পৃ ২৩৫

(৬) Jadunath Sarkar—History of Aurangzeb—, Vol I P 298

(৭) Farquhar—Outline of Religious Literature. P. 345.

(৮) Dr. Syed Mahmud—Cow-Protection under Muslim Rule (Published by the Bombay Humanitarian League)

যাহা হউক দারাশিকো পঞ্চাশখানি উপনিষদ্ ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পঞ্চাশখানি উপনিষদ্ই তদানীং প্রামানিক বলিয়া গণ্য হইত একথা অনুমান করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে মাত্র চৌদ্দখানি উপনিষদ্ হইতে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাই কেহ কেহ মনে করেন যে এই চৌদ্দখানি উপনিষদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধেই কোনও আপত্তির অবসর নাই। এই চৌদ্দখানি উপনিষদের নাম—ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় মুণ্ডক, ঐতরেয়, জাবাল, কৌষিতকী, মহানারায়ণ, কঠক, শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন, ঈশ, পৈঙ্গী ও কেন (১)। পরন্তু পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ইহাদের মধ্যে মাত্র দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। এই জন্য কেহ কেহ আবার কেবল এই দশখানি উপনিষদ্কেই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তাহাদের মতে, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন ও মুণ্ডক এই দশখানি উপনিষদ্ই মৌলিক উপনিষদ্।

মৌলিক উপনিষদগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলির ভাষা গদ্য ও আকার বৃহৎ। অবশিষ্ট উপনিষদ্‌গুলির ভাষা পদ্য ও আকার ক্ষুদ্র। গদ্য উপনিষদগুলি বহুদিন ব্যাপী গভীর আলোচনার আলম্বনরূপে সত্রে ব্যবহৃত হইত, আর পদ্য উপনিষদগুলি পারমার্থিক তত্ত্ব কথার স্মারকরূপে দৈনন্দিন ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ তাহারা ছিল নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায়।

বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও প্রশ্ন এই পাঁচখানি উপনিষদের ভাষা গদ্য (২)। কেনোপনিষদের ভাষা মিশ্র—ইহা কতক

(১) Deussen– The Philosophy of the Upanishads P. 36

(২) (i) Milburn – Religious Mysticism of the Upanisads (Introduction) P. XXI

(ii) Keith—Religion and Philosophy of Veda and Upanishads—P. 499

গদ্যে ও কতক পদ্যে রচিত। বাকী চারিখানা উপনিষদ্—ঈশ, কঠ, মুণ্ডক, ও শ্বেতাশ্বতর পদ্যে রচিত (১)। তন্মধ্যে ঈশোপনিষৎখানি যজুর্ব্বেদ সংহিতার চত্বারিংশৎ অধ্যায়। উহাকে উপনিষদ্ না বলিয়া যজুর্ব্বেদ সংহিতার অংশ বলিয়া গণ্য করাই অধিক সঙ্গত। পরন্তু যজুর্ব্বেদের এই অধ্যায়টী উপনিষদ্-রচনারআদর্শ, ও উপনিষদ্ রচনার অনুপ্রেরক, এই বলিয়া ইহাকে উপনিষদের সঙ্গে গণনা করা হইয়া থাকে। উপনিষদ্ রচনার আদর্শ হেতুক উপনিষদ্ বলিয়া গণ্য করিলে যজুর্ব্বেদের চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়টীকেও 'শিবসংকল্পোপনিষদ্' নামে অভিহিত করিতে হয় (২)। ঋগ্বেদের নাসদীয়সূক্ত (১০-১২৯) পুরুষসূক্ত (১০-৯০) প্রভৃতি কতকগুলি সূক্তও উপনিষদ্-রচনার আদর্শ। কিন্তু ইহারা যখন বেদসংহিতারই অংশ, ইহারাই বেদ, তখন উপনিষদ্ বলিয়া গণনা করিলে ইহাদের গৌরবের হ্রাস ছাড়া বৃদ্ধি হয় না। অতএব যাথার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর, এই উপনিষদ্-ত্রিতয়ই প্রকৃত স্বাধ্যায়।

এই তিনখানি উপনিষদের পরস্পর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ নিবিষ্টচিত্তে প্রণিধান করিলে ইহাদের ভাবধারার ও রচনার মধে একটা ঐক্য পরিলক্ষিত হইবে। ইহারাই সাংখ্যও বেদান্ত দর্শনের নিদান, ভগবদ্গীতার মূল (৩)। কঠোপনিষদে ছয়টী বল্লী, মুণ্ডকে তিনটী মুণ্ড ও শ্বেতাশ্বতরে ছয়টী খণ্ড। এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের এক একটী অধ্যায় প্রতিদিন পাঠ করিলে আর্য্য সাধনার সহিত সংযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে, বেদান্তের আদর্শ হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

---

(১) Barnett—Brahma-Knowledge P. 48

(২) Maxmuller—History of Ancient Sanskrit Literatur P. 317

(৩) Ranade—A Constructive Survey of Upanishadi Philosophy P 28

আরণ্যক-যুগের চিন্তার ধারা তুইটী বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতেছিল। একটী জ্ঞানযোগের পথ বা জ্ঞানকাণ্ড, অপরটী কর্ম্ম-যোগের পথ বা কর্ম্মকাণ্ড। সকল সমস্যার সমাধান যাহাতে হইতে পারে এই জন্য কেহ কেহ জগতের মূলকারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথা হইতে জগতের উৎপত্তি, কোথায় ইহার পরিণতি, কে এই জগৎ সৃষ্টি করিল, ইহাই তাহাদের আলোচনার বিষয় হইল। পদার্থ তুই প্রকার, সচেতন ও অচেতন, অথবা পুরুষ ও প্রকৃতি, (Mind and Matter)। গীতার ভাষায় ইহাদিগকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। ইহারা কি স্বতঃ উদ্ভূত হইয়াছে, না কেহ ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে, আর যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি কেবল শুভেরই (সত্ত্বগুণ বা স্পেন্ত-মন্যু) সৃষ্টি করিয়াছেন, না অশুভেরও (তমো-গুণ বা অংগ্র-মন্যু) সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ জগতের আদি কারণ সগুণ ঈশ্বর কিম্বা নির্গুণ ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসায় তাহারা প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ জীব (সচেতন) জগৎ (অচেতন) ও ব্রহ্মের, স্বরূপ নির্দ্ধারণই হইল তাহাদের চিন্তার বিষয়। তাই উপনিষদে দেখিতে পাই,

কালঃ স্বভাবঃ নিয়তির্ যদৃচ্ছা।
ভূতানি যোনিঃ পুরুষেতি চিন্ত্যম্॥

শ্বেতাশ্বতর।

জগতের উৎপত্তি (যোনি) কোথা হইতে হইল ? কাল (Time) স্বভাব (Nature) নিয়তি (Law) যদৃচ্ছা (Chance)—ইহারাই কি জগতের হেতু ? জীব কি স্বয়ংই সৃষ্ট হইয়াছে, কিম্বা কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে ? ইহাই জ্ঞানযোগের আলোচনা।

অপর একদল মনীষি মনে করিলেন, জগতের মূল কারণ নির্ণয় করা এক তুরূহ ব্যাপার। নানা দার্শনিকের নানা মত—স্থির

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য। অথচ মানুষের আয়ু স্বল্প, বিঘ্ন বহু। তাহাদের মনে হইল "বাগ-বৈখরি শব্দ-ঝরি শাস্ত্রব্যাখ্যান চাতুরীতে" বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয়ের এক সহজ পন্থা আছে ; তাহা হইল প্রজ্ঞার (Conscience = বিবেক) নির্দ্দেশ অনুবর্ত্তন করা।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।

বনপর্ব্ব ৩১২—১১৭

ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রত্যেকেরই হৃদয়গুহায় নিহিত। উহার অনুসরণ দ্বারাই লোকে পরমার্থ লাভ করিতে পারে।

ঈশ্বর আছেন কি নাই এই প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই চরিত্রের উৎকর্ষ আছে— ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইতে হইলে কেবল চরিত্রের উৎকর্ষ-দ্বারাই তাহা সম্ভবপর। চরিত্রের উৎকর্ষদ্বারাই মানুষ দেবতুল্য হয়—দেবতা হয়। সাধনাদ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করা যায়। সাধনার মূল কথা হইল তিতিক্ষা—সুখের তৃষ্ণা ত্যাগ। ত্যাগের ফল প্রত্যক্ষ। সুখের তৃষ্ণা না থাকিলে দুঃখের পীড়নও সহ্য করিতে হয় না—মানুষ শান্তি পায়।

(১) দুঃখের অস্তিত্ব যে ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে (২) দুঃখের উৎপত্তি যে তৃষ্ণা হইতেই হয় তাহা যে বুঝিতে পারিয়াছে (৩) তৃষ্ণার লয় হইলেই যে দুঃখের অন্ত হয়, ইহা যে উপলব্ধি করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছে। (৪) তাদৃশ বিবুধ ব্যক্তিই অষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গে সঞ্চরণ করিয়া ধ্রুব শান্তিলাভ করিতে পারে।

যো চ বুদ্ধং চ ধর্ম্মং চ সংঘং চ শরণং গত।
চত্বারি আর্য্যসত্যানি সম্যক্ পঞ্ঞয়া পশ্যতি ॥
দুঃখম্ দুঃখ-সমুৎপাদং দুঃখস্য চ অতিক্রমং।
আর্য্যং চাষ্টাঙ্গিকং মার্গং দুঃখোপশমগামিনম্ ॥
এতং খু শরণং খেমং এতং শরণম্ উত্তমম্।
এতং শরণম্ আগম্য সর্ব্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতি ॥

ধর্ম্মপদ—১৪

ইহাই কর্ম্মযোগের কথা—গৌতম-বুদ্ধের আম্নায় (Gospel)। তাই গৌতম-বুদ্ধ কর্ম্মযোগের অবতার। তাহার ধর্ম্মতন্ত্র বিশুদ্ধ কর্ম্মযোগ (Ethics=বিনয়পিটক বা নীতিশাস্ত্র)। আন্বীক্ষিকির (Epistemology) বিভিন্ন মতবাদদ্বারা ইহাতে দিশাহারা হইতে হয় না। ইহার সহজ সত্য সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। সৎচিন্তা, সৎবাক্য ও সৎকর্ম্মই এই পথের সাধনা (১)। পাপের বর্জ্জন, পুণ্যের গ্রহণ ও চিত্তদমন, এই তিনটিই বুদ্ধদেবের উপদেশ।

সর্ব্বপাপস্য অকরণং, কুশলস্য উপসম্পদা।
সচিত্তপরিয়োদপণং, এতং বুদ্ধান শাসনম্॥

ধর্ম্মপদ ১৪-৫.

সার্ব্বভৌমিক বলিয়া ধর্ম্মপদের প্রতি শ্রদ্ধা, পরমতসহিষ্ণু ইউরোপে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

তাৎপর্য্য এই যে, আরণ্যকের চিন্তার ধারা দুইটী বিভিন্ন পথে প্রবাহিত ছিল। একটী জ্ঞানযোগের পথ——গুণাতীত কপিল ইহার দর্শনকার। জীব কী, ব্রহ্ম কী, মোক্ষ কী, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কী, তাহাই তথায় প্রধান প্রতিপাদ্য। ইহাকে Path of Metaphysics বলা যাইতে পারে। মহাবীর বর্ধমান জিন এই পথ লোক সমাজে প্রচার করেন।

দ্বিতীয়টী কর্ম্মযোগের পথ। ক্রতু (duty=কর্ত্তব্য) কী, পুরুষার্থ (End of Life) কী, প্রজ্ঞা (Conscience=বিবেক) কাহাকে বলে, নির্ব্বাণ (Beatitude—শমথ) কিসে পাওয়া যায়, তাহাই এই পথের আলোচনার বিষয়। পতঞ্জলি এই পথের দর্শনকার। ইহাকে Path of Ethics বলা যাইতে পারে। তথাগত গৌতম বুদ্ধ এই পথ লোক সমাজে প্রচার করেন।

---

(১) ধর্ম্মম্মপদ ২৬-৯; ২৫-২

রতু জরথুস্ত্র ও বেন রামচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণের কথা সুস্পষ্টভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাণীতে ভক্তিযোগ চরম বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তাই গাথায় দেখিতে পাই—

অথা নে অংহৎ যথা হ্বো বশৎ।

গাথা ২-৪

(সং-অথ নঃ অসতু, যথা স্বঃ বশতি।)

তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, আমাদের তাহাই হউক।

আর পৃশ্নি বলিতেছেন,—

যদি অন্তরিক্ষে যদি বাতে আস,
যদি বৃক্ষেষু যদি বোলপেষু।
যদ্ অশ্রবন্ পশব উদ্-যমানম্
তদ্ ব্রাহ্মণম্ পুনর্ অস্মান্ উপৈতু॥

পৃশ্নি—৮-১২ (আঙ্গিরস বেদ-৭-৬৬-১)

হে প্রভো, তুমি আকাশেই থাক আর বাতাসেই থাক, বনেই থাক আর তরঙ্গেই থাক, যেখানেই তুমি থাকনা কেন, তথা হইতে একবার আমাদের নিকটে এস। তোমার পদধ্বনি শুনিবার জন্য জীবগণ উত্‌কর্ণ হইয়া আছে।

আত্মসমর্পণই ভক্তিযোগের আদি ও অন্ত। ক্ষুদ্র-আমিকে (ক্ষর পুরুষকে) বৃহৎ-আমিতে (অক্ষর পুরুষে) লীন করিয়া দেওয়াই জীবনের সার্থকতা। ইহাকেই যীশু খ্রীষ্ট 'মরিয়া বাঁচা' (Die to live—take up the cross) বলিয়া বলিয়া গিয়াছেন (১)। ক্ষুদ্র-আমির বিনাশ দ্বারাই বৃহৎ-আমির বিকাশ সাধন করিতে হয়। কর্ম্মযোগীর পক্ষে ক্রতু, ভক্তিযোগীর পক্ষে পরমেশ্বর, আর জ্ঞানযোগীর পর-ব্রহ্মই, এই বৃহৎ-আমি। ইহাই

(১) Seth—Ethical Principles P. 214

তাহাদের জীবনের আশ্রয়, সাধনার অবলম্বন, আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। কর্ম্মযোগী ক্রতুতে (Duty), ভক্তিযোগী ঈশ্বরে (God) আর জ্ঞানযোগী পর-ব্রহ্মে (Absolute) আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। বৃহৎ-আমিই অধি-আত্মা ; বৃহৎ আমির জীবনই আধ্যাত্মিক জীবন।

আত্মসমর্পণের মূল প্রেমে——প্রেমই ভক্তির জীবাতু। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে কোনও কুণ্ঠা বোধ হয় না। পরং যাহাকে যতটা ভালবাসা যায়, তাহার জন্য ততটা স্বার্থত্যাগ করিতে পারা যায় ; তাহার জন্য আত্মবলিদানে তত তীব্র আনন্দ বোধ হয়। এই জন্য ঈশ্বরকে প্রিয়রূপে উপাসনা করাই ভক্তিযোগের সারকথা।

রফেধ্রম্ চগ্নাও যত **প্রিয়োপ্রিয়ায়** দইদীৎ।

গাথা ১০-২
যস্ন ৪৬-২

প্রিয়জন প্রিয়জনকে যে আনন্দ দেয়, তুমি সেই আনন্দ আমাতে উদ্দীপিত করো।

তাই পিতা-রূপে, পুত্র-রূপে, সুহৃদ-রূপে, সখা-রূপে, প্রিয়তম-রূপে, ভজনা করাই ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা। ইহার বীজ আমরা গাথা ও পৃশ্নি উভয়ত্রই দেখিতে পাই। যথা জরথুস্ত্র বলিয়াছেন,—

যা ফেধ্রোই বীদাৎ, পত্যয়ে চা,
বাস্ত্রেব্যো, অৎচা খত্রতবে,
অষাউনি অষবব্যো

গাথা ১৭ ৪
যস্ন ৫৩-৪

ধার্ম্মিকের নিকট মজ্দা, পিতারূপে, পতিরূপে, কর্ম্মীরূপে, মিত্র-রূপে, সাধুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

আর রামচন্দ্র বলিয়াছেন,—

স নঃ পিতা জনিতা, স উত বন্ধুঃ।

পৃশ্নি ৮ ১১
আঙ্গিরস বেদ ২-১-৩

তিনি আমাদের রক্ষক, তিনি আমাদের জনক, তিনি আমাদের বন্ধু।

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্রের নিহিত ভক্তিযোগের বীজকেই কালক্রমে ভারতের বৈষ্ণব পদাবলীতে ও পারস্যের সুফী পদাবলীতে পরিণত দেখিতে পাই।

জরথুস্ত্র ও রামচন্দ্র অথর্ব্ববেদের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পৌরাণিকগণের গণনায় এই যুগ ত্রেতা যুগ বলিয়া বিখ্যাত। ভার্গব জরথুস্ত্র সত্য ও ত্রেতার সন্ধিক্ষণে, আর আঙ্গিরস রামচন্দ্র ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। ইহার পরেই উপনিষদের যুগ।

প্রাচীনতম উপনিষদ্ "ঈশোপনিষদ" যজুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত। সেই সময় হইতেই উপনিষদ্ রচনার সূচনা বলা যাইতে পারে। উপনিষদ্ গুলির সার সঙ্কলন করিয়া গীতার রচনা। কিন্তু গীতায় প্রবর্ত্তিত স্বাধীন চিন্তার ফল, বর্দ্ধমানের 'মূলসূত্র', আর গৌতমের 'ধর্ম্মপদ'। গীতাই কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানাত্মক বৈদিক-পন্থার শক্তিকেন্দ্র।

ক্রতু (Duty—কর্ত্তব্য) করিয়া যাইতে হইবে, ইহাই কর্ম্মযোগের মূলসূত্র। পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, ইহাই ভক্তিযোগের মর্ম্মকথা। আর জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধিই জ্ঞানযোগের রহস্য। যোগেশ্বর গোবিন্দই এই তিনটী যোগের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন। সকল যোগের সমন্বয়স্বরূপ এই যোগের নাম রাজযোগ—ইহা যোগরাজ, রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য (২)।

(১) Pargiter—Ancient Indian Historical Traditions P. 177
(২) গীতা ৯-১

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করাই জীবের চরম ও পরম উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু জীব যতদিন দেহবদ্ধ, ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়না যাহার আছে, বিশুদ্ধ অদ্বৈতের আবৃত্তি, তাহার পক্ষে ততদিন কেবল প্রজ্ঞাবাদ—শুধু কথার কথা মাত্র। দেহবদ্ধ জীবের পক্ষে সগুণ ঈশ্বরের আরাধনাই ব্রহ্মলাভের উত্তম উপায়—প্রেমভক্তিই তাদাত্ম্যলাভের সেতুস্বরূপ। আবার কর্ত্তব্যপালনই ঈশ্বরানুরাগের অব্যভিচারি লক্ষণ। প্রজ্ঞার বাণী, ঈশ্বরেরই বাণী। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যে বিমুখ, তাহার ভক্তির কোন মূল্য নাই। উহা ক্ষেত্রভেদে ভ্রান্তি ও ক্ষেত্রভেদে ভণ্ডামি মাত্র। পবিত্র হৃদয়েই ঈশ্বরের বাস। অতএব ভক্তিযোগ আবার কর্ম্মযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈতজ্ঞানই চরম সত্য হইলেও, যতদিন দেহ আছে ততদিন ভক্তিযোগকে আশ্রয় করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আবার প্রজ্ঞার বাণীকে উপেক্ষা করিয়া ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া ছলনা ও আত্মবঞ্চনা মাত্র। অতএব কর্ম্মযোগই ধর্ম্মজীবনের প্রশস্ত ভিত্তি-ভূমি। কর্ম্মযোগের ক্ষেত্র সর্ব্বত্রই বিস্তৃত—বিশ্বসংসারময় 'কুরু'—ক্ষেত্র। হরিসেবার জন্য কিম্বা ব্রহ্মলাভের জন্য, সংসারত্যাগের কোনও প্রয়োজন নাই। সংসারে থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য (স্বধর্ম্ম) পালন করিয়া গেলেই, ঈশ্বর-দর্শন-পুরঃসর ব্রহ্মলাভ হয়, ইহাই গীতার বাণী। বেদান্ত তন্ত্রটী একটী ত্রিতল অট্টালিকার মত। কর্ম্মযোগ ইহার ভূমিগৃহ, ভক্তিযোগ ইহার মধ্যতল, আর জ্ঞানযোগ ইহার চন্দ্রশালা। ভূমিগৃহ ব্যতীত চন্দ্রশালা থাকিতে পারে না আর চন্দ্রশালা ব্যতীত ভূমিগৃহ অসম্পূর্ণ——অশোভন। গীতার কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানাত্মক ত্রিপিটক, এই বেদান্তসৌধের প্রত্যক্ষ রূপ। তাই গীতার উদ্‌-গাতা পরম গুরু গোবিন্দ, এই বিশ্বগোলকের একতম গতি। গোপ-গোপীদের ভাবাবেশে, হাফেজের অননুকরণীয় ভাষায় বলা যাইতে পারে,

ইম-রোজ[১] শাহ-এ[২] আঞ্জুমান-এ[৩],

দিল-বরান[৪] এক[৫] আস্ত্[৬]
×

দিল-বর[৭] আগর[৮] হাজারান[৯] বূদ[১০],

দিল[১১] বর[১২] আন[১৩] এক[১৪] আস্ত্[১৫]।
×

মনোচোরদিগের[৪] এই সভার অধিপতি[২] আজ[১] কেবল একজনই[৫]। যদিও[৮] হাজার হাজার[৯] মনোহর[৭] এথায় উপস্থিত[১০] আছেন, তথাপি প্রাণ[১১] একা[১৪] তাহা[১২]কেই[১৩] চায়।

শ্যামাদ্ অন্যো নহি নহি নহি প্রাণনাথো মমাস্তি।

শ্যাম ছাড়া আমার আর কেহ বল্লভ নাই—নাই, নাই, নাই,।

বৈদিক ইতিহাসের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে প্রথমে ভক্তিযোগ (জরথুস্ত্র + রামচন্দ্র), তৎপরে জ্ঞানযোগ (বর্দ্ধমান) ও পরিশেষে কর্ম্মযোগের (গৌতম) আবির্ভাব হইয়াছিল। মনস্ত-ত্বের (Psychology) বিচারে কিন্তু এই আনুপূর্ব্বীর ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে। দার্শনিকের নিকট প্রথম কর্ম্মযোগের, তৎপরে ভক্তিযোগের ও অতঃপর জ্ঞানযোগের উপপত্তি। দর্শনবিদ, সাধককে কর্ম্মযোগ, হইতে ভক্তিযোগের কক্ষায়, ও ভক্তিযোগ হইতে জ্ঞানযোগের কক্ষায় এইরূপে ক্রমশঃ নিম্ন হইতে উচ্চতর পটলে লইয়া যায়।

জীবনের উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে স্পষ্ট হউক অস্পষ্ট হউক সকলেই মনে মনে একটা ধারণা করিয়া লয়। ধারণা সকলের মনেই আছে. তাহাতে দার্শনিক ও অদার্শনিকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। প্রত্যে

ই যে দার্শনিক হ্রস্ব-দীর্ঘ বিচার দ্বারা সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আর দার্শনিক বিনা বিতর্কেই উদ্দেশ্যটীকে মানিয়া লয়। উদ্দেশ্যসিদ্ধির ন্যই লোকে কাজ করে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটেই ধারণা না থাকিলে কানও কাজেই অগ্রসর হইত না। উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই কাজ করে, ক্ষ্য আছে বলিয়াই অগ্রসর হয়। যে দিকে অগ্রসর হয়, তাহাই ক্ষ্য; অগ্রসর হয় অতএব উদ্দেশ্য আছেই।

আপাত দৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্য অসংখ্য বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে আমরা অহরহঃ যে উদ্দেশ্যের অনুসরণ করি তাহারা পরস্পর নিঃস্পৃক্ত নহে। একটী উদ্দেশ্যই মুখ্য, বাকীগুলি পরম্পরাক্রমে সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের সংসাধক,—উহাদের মধ্যে পরস্পর এইরূপ একটী সম্পর্ক আছে। ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক নাই, কেবলমাত্র বালক অথবা বাতুলের জীবনে। যাহার জীবন যত সুগঠিত, তাহার উদ্দেশ্যগুলি ততই শৃঙ্খলাযুক্ত—তাহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ততই পরিস্ফুট। মুখ্য উদ্দেশ্য একাধিক হইতে পারে না।

নিস্ত্‌ দর দাইরা × যুজ নুক্তা-এ,

ওহ্‌দত কম ও বেশ।

হাফেজ।

চক্রের মধ্যে কেন্দ্র একটীই—বেশীও নয়, কমও নয়।

একটী বৃত্তে দুইটী কেন্দ্র থাকে না জীবনে মুখ্য উদ্দেশ্যও দুইটী থাকিতে পারে না। কারণ উদ্দেশ্য দুইটীর মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, একটীকে প্রাধান্য দিতেই হইবে। নতুবা সমস্যার সমাধান হয় না—কোনও দিকেই অগ্রসর হইতে পারা যায় না। উদ্দেশ্য দুইটীর মধ্যে বিরোধ না থাকিলে, উদ্দেশ্য দুইটিকে মিলাইয়া লইয়া, মিলিত উদ্দেশ্যটীকে একটি উদ্দেশ্য, (আর উহাদিগকে সেই এক উদ্দেশ্যের বিভিন্ন অঙ্গ) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যেমন

যথায় কর্ত্তব্যপালন ও সুখলাভ এই দুইটী উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, তথায় কর্ত্তব্যপালনজনিত সুখকেই একটী উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। বিরোধস্থলে হয় কর্ত্তব্যপালনকে, নতুবা সুখকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। নতুবা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

আমরা জীবনে যে সমস্ত উদ্দেশ্য প্রধান বলিয়া মনে করি ঐ উদ্দেশ্যগুলি পরস্পর অনপেক্ষ নহে। উহারা অন্যোন্য-সাপেক্ষ। প্রায়শঃ একটী সাধ্য অপরটী সাধন, উহাদের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান। যেমন লোকে সাধারণতঃ বিদ্যা চায় ধনের জন্য, ধন চায় মানের জন্য, মান চায় সুখের জন্য। এস্থলে বিদ্যা, ধন, মান প্রভৃতি উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু মুখ্যউদ্দেশ্য নহে, গৌণ উদ্দেশ্য। সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে জীবনে মুখ্য উদ্দেশ্য মাত্র একটীই,—অন্যান্য সকলই গৌণ উদ্দেশ্য।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ একেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ো অ্ব্যবসায়িনাম্॥

গীতা ২-৪১

যাহারা বিচারশীল তাহারা জানেন যে জীবনে উদ্দেশ্য একটীই। যাহারা বিচারহীন তাহারাই উদ্দেশ্য বহুবিধ ও অসংখ্য বলিয়া মনে করে।

সেই উদ্দেশ্যটী কী? আমরা যাহাকে বলি জীবনের উদ্দেশ্য (End of Life) প্রাচীনেরা তাহাকেই বলিতেন পুরুষার্থ——পুরুষের প্রয়োজন, পুরুষের অভীষ্ট। পুরুষার্থ দুইটী——ধর্ম্ম (Duty—কর্ত্তব্য) ও কাম (Happiness—সুখ) (১)। ইহাদিগকেই

(১) Muirhead—Elements of Ethics P. 120.

সাধারণতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটীকে পুরুষার্থ বলা হয়। তন্মধ্যে মোক্ষ হয় শাশ্বত সুখেরই নামান্তর, নতুবা উহা অলৌকিক পুরুষার্থ। কারণ, আত্মা অমর কি বিনশ্বর, তাহা স্থির না জানিলে, মোক্ষ সম্বন্ধে কোনও

উপনিষদে বলা হইয়াছে শ্রেয়স্ (The good—কল্যাণ) ও প্রেয়স্ (The pleasant—সুখ)। আমরা যে কোনও কাজেই প্রবৃত্ত হই, তাহা হয় আমাদের কল্যাণকর, নয় আমাদের প্রীতিজনক বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হই।

অন্যচ্ শ্রেয়স্ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়স্।
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ॥

কঠোপনিষদ্।

প্রাকৃত জন প্রেয়সের মোহে মুগ্ধ হইয়া শ্রেয়সকে পরিত্যাগ করে। প্রেয়সের পথ হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া তাহাকে শ্রেয়সের পথে প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য। ধীরব্যক্তি শ্রেয়সের পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন।

শ্রেয়স্ হি ধীরো অভিপ্রেয়সো বৃণীতে।

কঠ

কাম (অর্থাৎ সুখ) জীবনের উদ্দেশ্য হইবার যোগ্য নহে; ধর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ত্তব্যের পালন) ই প্রকৃত পুরুষার্থ।

প্রথমতঃ সুখ দুঃখ বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে না, 'মাত্রা" অর্থাৎ মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

ধারণা বা বাসনা হয় না। মোক্ষ জনসাধারণের কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু নহে। লৌকিক পুরুষার্থ তিনটী—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। ইহাদিগকে ত্রিবর্গ বলে।

এখানে অর্থ শব্দ দ্বারা ধনসম্পত্তি বুঝিলে চলিবে না। ধনসম্পত্তি শক্তির প্রতীক, ঘনীকৃত শক্তি। অর্থ বলিতে এখানে শক্তি বুঝিতে হইবে। ধনসম্পত্তিই হউক, আর শক্তি হউক, অর্থের কোনও স্বতন্ত্র মূল্য নাই। সুখলাভের, অথবা কর্ত্তব্যপালনের সাধনস্বরূপে অর্থের যা কিছু মূল্য। অতএব ধর্ম্ম আর কাম এই দুইটীই স্বতন্ত্র পুরুষার্থ।

কামের অর্থ সুখ; রিরংসা বা শৃঙ্গারেচ্ছা নহে। নিষ্কাম-কর্ম্ম অর্থ সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া যে কাজ করা যায় তাহাই। কাম (happiness) ও কামনা (desire) এক কথা নয়। নিষ্কাম অর্থ যাহাতে সুখ অর্থাৎ সুখের বাসনা নাই। কোনও কামনা নাই—এমন নহে। কল্যাণের কামনা তাহাতে আছেই। কামনা ব্যতীত কোনও কর্ম্মই হইতে পারে না।

মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনো অ্‌নিত্যাস্‌ তাংস্‌ তিতিক্ষ্‌স্ব ভারত॥

গীতা ২-১৪

অতএব বাহ্যবস্তুর অন্বেষণে কোনও লাভ নাই। সুখের আশায় যাহা আকাঙ্ক্ষা করা যায়, মাত্রার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুই দুঃখের অঙ্কুশ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এক অবস্থায় যাহা সুখকর, অবস্থাভেদে তাহাই দুঃখকর হয়। অবস্থাধীনে লোকে পুত্রের মৃত্যুও কামনা করিয়া থাকে।

যান্যেব পুরুষঃ কুর্ব্বন্‌ সুখৈঃ কালেন যুজ্যতে।
পুনস্‌ তান্যেব কুর্ব্বাণো দুঃখৈঃ কালেন যুজ্যতে॥

শান্তিপর্ব্ব ২৮৭-৮৫

একদিন লোকে যাহা করিয়া সুখ পায়, আবার আর একদিন তাহাতেই দুঃখ পায়।

যথার্থতঃ আকাঙ্ক্ষার সময়েই বস্তু সুখকর বলিয়া মনে হয়। তাহার পরে সেই মনোহারিত্ব তাহার আর থাকে না।

বাঞ্ছাকালে যথা বস্তু তুষ্টয়ে নান্যদা তথা।

যোগবাশিষ্ঠ।

আহরণের পূর্ব্বেই বস্তুর যা কিছু আকর্ষণ। একবার অধিগত হইলেই, আবার নূতন নূতন বস্তুর দিকে বাসনা প্রধাবিত হয়।

ন জাতু কামঃ কামানাম্‌ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

আদিপর্ব্ব ৭৫-৫০

বাসনার পরিপূর্ত্তি নাই। তাম্বালাসের চষকের ন্যায়, সছিদ্র কলসের ন্যায়, উহাকে কখনও আকণ্ঠ পরিপূরণ করা যায় না।

ন প্রাপ্নোতি ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্তৈরপি মহাধনৈঃ।
নান্তঃ সম্পূর্ণতাম্‌ এতি করণ্ডক ইবাম্বুভিঃ

যোগবাশিষ্ঠ ১-১৬-৩

যদি কাহারও নিখিল বাসনাই সফল হয়, তবেই সে সুখী হইতে পারে। নতুবা বাসনার অপূরণ জনিত বিক্ষোভ তাহার থাকিয়াই যায়। নিখিল বাসনা চরিতার্থ করা অসাধ্য; তাহা অপেক্ষা বাসনা পরিত্যাগ করাই বরং সুসাধ্য।

যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাং ত্যজেৎ
প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥

শান্তিপর্ব্ব ১৭৭-৬

বস্তুগত্যা, বাসনা দমনই সুখলাভের উত্তম পন্থা।

যদ্ যদ্ ত্যজতি কামানাং তৎ সুখস্যাভিপূর্য্যতে।
কামানুসারী পুরুষঃ কামান্ অনু বিনশ্যতি ॥

শান্তিপর্ব্ব ১৭৪-১৫

দ্বিতীয়তঃ, প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মিলস্ "কামকারের অনবস্থা" (Paradox of Hedonism) নামক একটী তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। সুখকে অন্বেষণ করিলেই আর সুখ পাওয়া যায় না; সুখকে ভুলিয়া থাকিলে তবে সুখ পাওয়া যায়। ছায়াকে ধরিবার চেষ্টা করিলে ছায়া স্থির হইয়া ধরা দেয় না, ধরিবার চেষ্টা না করিলে স্থির হয়।

যে মুহূর্ত্তে লোক প্রশ্ন করে "আমি কি সুখী?" সেই মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত সুখ উবিয়া যায়। সুখভোগের জন্য যেরূপ মনের অবস্থার প্রয়োজন, সুখ অন্বেষণকারীর মনের অবস্থা সেরূপ থাকিতে পারে না। অতএব সুখলাভকেই যদি জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করাও যায়, তথাপি সুখের অন্বেষণ জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সুখের অনুসন্ধান করিলে সুখ মিলিবে না। সুখাতিরিক্ত অপর কিছুকে জীবনের লক্ষ্য করিলে তবে সুখ মিলিতে পারে (১)।

(১) Mohit Sen—Elements of Moral Philosophy P. 159.

আপূর্য্যমানম্ অচল-প্রতিষ্ঠম্,
সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাঃ যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিম্ আপ্নোতি ন কামকামী॥

গীতা ২-৭০

তৃতীয়তঃ সুখের মধ্যে উচ্চাবচ শ্রেণিভেদ আছে। সর্ব্ববিধ সুখই সকলের নিকট উপাদেয় নহে। মদ খাইয়া নরদামায় পড়িয়া থাকার মধ্যে হয়ত একপ্রকার সুখ আছে, কিন্তু একজন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পক্ষে সে সুখের আস্বাদনে প্রবৃত্তি হয় না। কোন ঘটনাটী সুখকর হইবে তাহা সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর নির্ভর করে।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

গীতা ১৭-৩

মদ্যপানের সুখ অপেক্ষা কাব্যালোচনার সুখ যে উচ্চকোটীর তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। নিম্নকোটিতে থাকিয়া সুখী হওয়া অপেক্ষা উচ্চকোটিতে থাকিয়া দুঃখভোগ করাও গরীয়ান্। শূকরের ন্যায় সুখভোগ করা অপেক্ষা, সক্রেটিশের ন্যায় দুঃখভোগ করাই মানুষের পক্ষে অধিক বাঞ্ছনীয় (১)।

আমিষে গৃধ্যমানানাং অশুভং বৈ শুনামিব
আমিষং নৈব নোহীষ্টং আমিষস্য বিবর্জ্জনম্॥

শান্তিপর্ব্ব ৭-৯

গলিত শবদেহ ভক্ষণের যে সুখ, তাহা কুক্কুরেই চায়, মানুষে চায় না অতএব সুখকে পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করিলেও, যে কোন সুখকেই বিনা বিতর্কে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বরণ করা যায় না আদর্শচরিত্র লোকাত্তর মহাপুরুষের যে সুখ, কেবল তাহাই জীবনে

(১) Mills—Utilitarianism chap II.

উদ্দেশ্য হইবার যোগ্য। আদর্শচরিত্র পুরুষের সুখের আস্বাদন পাইতে হইলে, নিজকেও আদর্শচরিত্র হইতে হইবে—সাত্ত্বিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

গীতা ১৭-৪

সাত্ত্বিক ব্যক্তিই দেবতার পূজা করিতে ভাল বাসে। তামসিক ব্যক্তি রাক্ষসেরই চরিত্রেই আকৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মপথের অনুসরণ দ্বারাই আদর্শ চরিত্র লাভ করা যায়। অতএব সুখকে যদি পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করাও যায়, তথাপি অধম সুখ পুরুষার্থ নহে বিধায়, কোন সুখটী জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে ধর্ম্মই তাহার নির্ণায়ক। অতএব ধর্ম্ম (Rectitude) সুখ হইতে জ্যায়ান্।

সুখের মধ্যে একটী উচ্চ একটী নীচ, এইরূপ প্রকারগত ভেদ স্বীকারের একটা ব্যঞ্জনা আছে। যদি সুখের মধ্যে কেবল পরিমাণগত ভেদই থাকিত, তাহা হইলে সুখকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়ত কোনও বাধা থাকিত না। কিন্তু প্রকারগত ভেদ স্বীকার করাতে বুঝিতে হইবে যে, সুখের অতিরিক্ত এমন কোনও পদার্থ আছে, যাহার সদ্ভাব একটী সুখকে উচ্চ শ্রেণীতে, আর যাহার অভাব আর একটী সুখকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়া দেয়। ধর্ম্মই সেই পদার্থ, যাহা সুখের উচ্চাবচ শ্রেণিভেদের কারণ। অতএব কেবল ধর্ম্মেরই অনপেক্ষ মূল্য আছে, সুখের মূল্য ধর্ম্মের সংশ্রবের উপর নির্ভর করে।

ধর্ম্মো নিত্যো সুখদুঃখে ত্বনিত্যে।
জীবো নিত্যো হেতুর্ অস্য ত্বনিত্যঃ॥

উদ্যোগপর্ব্ব ৪০-৯২

ধর্ম্মের গৌরবই নিত্য——অন্যনিরপেক্ষ। সুখের গৌরব অনিত্য, ধর্ম্মের সাপেক্ষ। অতএব ধর্ম্মই পরম পুরুষার্থ।

ধর্ম্ম এব কৃতঃ শ্রেয়ান্ ইহলোকে পরত্র চ।
তস্মাদ্ হি পরমং নাস্তি যথা প্রাহুর্ মনীষিনঃ॥

শান্তিপর্ব্ব ২৮৯-৬

ধর্ম্মই পরম পদার্থ। তাহা অপেক্ষা উচ্চতর পদার্থ আর কিছুই নাই।

নিখিল জীবের মধ্যে কেবল মানুষেরই ধর্ম্মজ্ঞান আছে। চুরি করার দরুণ অনুতাপ শৃগালের হয় না, মৃগশিশু হত্যার পাপ ব্যাঘ্রকে স্পর্শ করে না।

মানুষেষু মহারথ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্ততে।
ন তথাঅন্যেষুভূতেযু মনুষ্যরহিতেষ্বিহ॥

শান্তিপর্ব্ব ২৯৪-২

আমরা মানুষের মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা বুঝি, ধর্ম্মই তাহা উপাদান। ধর্ম্মের সহিতই মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ নিত্য। সুখদুঃখ ই প্রাণীতেও বিদ্যমান। ধর্ম্মজ্ঞান কেবল মানুষেরই আছে, এই মানুষই সকলের শ্রেষ্ঠ জীব।

গুহ্যং তদ্ ইদং বো ব্রবীমি ব্রহ্ম,
ন মানুষাচ্ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ॥

শান্তিপর্ব্ব ২৯৯-২০

যাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, কেবল সুখ দুঃখের জ্ঞান আছে, সে প অপেক্ষা উন্নত নহে।

প্রজ্ঞা হি নৃণাম্ অধিকো বিশেষঃ।
প্রজ্ঞা বিহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

উত্তর গীতা ২-৪৪

অতএব ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যত্বের লোপ হয়।

ধর্ম্ম এব হতঃ হন্তি ধর্ম্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ ধর্ম্মং ন ত্যজেত মা তে ধর্ম্মো হতো অবধীৎ ॥

বনপর্ব্ব ৩১২-১২৮

অতএব শ্রেয়স্ই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, প্রেয়স্ জীবনের উদ্দেশ্য নহে। প্রেয়সকে পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না, জীবন সার্থক হয় না। কয়েকদিন ধরিয়া শুধু সুখ খুজিয়া বেড়াইলেই দেখা যায় কোন কিছুতেই আর সুখ পাওয়া যায় না।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

গীতা ২-৪৪

বস্তুগত্যা সুখের জন্য বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করা মূর্খতা মাত্র। মনেতেই সুখের অবস্থান, বাহ্য পদার্থে নহে। আকাঙ্ক্ষা করি বলিয়াই বস্তু সুখকর হয়, সুখকর বলিয়াই আকাঙ্ক্ষা করি, এমন নহে।

সর্ব্বে লাভাঃ সাভিমানাঃ ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
সন্তোষনীয়রূপোহসি যস্ লোভাদ্ অবমন্যসে ॥

শান্তিপর্ব্ব ১৮০-১০

"লাভ অভিমানের (Mentality—মানসিক-সংস্থা) উপর নির্ভর করে" এটা অতি সত্য কথা। মানুষ স্বরূপতঃ আনন্দময়—অভাবের গ্লানি তাহার নাই। লোভবশতঃ অভাবগ্রস্ত মনে করিয়া সে নিজকে নিরানন্দ করিয়া তোলে। অভিমানের পরিবর্ত্তন দ্বারাই সে সুখী হইতে পারে।

অভিমানই (মনের ব্যগ্রতাই) বস্তুকে সুখকর বলিয়া প্রতীত করায়। নতুবা বস্তুতে কোনও সুখ নাই। সুখ আমাদের অন্তরেই অবস্থিত। কস্তুরী মৃগের ন্যায় বাহ্য বস্তুতে উহার স্থিতি অনুমান করিয়া আমরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করি।

প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে যে মানুষ নিজেই তাহার সুখ দুঃখের সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাম্ ভোক্তৃত্বে হেতুর্ উচ্যতে।

গীতা ১৩-২১

এই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে মানুষ যখন নিজের শক্তির কথা জানিতে পারে, তখন সুখের জন্য আর বিষয়ের পাছে পাছে সে ছুটিয়া বেড়ায় না।

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদ্ অয়ম্ অস্মীতি পুরুষঃ।
কিমর্থং কস্য কামায় শরীরং অনুসঞ্জরেৎ॥

বৃহদারণ্যক।

এই ব্যক্তি সুখ দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

দুঃখেষ্ব্ অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

গীতা ২-৫৬

ইনিই প্রকৃত কর্ম্মযোগী।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্ নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

গীতা ১৮-২৬

তিনি কর্ত্তব্য বলিয়াই কর্ত্তব্য করিয়া যান।

কার্য্যম্ ইত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে অর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

গীতা ১৮-৯

আর ইহাই কর্ম্মযোগ।

নিয়তং সঙ্গরহিতং অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে॥

গীতা ১৮-২৩

তিনি লাভ ক্ষতি সুখ দুঃখের কোনও বিচার করেন না।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপং অবাপ্স্যসি॥

গীতা ২-৩৮

কর্ত্তব্য সাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

গীতা ২-৪৭

জীবমাত্রই ত্রিগুণের অধীন—সুখের বন্ধন তাহাদের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য কিন্তু সাধক গুণাতীত—সুখের পাশ তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না।

ত্রৈগুণ্য-বিষয়াঃ বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

গীতা ২-৪৫

পাপ করে লোকে সুখের প্রলোভনে। সাধকের নিকট সুখের কোনও মূল্য না থাকায় তিনি নিরন্তর পুণ্যকর্ম্মেই ব্যাপৃত থাকেন। সাত্ত্বিক কর্ম্মই তাহার একমাত্র অবলম্বন।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।

গীতা ২-৪৫

গৌতম বুদ্ধের ভাষায় বলিতে গেলে ইহারই অনুধ্বনি হয়,

সর্ব্বং পাপস্যাকরণং কুশলস্যোপসম্পদা।
সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধান শাসনম্॥

ধর্ম্মপদ ১৪-৫

ইহার নাম নিষ্কামকর্ম্ম—সুখের কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান। নিষ্কাম কর্ম্ম আর কর্ম্মযোগ একই কথা। গৌতম বুদ্ধ নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মযোগের তীর্থঙ্কর। সুখের তৃষ্ণা ত্যাগপূর্ব্বক সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইহাই তাহার একমাত্র অনুশাসন। ঈশ্বরের কথা বলিতে গেলেই লোকে নানাবিধ তর্ক তোলে, তাই ধর্ম্মরাজ গৌতম ঈশ্বরানুরাগের কোনও উপদেশ দিয়া যান নাই। সাত্ত্বিক কর্ম্মই তাহার অনুশাসন।

সাত্ত্বিক কর্ম্ম কাহাকে বলে ? কুশলের স্বরূপ কি ?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া গীতাকার যেরূপ সার্ব্বভৌমিক লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সুখম্ আত্যন্তিকং যৎতদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিন্নচেতসা॥

গীতা ৬-অধ্যায়

"ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি যে কার্য্যে তৃপ্তিলাভ করে তাহাই ক্রতু (কর্ত্তব্য)। আত্মা নিজরুচি অনুসারে উহাতে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া স্বাধীনতার আনন্দ উহাতে সে পায়। এই আনন্দ ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—বুদ্ধিগম্য। ইন্দ্রিয়ের বিকলতার দরুণ উহার আস্বাদে বিঘ্ন ঘটে না। ইহাই যথার্থ আনন্দ——নিত্য আনন্দ। কালের পরিবর্ত্তন বশতঃ উহার পরিবর্ত্তন হয় না। যাহাকে ফেলিয়া আর কিছুই পাইতে ইচ্ছা করে না, গুরুতর দুঃখের আশঙ্কাও যাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না তাহাকেই যোগ (কর্ত্তব্যের পথ) বলিয়া জানিবে। ইহা দুঃখের সংস্পর্শ হইতে মুক্ত। দৃঢ় সংকল্পের সহিত অক্লান্তহৃদয়ে এই যোগের অভ্যাস করিবে।"

রমলানামক উপন্যাসের মুখবন্ধে জর্জ্জ ইলিয়ট যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ

সংজ্ঞা বলিয়া বর্ত্তমানযুগের দার্শনিকগণ আদর করিয়া থাকেন। তিনি বলিয়াছেন "নিজের ও পরের জন্য, অর্থাৎ জগতের সকলের জন্য, পৃথুল চেতনা ও বিপুল বেদনা অনুভব করাই মহাজনোচিত শ্রেষ্ঠ সুখলাভের একমাত্র পন্থা। কিন্তু এই সুখ এত ব্যথা বিজড়িত যে, যদি আমাদের অন্তরাত্মা শ্রেয়-সের সন্ধান পাইয়া ইহাকে ভূয়িষ্ঠ কাম্য বলিয়া মনে না করিত, তবে ইহাকে সুখ নামে অভিহিত করিবার কোনই কারণ থাকিতনা।"

"We can only have the highest happiness, such as goes along with being a great man—by having wise thoughts and much feeling for the rest of the world as well as ourselves; and this sort of happiness often brings so much pain with it, that we can only tell it from pain, by its being what we would choose before every thing else because our souls see it is good"

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।

জর্জ ইলিয়ট যাহা বলিয়াছেন গীতাতে তো তাহা আছেই— তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীও গীতাতে বলা হইয়াছে।

ইলিয়ট বলিয়াছেন, মহাজনোচিত শ্রেষ্ঠ সুখ (highest happiness as goes along with being a great man)। গীতা বলিয়াছেন, যোগসেবা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির আনন্দ। ইলিয়ট বলিয়াছেন ব্যথা হইতে ইহার প্রভেদ কেবল এই (we can tell it from pain by)। গীতা বলিয়াছেন, গুরু দুঃখও ইহা হইতে বিচলিত করিতে পারে না। ইলিয়ট বলিয়াছেন সব ছাড়িয়া ইহাকেই পছন্দ করি (what we would choose before every thing else)। গীতা বলিয়াছেন, যাহা পাইলে অপর লাভকে ইহা অপেক্ষা অধিক মনে করে না।

ইলিয়ট এখানে গীতার আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু এই আনন্দ যে আত্মার স্বরূপে অবস্থানের আনন্দ——কণিকাতে সৎচিদানন্দের আভাস——গীতা তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়া (যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্ন্ আত্মনি তুষ্যতি) ইহার দার্শনিক ভিত্তি যোজনা করিয়াছেন, এই আনন্দের নৈসর্গিক শ্রেষ্ঠত্বের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইলিয়ট তাহা করেন নাই।

যাহা হউক ক্রতুই (Duty—কর্ত্তব্য) আমাদের জীবনের অবলম্বন, ইহাই কর্ম্মযোগের মূলতত্ব।

কোনটী কর্ত্তব্য কোনটী অকর্ত্তব্য প্রজ্ঞাই তাহা বলিয়া দেয়। প্রজ্ঞার বাণীতে নির্ভর করিলে, কর্ত্তব্য নির্ণয়ে আর কোন ও ক্লেশ হয় না।

যমো বৈবস্বতো দেবঃ যস্ তবৈষ হৃদিস্থিতঃ।
তেন চেদ্ অবিবাদস্ তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ॥

মনু সংহিতা ৮-৯২।

যে জ্যোতিষ্মান্ নিয়ন্তা তোমার হৃদয়গুহায় অবস্থিত, তাহার সহিত যদি তোমার বিবাদ না থাকে, তবে তোমার গঙ্গায় যাইবারও প্রয়োজন নাই, কুরুক্ষেত্রে যাইবারও প্রয়োজন নাই। প্রজ্ঞার অনুবর্ত্তনই জীবনের নিঃশ্রেয়স্।

প্রজ্ঞা (Conscience—বিবেক) আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত কিন্তু আমাদের অধীন নহে। তাঁহার আদেশ আমরা অনুবর্ত্তন না করিয়া পারি, কিন্তু প্রজ্ঞাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারি না। সাক্ষীর ন্যায় আমাদের প্রত্যেক কার্য্য সে দেখিতেছে, নিরপেক্ষ বিচারকের ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যের ন্যায়ান্যায় সে বিচার করিতেছে। আমরা চাই আর না চাই, প্রজ্ঞা আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

গীতা ১৮-৬১

সারথি যেমন রথারূঢ় ব্যক্তিকে যতস্ততঃ লইয়া যায়, প্রজ্ঞাও তেমন আমাদিগকে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত করায়।

প্রজ্ঞার অনুশাসন আবার সকলের হৃদয়েই অভিন্ন। প্রজ্ঞা একজনকে সত্যকথা বলিতে ও আর একজনকে মিথ্যা কথা বলিতে বলে না, একজনকে চুরি করিতে ও অন্য জনকে দান করিতে বলে না। সকলকেই সত্যকথা বলিতে বলে, সকলকেই দয়া করিতে বলে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রজ্ঞা অবস্থিত নহে। প্রজ্ঞা সকলকেই একবিধ অনুশাসন করে,—সকলের হৃদয়ে একই প্রজ্ঞা অবস্থিত।

এক এব শাস্তা ন দ্বিতীয়োহ্স্তি শাস্তা॥
যো হৃচ্ছয়স্ তম্ অহম্ অনুব্রবীমি॥

অশ্বমেধপর্ব্ব ২৬-৬

এক ব্যতীত দ্বিতীয় শাস্তা নাই। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চের মূল অনেকগুলি নহে। একটী মাত্র ইহার মূল—তাহা সকলের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত।

ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুর্ অব্যয়ম্।

গীতা ১৫-১

প্রজ্ঞার উপর আমাদের কোনও আধিপত্য নাই—কারণ আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রজ্ঞা আমাদের দোষত্রুটীর বিচার করে। প্রজ্ঞা তো আমাদের অধীন নহে, বরং আমরাই প্রজ্ঞার অধীন; কারণ প্রজ্ঞারই প্রেরণাতে আমরা কর্ত্তব্যকর্ম্মে বিনিযুক্ত হই। আবার সকলের হৃদয়ে একই প্রজ্ঞা বিদ্যমান। ইহা যে বুঝিতে পারিয়াছে, একই শক্তি সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকলকে সমানভাবে শাসন করিতেছে ইহার মূল যে অনুসন্ধান করিয়াছে, পরমেশ্বরে আস্থা তাহার পক্ষে দূরের কথা নহে। পরমেশ্বরই ধর্ম্মের শাশ্বত উৎস——প্রজ্ঞা ঈশ্বরেরই বাণী।

জনে জনের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া তিনিই সকলকে লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

গীতা ১৮-৬১

যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু পবিত্র, সুন্দর ও উদার, তাহা পরমেশ্বরেরই বিকাশ।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদ্ উর্জ্জিতমেব বা।

তৎ তদ্ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজো অংশসম্ভূতম্॥

গীতা ১০-৪১

অকপট ভক্তিই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ ত্বনন্যয়া।

গীতা ৮-২২

ইহাই ভক্তিযোগের কথা——পৃশ্নি ও গাথার বাণী।

আরও একটু আলোচনা করিলে সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে উপস্থিত হইতে হয়——দ্বৈতবাদ ছাড়িয়া দিয়া অদ্বৈতবাদে উপনীত হইতে হয়।

জগৎ যখন বিনশ্বর, তখন অনাদিনিধন পরব্রহ্ম একজন আছেনই। জগৎ পরিবর্ত্তনময়, কিন্তু সকল পরিবর্ত্তনের অন্তরালে অপরিবর্ত্তনীয় একটা কিছু না থাকিলে, পরিবর্ত্তনকে পরিবর্ত্তন বলিয়া বুঝা যাইত না। তীর স্থির আছে বলিয়াই, নদীতে যে স্রোত বহিতেছে তাহা বুঝা যায়। যাহার সহিত তুলনা করিয়া সমস্ত পরিবর্ত্তনকে পরিবর্ত্তন বলিয়া বুঝা যায়, সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে যিনি স্থির, তিনিই ব্রহ্ম (১)।

আব্রহ্মভুবানল্ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনো অর্জ্জুন।

মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্ জন্ম ন বিদ্যতে॥

গীতা ৮-১৬

(১) Priyanath Sen—Philosophy of Vedanta P. 87

ঈশ্বর যখন সৌন্দর্য্যের আকর, তখন কুৎসিৎ কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বর যখন পুণ্যময় তখন পাপের উদ্ভব হইল কোথা হইতে? ঈশ্বর যখন শুভঙ্কর, তখন অশিবের সৃষ্টি করিল কে? অতএব ঈশ্বরেরও পরে এমন এক সত্তা আছেন যাহার নিকট পাপ ও পুণ্য, আলোক ও অন্ধকার, শুভ ও অশুভ, সবই সমান।

যিনি অনন্ত, তিনি শুভ দ্বারাও অবচ্ছিন্ন নহেন, অশুভ দ্বারাও অবচ্ছিন্ন নহেন। ভালতেও যেমন তিনি, মন্দতেও তেমন তিনিই বর্ত্তমান। আলোকও যেমন তাহা হইতে, অন্ধকারও তেমন তাহা হইতে। তাহাতেই সকল সমস্যার সমাধান। তিনি সৎও বটেন, অসৎও বটেন।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তৎ নাসদ্ উচ্যতে।

গীতা ১৩-১৩

ঈশ্বর ব্রহ্মেরই প্রকাশ (১)—জল জমিয়া বরফ হইয়াছে।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

গীতা ১৪-২৭

পরব্রহ্ম সর্ব্বগুণময়, অতএব নির্গুণ।

স হি সর্ব্বগুণৈশ্চৈব নির্গুণৈশ্চৈব কথ্যতে।

শান্তিপর্ব্ব ৩৩৪ ৪১

যাহা উষ্ণও বটে শীতলও বটে, অম্লও বটে, মধুরও বটে, হ্রস্বও বটে দীর্ঘও বটে, তাঁহাকে শুধু শীতল, শুধু মধুর ও শুধু দীর্ঘ বলা চলে না। লাল, নীল, পীত, হরিৎ, মেচক প্রভৃতি বর্ণের যাহা সমাহার, তাহা লালও নহে, নীলও নহে, পীতও নহে, হরিৎও নহে। সূর্য্যরশ্মিতে সর্ব্ববিধ বর্ণের সমাবেশ আছে —ত্রিকোণ কাচফলক ধরিয়া দেখিলেই টের পাওয়া যায়—এই জন্য সূর্য্যের আলোকের কোনও বিশিষ্ট বর্ণ নাই। ব্রহ্ম, শুভেরও আধার, অশুভেরও আধার, ন্যায়েরও মূল অন্যায়েরও মূল, সত্যেরও আলয় মিথ্যারও আলয়। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্যের অতীত ——সম্পূর্ণ

(১) Radhakrishnan—An Idealist View of Life P. 109

উদাসীন। ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য, নৈতিক উন্নতির জন্য, পরব্রহ্ম হইতে সহায়তা দুর্ল্ভ। ধর্ম্মের শাশ্বত উৎসরূপে, মঙ্গলের নিদানরূপে, ন্যায়ের অধিষ্ঠাতারূপে, সগুণ ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যকতা আছেই। আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান যদি সত্য হইয়া থাকে, প্রজ্ঞার প্রেরণা যদি অলীক না হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্মজ্ঞানের প্রেরকরূপে, ন্যায়াধীশ মঙ্গলময় ঈশ্বর একজন আছেনই। যদি আত্মচৈতন্যকে অবিশ্বাস না করি, তবে আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান আছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। আর ধর্ম্মজ্ঞান থাকিয়া থাকিলে তাহার অধিষ্ঠাতা ও প্রেরকরূপে সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেই হইবে। "ধর্ম্ম আছে এতএব ঈশ্বর আছেন"। ইহাই ঈশ্বরে বিশ্বাসের সহজ পন্থা। যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া, তাঁহার ইচ্ছাই ধর্ম্মনীতি বলিয়া মনে করেন, তাহারা উল্টা পথে চলেন। কোনও কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলে, তাহারা ন্যায়ান্যায় জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া যথেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। পরন্তু এই পথে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়াও, এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখার দরুণই, অনেকে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকেন। কারণ এই উল্টা পথে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কেহ যদি বলেন যে নরহত্যা ও লাম্পট্যদ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করা যাইতে পারে, তবে অনেকে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দলবদ্ধ অত্যাচার দ্বারা ঘোরতম অনর্থের সৃষ্টি করেন, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রজ্ঞার প্রেরণা আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। প্রজ্ঞার অস্তিত্ব হইতে ন্যায়ের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের অনুমান করা স্বাভাবিক। প্রজ্ঞা আছে একথা বলিয়াছেন গৌতম বুদ্ধ। আর প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর আছেন এই কথা বলিয়া গিয়াছেন রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"— তিনি প্রজ্ঞার প্রেরক। "বংহেউস্ দজ্‌দা মনং হো"—তিনি প্রজ্ঞার সংস্থাপক। নির্গুণ পরব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য হইতে পারেন কিন্তু সগুণ ঈশ্বর ব্যবহারিক সত্য। 'ব্যবহারিক সত্য' অর্থ 'মিথ্যা

নহে—সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ। ব্যবহারিক জীবন যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে সগুণ পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতেই হইবে! জীবন যদি স্বপ্ন না হইয়া থাকে, তবে ন্যায়ান্যায় বিবেকও স্বপ্ন নহে; আর ন্যায়ের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরও স্বপ্ন নয়। আর জীবন যদি স্বপ্ন হইয়া থাকে, আত্মচৈতন্যে যদি বিশ্বাস করিতে না পারা যায়, তবে জাগরণ যে স্বপ্ন হইতে বরীয়ান, ইহাই বা লোকে বুঝিবে কিসের সাহায্যে? প্রতি-পদেই নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হয়; কেবল ধর্ম্মজ্ঞানের বেলায়, উহাকে উপেক্ষা করিবার কারণ কী?

পরন্তু যাহা সগুণ তাহা সান্ত। যাহা ভাল, তাহা মন্দ নহে; যাহা সত্য তাহা মিথ্যা নহে। সত্য মিথ্যা দ্বারা অবচ্ছিন্ন, ভাল, মন্দ দ্বারা খণ্ডিত। যাহা অবচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত, তাহা চূড়ান্ত তত্ত্ব নহে। কারণ অবচ্ছেদকের ব্যাখ্যা সে দিতে পারে না। অতএব সগুণ ঈশ্বর চূড়ান্ত তত্ত্ব নহে, নির্গুণ পরব্রহ্মই চূড়ান্ত তত্ত্ব—পারমার্থিক সত্য।

পরব্রহ্ম অনন্ত। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও পদার্থই জগতে থাকিতে পারে না। থাকিলে, ঐ পদার্থ দ্বারা ব্রহ্ম খণ্ডিত হইয়া পড়েন। আর ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও পদার্থই যখন জগতে নাই, তখন জীব ব্রহ্মেরই অংশ। সকল সান্তকে অবলম্বন করিয়াই অনন্ত বর্ত্তমান, সান্তকে পরিত্যাগ করিয়া নহে। সান্তের ভিতর দিয়াই অনন্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে, অতএব জীব মাত্রই ব্রহ্মের প্রকাশ। নিরন্তর নিদিধ্যা-সনদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইয়া, ব্রহ্মতাদাত্মলাভই জ্ঞানযোগের উপদেশ। ইহাই জ্ঞানযোগের অনু-শাসন।

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা।
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মম্ এতৎ॥

শ্বেতাশ্বতর।

মহাবীর বর্দ্ধমান (১) এই অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন

লাভালাভে সুখে দুঃখে জীবিতে মরণে তথা।
সমো নিন্দা প্রশংসাসু তথা মানাবমানয়োঃ॥

মূলসূত্র (উত্তরাধ্যয়ন সূত্র) -১৯-৯০

তাহার নিকট জীবন মরণ উভয়ই সমান।

বৌদ্ধ-তন্ত্রের ন্যায় জৈন-তন্ত্র ও শুধু দার্শনিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ধ বিশ্বাসের স্থান তথায় নাই। এই জন্য বিচারশীল ইউরোপের স্থানে স্থানে জৈন-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। (২)

পুরুষার্থ কী তাহা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রজ্ঞার সন্ধান পাই। প্রজ্ঞার অনন্তত্ব ও নিবন্ধন—অর্থাৎ প্রজ্ঞার অনুশাসন সকলের নিকটই সমান, আর সকলেই "উচিত" মনে করিয়া ঐ শাসনের অনুবর্ত্তন করিতে নিজকে বাধ্য মনে করে, এই কথা—বিচার করিয়া, আমরা প্রজ্ঞাকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া মনে করি। ঈশ্বরের অনন্তত্ব সম্বন্ধে ধারণা করিতে গিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি করি। এইরূপে কর্ম্মযোগ হইতে ভক্তিযোগে, ও ভক্তিযোগ হইতে জ্ঞানযোগে উপনীত হই।

ধর্ম্মসাধনার এই তিনটী ছাড়া অন্য পথ নাই। অনুলোম-বিলোম ক্রমে ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট। তন্মধ্যে কোনও তন্ত্র কর্ম্মযোগ প্রধান,—যেমন বৌদ্ধ তন্ত্র। কোনওটী জ্ঞানযোগ প্রধান—যেমন জৈন তন্ত্র। বাকীগুলি ভক্তিযোগ প্রধান।

(১) বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বাধ্যায় "ধর্ম্মপদ"। ইহা তথাগত গৌতমের শ্রীমুখের বাণী। চীন-বর্ম্মা-জাপানে শ্রমনগণ আজও প্রত্যহ ইহা পাঠ করেন।

জৈন সম্প্রদায়ের স্বাধ্যায় "মূলসূত্র"। ইহা মহাবীর বর্দ্ধমানের শ্রীমুখের বাণী।

(i) Winternitz—A History of Sanskrit Literature Vol II—P. 466

(ii) Stevenson—Heart of Jainism—P. 43

(২) Hare—Religions of the Empire—P. 230

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র



দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মৃতি (পুরাণ)—গীতা-কুসুম

[সংগঠন—Consolidation (of the Vedic church)]

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতা।

কঠোপনিষৎ।

"মানুষের হৃদয়গুহায়, ক্ষর ও অক্ষর আত্মা, ছায়া ও আতপের ন্যায় বিরাজমান।" যাহারা পাঁচবার উপাসনা করেন (অর্থাৎ ইরাণীয়) আর যাহারা তিনবার উপাসনা করেন (অর্থাৎ ভারতীয়) সকল ব্রহ্মবিদ্‌ই একথা বলিয়া থাকেন।

—○—

বেদের যাহা অন্ত (End বা উদ্দেশ্য) তাহাই "বেদান্ত।" কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের স্ফুরণ বৈদিক যুগেই হইয়াছিল। উহাদের প্রচার ঋগ্বেদেই আমরা দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন,

(ক) যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাস্,
তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্।

ঋগ্বেদ—১-১৬৪-৫০

অতিমানবগণ-যজ্ঞের জন্যই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

এস্থলে "কর্ত্তব্য বলিয়াই কর্ত্তব্য করা" (Duty for Duty's sake), সুখের লালসায় নহে, কর্ম্মযোগের যে এই মূলসূত্র তাহা স্থাপিত করা হইয়াছে।

(খ) সখে সখায়ম্ অজরো জরিম্নে,
অগ্নে মর্ত্ত্যান্ অমর্ত্ত্যস্ ত্বং নঃ।

ঋগ্বেদ-১০-৮৭-২১

হে অগ্নি, তুমি অজর, আর আমরা জরাগ্রস্ত ; তুমি অমর, আর আমরা মরণশীল। তথাপি তোমাকে সখা বলিবার সৌভাগ্য তুমি আমাদিগকে দিয়াছ।

ঈশ্বরেরপ্রেমই ঈশ্বরকে লাভ করিবার একমাত্র পন্থা। সেই চির সুহৃদের স্নিগ্ধ আহ্বান যে শুনিতে পাইয়াছে, সে ভক্তিযোগের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেদ এখানে তাহাই বলিলেন।

(গ) অহম্ মনুর্ অভবম্ সূর্য্যশ্চাহম্।
কক্ষীবান্ ঋষির্ অস্মি বিপ্রঃ॥

ঋগ্বেদ-৪-২৬-১

আমিই মনু, আমিই সূর্য্য, আমিই বিজ্ঞ কক্ষীবান্ ঋষি।

জ্ঞানযোগের মূলসূত্র "সোঽহম্" অর্থাত্ আমিই ব্রহ্ম। জগত্ ব্রহ্মময়,—ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, থাকিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সকলই এক মূল আমিরই রূপান্তর মাত্র। চন্দ্র, সূর্য্য, হিমালয় পর্ব্বত, বা বামদেব ঋষি, সকলই এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ। যাহা হিমালয় পর্ব্বতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই বামদেব ঋষি হইতে পারিত। যাহা বামদেব ঋষি হইয়াছে, তাহাই হিমালয় পর্ব্বত হইতে পারিত, কঙ্কণ কুণ্ডল হইতে পারিত, কুণ্ডল কঙ্কণ হইতে পারিত, উভয়েই এক। আমি ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই, জ্ঞানযোগের এই মূলতত্ত্ব বেদ এখানে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

পঞ্চদশী।

যা। প্রমাণ করিতে কোটি কোটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সার শ্লোকার্দ্ধে বলিয়া দিতেছি। "ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, আর তুমিই সেই ব্রহ্ম"।

কর্ম্মযোগের সার কথা ক্রতুনিষ্ঠা। ভক্তিযোগের সারকথা প্রেমরসে ঈশ্বরারাধনা। জ্ঞানযোগের সারকথা ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যোপলব্ধি। এতাবতা সকল যোগের সার কথাই বেদে বলা হইয়াছে: ইহাই বেদের অলৌকিকত্ব———অপৌরুষেয়ত্ব। বেদে অবান্তর কথা না আছে এমন নয়, চাষার সঙ্গীত না হউক চাষের সঙ্গীত তাহাতে না আছে এমন নয়, কিন্তু বেদই গীতার জনক, গীতা বেদেরই ক্রমবিকাশ। বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক গবেষণা বেদে প্রচারিত সত্যকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই, বেদ এখনও নিষ্প্রয়োজন হয় নাই। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা যদি কোনও দিন চলিয়া যায়ও, তথাপি একটা ঐতিহাসিক আগ্রহ (historical interest) বেদে চিরকাল ধরিয়াই বর্ত্তমান থাকিবে। (১) কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার কাতন্ত্র (manual) স্বরূপে, ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বেদের এখনও আছে। বেদে প্রকাশিত মূলতত্ত্বগুলির সত্যতা এখনও অবিসম্বাদিত। তাহারা ধ্রুব সত্য।

কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান-রূপ পরমার্থলাভের ত্রিবিধ পন্থা বেদেই নির্দ্দিষ্ট আছে। উপনিষদ্ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছে, আর ব্রহ্মসূত্র ন্যায়যুক্তি প্রয়োগে (Syllogistic reasonings) তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। এই জন্য উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র এই উভয় গ্রন্থকেই বেদান্ত নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

উপনিষদ্ বলিতে আমরা প্রধানতঃ উপনিষদ্-ত্রিতয়কেই বুঝিব—কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক। তন্মধ্যে কঠোপনিষদ্ কর্ম্মযোগ প্রধান।

অন্যত্ শ্রেয়স্ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়স্।
তে উভে নানার্থে, পুরুষং সিনীতঃ॥

(১) Maxmuller—History of Ancient Sanskrit Literat

শ্রেয়স্ (good—duty) ভিন্ন, আর প্রেয়স্ (pleasure) ভিন্ন, এই বাণীদ্বারা কঠোপনিষত্ বর্ত্তমানযুগের বিনয়শাস্ত্রের (Ethics—নীতিশাস্ত্র) মূলতত্ত্বটী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই আমরা "ভক্তি" কথাটীর প্রয়োগ প্রথম দেখিতে পাই। "যস্য দেবে পরাভক্তির্, যথা দেবে তথা গুরৌ"।

রুদ্র যত্ তে দক্ষিণং মুখম,
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

এই বাক্যটী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে গৃহীত হইয়া, ব্রাহ্ম সমাজের নিত্য প্রার্থনায় ব্যবহৃত হয়। সগুণ ঈশ্বরের (Personal God) আরাধনা, ভক্তিবাদের ভিত্তি। 'বাম মুখ' হইতে বিভিন্ন, রুদ্রের 'দক্ষিণ মুখ'। 'দক্ষিণ' বিশেষণটী সগুণত্বের সূচক।

আর মুণ্ডিতশির সন্ন্যাসীর সংহিতা মুণ্ডকোপনিষত্ বলিতেছেন

ব্রহ্মৈবেদং অমৃতং পুরস্তাদ,
ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।

সকলদিকেই কেবল ব্রহ্ম—সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়, কোন দিকেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। জগত্ ব্রহ্মময়।

বৈদিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা উপনিষত্, আর বৈদিক তত্ত্বের যুক্তি ব্রহ্মসূত্র, উভয়েই বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদের যাহা অন্ত (End বা উদ্দেশ্য) তাহাই "বেদান্ত"। (১)

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্ত-তন্ত্র কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। তীর্থঙ্কর ধর্ম্মরাজগণ অনুপ্রেরণার বলে জানিতে পারিয়া যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, দার্শনিকপ্রবর বাদরায়ণ ন্যায়তর্কের যুক্তি-শৃঙ্খলা দ্বারা তাহাদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য অগণিত। তাহাদিগকে মুখ্যতঃ কর্ম্ম-প্রধান, ভক্তিপ্রধান, ও

(১) Bloomfield—The Religion of the Veda. P. 51

জ্ঞানপ্রধানভেদে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আচার্য্য উমাস্বাতি জ্ঞানযোগের, (১) আচার্য্য রামানুজ ভক্তিযোগের, আর আচার্য্য নাগার্জ্জুন কর্ম্মযোগের মুখপাত্র (২)। শঙ্কর সকলের সমালোচক।

উমাস্বাতির সূত্র অদ্বৈত-নিষ্ঠ—ব্রহ্মই তাহার উদ্দেশ্য। রামানুজ-ভাষ্য দ্বৈতনিষ্ঠ--জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই তাহার বিষয়। নাগার্জ্জুনের কারিকা অদ্বয়নিষ্ঠ—আত্মাই তাহার পরম পদ। উমাস্বাতি জ্ঞানযোগী জৈন (শৈব) দের, রামানুজ ভক্তিযোগী বৈষ্ণবদের, আর নাগার্জ্জুন কর্ম্মযোগী বৌদ্ধ (গাণপত্য) দের প্রধান আশ্রয়।

একমাত্র বেদান্ততন্ত্রেই কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটী যোগের অখণ্ড সমাবেশ আছে। তাই বেদান্তাশ্রিত হিন্দুতন্ত্র ও পার্শীতন্ত্রই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম। ইসাহিপন্থায় জ্ঞানযোগের অসদ্ভাব—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের ধারণা তথায় অনাদৃত। ইহুদী ও ইস্‌লাম পন্থায় জ্ঞানযোগ তো নির্ব্বাসিত বটেই, ভক্তিযোগও তাদৃক পরিস্ফুট নহে। পরমেশ্বরকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবার প্রেরণা তথায় নাই। যিহোবা বা আল্লা, দণ্ডপাণি রাজার মত কঠোর ও নির্ম্মম। অথচ প্রেমই ভক্তিযোগের ভিত্তি। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা সাড়া দেয় না, তাহাকে কেহ ভালবাসিতেও পারে না (৩)। পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা-পতি-পত্নীর তীব্র ব্যাগ্র ব্যাকুল আত্মহারা প্রেম লইয়া ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হওয়াই ভক্তিযোগের সার্থকতা—তাঁহার সহিত অভিন্নতা লাভের উপায়। কবোষ্ণ তাপ জলকে বাষ্প করিতে পারে না—তজ্জন্য তীব্র উত্তাপের প্রয়োজন। তাপের মাত্রা ঈষদ্ ন্যূন হইলেও ইঞ্জিন অচল থাকে। রাজার দরবারে প্রেমোন্মাদের সম্ভাবনা কম। যে প্রেমে উন্মত্ততা আনে না, তাহা আত্মবিসর্জ্জনের প্রেরণা পাইবে কোথা হইতে? জীবনের

(১) Farquhar—Outline of Religious Litarature —P. 164

(২) Radha Krishnan—Indian Philosophy vol I—P. 649

(৩) A Being who is incapable of loving is also incapable of being loved.

Zwemer—The Muslim Doctrine of God P. III

ভারকেন্দ্র যখন নিজ হইতে সরিয়া গিয়া অপরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই প্রেমের প্রবৃত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে যাহা তাহা প্রেমের অভিনয় মাত্র; প্রেমের আস্বাদ তাহাতে নাই। দয়িতের সুখই যাহার একমাত্র কামনার বিষয়, দয়িতের ইচ্ছাপূরণের নিমিত্তই যাহার জীবনধারণ, তিনিই প্রকৃত ভক্তিযোগী। রাজার আদেশ পালনে, হৃদয়ের যোগ নাই। তাহা ভক্তিযোগের কলিমাত্র, বিকসিত কুসুম নহে।

জ্ঞানযোগের অসদ্ভাব ও ভক্তিযোগের অবিকাশজনিত ইস্লামের এই মূল ত্রুটী সংশোধনের যে চেষ্টা, তাহার নাম সূফী-আন্দোলন। সূফী বাদের স্পষ্ট অভিব্যক্তি কোরাণে নাই (১)। এই জন্য সূফীশ্রেষ্ঠ আবু সৈয়দ বলিয়া গিয়াছেন যে কো রাণের ঁ ভাগে (অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ অধ্যায়ে) সূফীবাদের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে (২)। জরথুস্ত্র যাহার প্রিয়, আর যাহা জরথুস্ত্রের প্রিয়, সেই পুণ্যভূমি ইরাণই সূফীবাদের সূতিকাগৃহ (৩)। পারসিক সাধক মনসুর, জ্ঞানযোগের ভিত্তিস্থানীয় সোহংবাদ (আন আল হক—আমিই ব্রহ্ম) প্রচার করিবার অপরাধে শূল দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। বাণীর বরপুত্র হাফেজ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,

১ ২ ৩
বশদ নক্স-এ 'আন আল হক',
×

বর জমিন খূন
×

(১) (i) Nicholson—The Idea of Personality in Sufism P. 9
(ii) Iqbal—Persian Metaphysics P. 97
(২) Nicholson—Studies in Islamic Mysticism P. 59
(৩) (i) Nicholson—Studies in Islamic Mysticism P. 16[illegible]
(ii) Hurgronje—Muhammadianism P. 80

৭ ৯ ১০

চূঁ মনসূর   গর কশি

×

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

বর দার-ম   ইম শব ॥

×

৯ ১৪ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৮

যদি এই রাত্রে আমাকে শূলে চড়াইয়াও দেও, তথাপি মনসূরের

৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

মত, আমার রক্ত, মাটীর উপর 'আন আলহক" এই কয়টী অক্ষর

১

অঙ্কিত করিয়া দিবে।

আর পারসিক মহাকবি জালাল-উদ্‌ দীন রুমি প্রেমের কাহিনী-দ্বারা মুস্‌লিম জগতে ভক্তির বন্যা বহাইয়াছিলেন। তাহার কাব্য "মশনবী" কোরাণের মতই সম্মান পাইয়া থাকে।

মশনবী-এ মৌলভী-এ মানবী।

হস্ত্‌ কোরাণ দর জবান-এ পহ্লবী ॥

পুণ্যাত্মা মৌলবীর "মশনবী," পহ্লবী ভাষার কোরাণ।

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষে দার্শনিক কবি ইকবাল বলিতেছেন, 'কি উ বা হরফ-এ পহ্লবী কোরাণ নবিস্ত্‌'

তিনি (জালাল-উদ্‌-দীন) পহ্লবী ভাষায় কোরাণ লিখিয়া গিয়াছেন।

রুমির প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রিয়তমের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু তাহা মুসলমান শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে বলিয়া তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন (১)।

বোস্তামী, শিবলী, জুনৈদ প্রভৃতি সুফীসম্প্রদায়ের উত্তুঙ্গ আচার্য্যগণ সকলেই পারসিক, পরন্তু দার্শনিক যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারা সুফীবাদের

(১) Claud Field—Persian Literature P. 152

প্রাণপ্রতিষ্ঠা যিনি করিয়াছেন, তাঁহার নাম ইমাম গজ্জলি (১)। ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের অভাবজনিত ত্রুটির সংশোধন করিয়া, ইসলামকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, পারস্যের এই বরেণ্য সন্তানের গৌরবজনক অন্বর্থক উপাধি হইয়াছিল, 'হাজ্জত-এ ইসলাম' বা 'ইসলামের প্রমাণ'। (২)

কর্ম্মযোগের অবতার গৌতম। তাঁহার অনুশাসন 'ধর্ম্মপদ"। ভক্তিযোগের যুগল অবতার রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র। তাঁহাদের আম্নায় "পৃশ্নি" ও "গাথ."। জ্ঞানযোগের অবতার বর্দ্ধমান। তাঁহার উদান মূলসূত্র (উত্তরাধ্যয়নসূত্র)। আবার সকল যোগের সমাহার, যোগেশ্বর গোবিন্দের গীতা।

এই গ্রন্থপঞ্চক বেদান্তের স্বাধ্যায়। 'উপনয়ন'-সংস্কারদ্বারা হিন্দু আর 'নবজাত' (৩) সংস্কারদ্বারা পার্শী, যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া দ্বিজত্বলাভ করিয়া থাকে। হিন্দু পৃশ্নিতে, আর পার্শী গাথাতে, প্রবেশলাভ করিয়াছে, যজ্ঞোপবীত তাহারই নিদর্শন। পরন্তু পৃশ্নি, গাথা, গীতা, ধর্ম্মপদ, ও মূলসূত্র এই পাঁচটী গ্রন্থকেই স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করাই দ্বিজত্বলাভের সার্থকতা। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের আদর্শ স্বাধ্যায়েই (Scripture) নিবদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন কালে অবস্থিত জনসমূহের চিন্তাধারার ঐক্যসাধন স্বাধ্যায়দ্বারাই সম্ভবপর। স্বাধ্যায়ই জাতীয় ঐক্যবন্ধনের মুখ্য যোগসূত্র। যে জাতির মধ্যে স্বাধ্যায়নিষ্ঠা যত প্রবল সেই জাতির ঐক্যবন্ধনও তত দৃঢ়। এক-স্বাধ্যায়তাই সংঘশক্তির অন্যতম নিদান। কোরাণে অবিচলিত নিষ্ঠাই বিরাট্ মুসলমান সমাজকে একটীমাত্র সঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত

(১) (i) Macdonald—Religious Aspect of Islam P. 6

(ii) Zwemer—Ghazzali (A Moslem Seeker after God) P. 147

(২) Browne—Literary History of Persia Vol II—296

(৩) Taraporewala—The Religion of Zarathushtra P. 110

রাখিয়াছে। সে নিষ্ঠা (হিন্দুর বেদনিষ্ঠার অনুরূপ) কেবল মৌখিক সম্মানেই পর্য্যবসিত নহে, নমাজে আবৃত্তিদ্বারা প্রত্যহ তাহা সঞ্জীবিত। প্রত্যেক মুসলমানেরই, এমন কি নিরক্ষর মুসলমানেরও, কোরাণের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় আছে———বেদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে এমন হিন্দু, শিক্ষিতসমাজেও দুর্লভ। (১)

অথচ জাতীয় ঐক্য স্বাধ্যায়ের উপর অবলম্বিত। স্বাধ্যায়ের পাঠ গৃহস্থের পক্ষে তপস্যা-স্বরূপ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে।

গীতা ১৭-৫

আর্য্যতন্ত্রের স্বাধ্যায়পঞ্চকের মধ্যে ধর্ম্মপদ পূর্ব্বাহ্নে, পৃশ্নি-গাথা মধ্যাহ্নে, ও মূলসূত্র সায়াহ্নে পাঠ করিতে হইবে। আর গোবিন্দের গীতা, সদা সর্ব্বদা নিত্যদা পাঠ্য। পৃশ্নিগাথার মধ্যে, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রামচন্দ্রের পৃশ্নি কৃষ্ণপক্ষের, আর হিম-কুন্দ-মুক্তাধবল জরথুস্ত্রের গাথা শুক্লপক্ষের আহ্নিক। এই সংহিতাপঞ্চকে অধ্যারূঢ় হইলে আর কোনও শাস্ত্রপাঠের আবশ্যকতা থাকে না।

যদ্ ইহাস্তি তদ্ অন্যত্র যন্ নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।

হিন্দুর পক্ষে ত এই পৃশ্নিগাথা নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায় বটেই, মুসলমানের পক্ষেও ইহাদিগকে স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করিবার হেতু পুষ্কল। কারণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ইসলাম পন্থা জারথুস্ত্রতন্ত্রের প্রতিবিম্বস্বরূপ—কোরাণ গাথার ভাষ্য বিশেষ। এই জন্য কোরাণ যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন আরবীয় নেতাগণ মনে করিতেন যে হজরত মহম্মদ, পারসিক প্রবর সলিমান হইতেই কোরাণের পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকেন (২)।

জগতে প্রচলিত প্রধান ধর্ম্মতন্ত্রের সংখ্যা সাত। তন্মধ্যে চারটি

(১) মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী—বেদ পরিচয়—পৃঃ ২৮২

(২) কোরাণ ১৬-১০৫

অর্থাৎ হিন্দু-তন্ত্র, পার্শী-তন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, ও জৈনতন্ত্র আর্য্যজাতিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অপর তিনটী, অর্থাৎ ইহুদিপন্থা, খ্রীষ্টপন্থা ও ইসলামপন্থা সেমিতিক শাখায় উদ্ভূত হইয়াছে। সেমিতিক শাখায় ইহুদীতন্ত্রই মূল পন্থা—খ্রীষ্টপন্থা ও ইসলাম, ইহুদীতন্ত্রের অভিনব সংস্করণ মাত্র (১)। যীশু খৃষ্ট সন্ন্যাসের আদর্শ, আর হজরত মহম্মদ বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ, ইহুদিতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। একেশ্বরবাদ ও নিরাকারোপাসনা ইহুদিতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ইহুদিগণ পার্শীতন্ত্র হইতেই উহাতে দীক্ষালাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে বেবিলোনিয়ার সম্রাট নেবুকাদনেজারের রাজত্বকালে, ইহুদিগণ মঘবদ্‌দিগের (জারথুস্ত্র দিগের) সংস্পর্শে আসে, (২) কিন্তু তদবধি তাহারা একেশ্বরবাদী ও নিরাকারোপাসক সম্প্রদায়ে পরিবর্ত্তিত হয় (৩)। তৎপূর্ব্বে তাহারা বহুদেববাদী ও মূর্ত্তিপূজক ছিল। ইহুদি-দিগের তীর্থরাজ জেরুসালেমে, প্রধান দেবতা বা-আলের ন্যায়, আষ্টরথ প্রভৃতি অন্যান্য দেবতারও মন্দির ছিল; কিন্তু ঐ সকল মন্দিরে, ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহসকল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছিল পার্শীদিগের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই ইহুদিগণ বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজার প্রত্যাখ্যান করে———আর এই দুইটী মতই ইহুদিপন্থার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। অতএব ইহুদীপন্থাটী যে সেমিতিক জাতির উপর পার্শীতন্ত্রের অনুপ্রেরণার ফল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই (৪)। এই জন্যই সূফীবাদের আদিম উপদেষ্টা হরিত্‌-প্রভ জরথুস্ত্রকে, হজরত মুশার ধর্ম্মগুরু বলিয়া কোরাণ ইঙ্গিত করিয়

(১) (i) Hurgronje—Muhammadianism P. 61
(ii) Koran—46-11

(২) Wells—The Out line of History P. 173

(৩) Macdonell—Comparative Religion P. 129-136

(৪) Casartelli—Philosophy of the Mazda-yasnia Religion P. 48

গিয়াছেন (১)। আর ইহুদিদিগের থোরা (Penta-teuch) ইসাহিদিগের ইঞ্জিল (Bible) আর মুসলমানদিগের কোরাণের অগ্রণী, স্পেন্ত ও অংগ্রমন্যুর পৃথককারী গাথাকে (ফুরকানকে), ঈশ্বরের প্রেরিত পুস্তক বলিয়া কোরাণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (২)। এই জন্যই পার্শীদিগকে আহেল্‌-এ কিতাব বা শাস্ত্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়া অঙ্গীকার করাই কোরাণের আশয় (৩)। ইসলামপন্থা পরম্পরাক্রমে পার্শীতন্ত্র হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পার্শীতন্ত্রের মূলগ্রন্থ গাথাই ইসলামের আদি বীজ——অতএব প্রত্যেক মুসলমানের নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায়।

কেবল উৎপত্তি দ্বারা নহে, লক্ষণদ্বারা বিচার করিলেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। একেশ্বরবাদ ও মূর্ত্তিপূজা-প্রতিষেধ, এই দুইটী সত্যই ইহুদি-খৃষ্টান-মুসলমানাত্মক সেমিতিক পন্থাত্রয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমি। ভিত্তিস্থানীয় এই দুইটী সত্য যেমন সকল সেমিতিক পন্থাগুলিই মজ্‌দা-যস্ন হইতে সম্প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট লক্ষণও তেমন ইহারা মঘপতি জরথুস্ত্রের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে।

নারায়ণ জরথুস্ত্র ভক্তিযোগের অবতার। তাহার ভক্তিযোগ (Devotion to God—ঈশ্বরনিষ্ঠা) আবার কর্ম্মযোগের (Devotion to duty—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা) উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মযোগ ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক ভেদে দ্বিধা বিভক্ত। একের লক্ষণ ন্যায়ের প্রসার ও অপরের লক্ষণ অন্যায়ের প্রতিরোধ (৪)। তন্মধ্যে ইহুদিপন্থায় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, আর ইসলাম পন্থায় অন্যায়ের প্রতীকার, সবিশেষ

(১) কোরাণ—১৮-৬৫

(২) কোরাণ—৩ ২

(৩) (i) কোরাণ—২২-১৭

(ii) Rezvi—Parsis (A People of the Book) P. 3

(৪) Dhalla—Zaroastrian Theology P. 33

পরিস্ফুট। কর্ম্মযোগের দুইটী মূলসূত্রের এক একটীকে ইহারা প্রত্যেকে নিজেদের বিশিষ্ট লক্ষণ রূপে গ্রহণ করিয়াছে। পরন্তু ইহুদিপন্থায় বা ইসলামপন্থায় ভক্তিযোগ তেমন পরিস্ফুট নহে। উভয়ত্রই ঈশ্বরকে দণ্ডধর রাজার ন্যায় কল্পনা করা হইয়াছে প্রেমময় পিতার ন্যায় কল্পনা করা হয় নাই (১)। পরন্তু পরমেশ্বরকে পিতারূপে কল্পনা করা ইসলামের মতে দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় (২) কিন্তু প্রেমই ভক্তির প্রাণ—ভয়ে ভক্তি শুকাইয়া যায়। তাই ভক্ত-সাধক কবি বলিয়াছেন

হাফেজ না গোলাম আস্ত্
×

৫ ২ ৭ ৮
কি আজ খ্বাজা গুরিজদ্।
×

৯ ১৩ ১১ ১২ ১০
লুৎফ কুন ও বাজ আ
×

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
কি খারাব-অম জে আতাবত॥
×

১ ৩ ২৪ ৫ ৮ ৯ ১৩ ১১
হাফেজ তো আর গোলাম নয় যে তিরস্কারের ভয়ে পালাইয়া যাইবে। দয়া কর, ও কাছে এস, আমি তিরস্কারের অতীত। 'আমি ডরাই না তুই চোখ রাঙ্গালে—আমি নই আটাশে ছেলে।'

প্রেম আকর্ষক, ভয় বিকর্ষক। প্রেমে আত্মসমর্পণ স্বাভাবিক ও মধুর, ভয়ে নিয়মপ্রতিপালন যন্ত্রের ক্রিয়ার ন্যায় প্রাণহীন। বিদ্রোহের

---

(১) Macdonald—Vital Forces of Christianity and Islam —P. 222

(২) Amirali—Spirit of Islam. P. 122

বীজ তথায় সুপ্ত আছে। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরকে পিতা সম্বোধন করিয়া সেমিতিক জাতিকে অভিনব প্রেমের বার্ত্তা শুনাইয়াছিলেন। এই প্রেমের রহস্যে তিনি অতি শৈশবেই পারস্যের সাতজন 'মঘবদের' নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন (১)। গ্রীক বাইবেলে (মথি—১-১) শিশু যীশুখৃষ্টের উপদেষ্টা পূর্ব্বদেশীয় এই সপ্তর্ষিকে মঘি (Magi) নামেই অভিহিত করা হইয়াছে (২)।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ আর পরমাপিতায় প্রেম, এই তিনটীই যথাক্রমে ইহুদি, ইসলাম, ও খ্রীষ্টপন্থার বিশিষ্ট লক্ষণ। আবার এই তিনটী লক্ষণই গাথার বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। ন্যায়ের অনুবর্ত্তনকে গাথায় বলা হইয়াছে অষা (সং-ঋত), অন্যায়ের প্রতিরোধকে বলা হইয়াছে ক্ষথ্র (সং-ক্ষত্র), আর প্রেমের ব্যাকুলতাকে বলা হইয়াছে শ্রুষ (সং-শুশ্রূষা)। এই তিনটী তত্বকে তিনটী মুখ্য 'অমেষা স্পেন্ত' বা পুণ্য নীতি বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। অতএব সেমিতিক তন্ত্রের যাহা সাধারণ লক্ষণ, একেশ্বরবাদ ও মূর্ত্তিপূজা- রাহিত্য, আর ইসলামপন্থার যাহা বিশিষ্ট লক্ষণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাহা সমস্তই জারথুস্ত্রপন্থা হইতে উপলব্ধ। অতএব গাথাকেই ইসলামের বীজমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

বহিরঙ্গ সম্বন্ধে এই কথা—অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে যুক্তি আরও প্রবল। ইসলামের অন্তরঙ্গ সূফীপন্থা (৩)। সূফীপন্থা অধ্যাত্মবাদের (অর্থাৎ ক্ষর আত্মা হইতে উচ্চতর, অক্ষর আত্মা বা অধি-আত্মা মানুষের আছে,

(১) অথর্ব্বান্ জরথুস্ত্র প্রতিষ্ঠিত সংঘের নাম—"মঘ"। অনুচরদিগের সংজ্ঞা-"মঘবৎ"।

যস্ন—৫১-১৫ ; ৫১-১৬

(২) Haug—Essays on the Sacred Language writings and Religion of the Parsis. P 3

(৩) Nicholson—Studies In Islamic Mysticism Preface—VI)

এই সত্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত। (ক) প্রজ্ঞাকে অধি-আত্মার বাণী মনে করা (খ) নিরন্তর অধি-আত্মার ভূমিতে অবস্থান, আর (গ) অধি-আত্মাতে ঈশ্বরদর্শন, এই তিনটী সত্যই সূফীপন্থার সার-সর্ব্বস্ব।

অথচ অধি-আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোরাণ একেবারে নির্ব্বাক (১) আর গাথা চটুল মুখর (২)। ডেনমার্কের শাহজাদাকে বাদ দিয়া হ্যামলেটের অভিনয়ের ন্যায়, অধি-আত্মাকে বাদ দিয়া সূফীপন্থার প্রচার চেষ্টা, শিবহীন দক্ষযজ্ঞের মত নিরর্থক, তাই পারসিক শ্রেষ্ঠ ইমাম গজ্জলি পারস্যের জাতীয় স্বাধ্যায় 'গাথা' হইতে আহরণ করিয়া আধ্যাত্মবাদ ইসলামে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন (৩)। অপিচ তাহার চেষ্টায় সূফীবাদের প্রচলনদ্বারা ইসলামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া পারস্য-গৌরব গজ্জলি, ইসলামের দ্বিতীয় পয়গম্বর-রূপে (৪) পূজা পাইয়া আসিতেছেন। সূফীবাদ যদি ইসলামের মর্ম্মকথা হইয়া থাকে, তবে গাথা পাঠ মুসলমানের পক্ষে অপরিহার্য্য নিত্যকর্ম্ম।

আর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ইসলামের এই উভয় অঙ্গই গাথা হইতে আহরণ করার দরুণ, ইসলামকে জারথুস্ত্র তন্ত্রের আরব্য সংস্করণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। হয়ত ইহা সূচিত করিবার জন্যই হজরত মহম্মদ ইহুদিদিগের ন্যায় দৈনিক তিনবার উপাসনা প্রথা পরিবর্ত্তিত

---

(১) (i) Lammens—Islam (Belief & Institutions) P. 112
(ii) Zwemer—The Muslim Doctrine of God. P. 57
(iii) Zwemer—The Disintegration of Islam. P. 95

(২) যস্ন—২৮—২; ৪৩—৩।

(৩) Zwemer—Al Ghazzali (A Moslem Seeker after God)—P. 53

(৪) (i) Browne Literary History of Persia Vol II. P. 176
(ii) Zwemer—Al Ghazzali (A Moslem Seeker after God)—P. 21

করিয়া, জরথুস্ত্রপন্থীদের অনুরূপ দৈনিক পাঁচবার উপাসনার প্রথা মুসলমান সমাজে প্রবর্ত্তিত করেন (১)।

কারণ অথর্ব্বান জরথুস্ত্র প্রচারিত সত্যগুলিকে বাদ দিলে ইস-লামের বৈশিষ্ট্য বলিতে আর কিছুই থাকে না। (ক) একেশ্বরবাদ (খ) মূর্ত্তিপূজা-প্রতিষেধ (গ) সন্ন্যাস-গর্হা, (ঘ) বর্ণ-সাম্য (ঙ) যুযুৎসা (চ) সংঘপ্রেম (ছ) আচার-লঘিমা, (জ) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (ঝ) বিশ্বমৈত্রী ——এই নয়টী নিষ্ঠা জারথুস্ত্রতন্ত্রের কুললক্ষণ (২) অথর্ব্বান জরথুস্ত্রের বিশ্ববিশ্রুত করালঙ্কার আশা-দণ্ডের (৩) নয়টী পর্ব্বস্বরূপ। এই নয়টী তত্ত্বের বীজমন্ত্রগুলি স্মরণ করিলে, গাথার বৈদিক ভাষার পরিচয় ও কতকটা পাওয়া যায়, এইজন্য সেইগুলি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) একেশ্বরবাদ

মজদাও সখারে মইরিস্তো।

গাথা ১৭-৪
যস্ন ২৯-৪

সং—মজদাঃ সকৃত্বঃ স্মরিষ্ঠঃ।

মজদাই একমাত্র আরাধ্য।

(খ) মূর্ত্তিপূজা-প্রতিষেধ (৪)।

কদা অজেন্ মূর্ত্তেম্ অহ্য মগহ্যা ?

গাথা ১২-১০
যস্ন ৪৮-১০

সং—কদা অহন্ মূর্ত্তম্ অস্য মঘস্য ?
কবে এই সংঘ হইতে "মূর্ত্তি" অপসৃত করিতে পারিব ?

(১) (i) Rezvi—Parsis (A people of the Book) P. 45
(ii) Tiele—Religion of the Iranian Peoples (Appendix)
(iii) Gold sack—Mohammadian Traditions, P. 45
(২) The Cherag—June 1932—P. 286
(৩) Jackson—Zoroaster (The Prophet of Ancient Iran) —P. 290

(৪) (i) হোম যস্ত—১৪
(ii) যস্ন—১২—১ (iii) Casertelli—Philosophy of Mazda Yasnian Religion—P. 27

(গ) সন্ন্যাস-গর্হা

অবৎ বহু মনংহা,

যা হুসেইতিস্ রামাং চ দাৎ।

গাথা ১৭-১০

যস্ন ২৯-১০

সং—এতাবতীং বস্থু-মনসাং দেহি।

যা সুক্ষিতিম্ রামাং চ দধাতি।

সেই সুবুদ্ধি দাও, যাহা গৃহে বাস ও তুষ্টি পছন্দ করে।

(ঘ) এক-বর্ণতা (১)

কে অর্য্যাম্না কে খত্রতুস্,

দাতাইস্ অংহৎ

যে বেরেজেনায় বংউহীম্ দাৎ প্রশস্তিম্।

গাথা ১৩-৭

যস্ন ৪৯-৭

সং—কঃ অর্য্যাম্না? কঃ খিতুঃ? ধাতা ইস্ অসৎ, যঃ বৃজনায় বস্বীং প্রশস্তিম্ দদাৎ।

ব্রাহ্মণদ্বারাই কী ফল, আর বৈশ্য দ্বারাই কী ফল? যিনি ক্ষত্রিয়ের পুষ্টি সাধন করেন তিনিই যথার্থ পৌরজন।

(ঙ) যুযুৎসা

যে মইব্যো যত্তশ্ অস্মাই অস্ চিৎ বহিস্তা।

আস্তেং অস্মাই যে নাও আস্তেং দইদীতা॥

গাথা ১০-১৮

যস্ন ৪৬-১৮

সং—যঃ মহ্যম্ জোশং দদাতি, অস্মৈ অতশ্চিৎ বহিষ্টম্, অপি চ যঃ অস্মান্ আস্তম্ দদাতি, অস্মৈ আস্তং দদানি।

যে আমার হিত করে, তাহার তার চেয়েও বেশী হিত, আর যে আমার অনিষ্ট করে, তাহার তার চেয়েও বেশী অনিষ্ট যেন করি।

(১) ফ্রবরদিন যস্ত ৮৮

(চ) সংঘপ্রেম

হেবা জী দ্রেগবাত্ত যো দ্রেগ্বাইতে বহিস্তো।

হেবা জী অষবা যহ্মাই অষবা ফ্রিয়ো॥

গাথা ১০-৬
যস্ন ৪৬-৬

সং— স হি দ্রুগ্বান্ যঃ দ্রুগ্বতে বহিষ্ঠঃ।

স হি অষাবান্ যস্মৈ অষাবান্ প্রিয়ঃ।

যে ব্যক্তি পাপীর সহায়তা করে, সে নিজেও পাপী, আর ধার্ম্মিক ব্যক্তি যাহার প্রিয়, সে নিজেও ধার্ম্মিক।

(ছ) আচার-লঘিমা

অয়াও নো ইৎ এরেষ্ বীষ্যাতা দত্রবাচীনো।

হ্যৎ ইশ্ আ দেবযমা পেরেস্মেনেং উপাজসৎ

গাথা ১-৬
যস্ন ৩-৬

সং—অনয়োঃ দেবাচীনাঃ নো ইৎ ঋষ্ বীক্ষন্তি, যতঃ তে দেবয়ন্তঃ প্রষ্টুম্ উপজসন্তি।

সর্ব্বত্রই দেবত্ব আরোপ পূর্ব্বক উপাসনায় প্রবৃত্ত হন বলিয়া দেবাচীনগণ কখনও যথার্থদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন না।

(জ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

উস্তা অহ্মাই যহ্মাই উস্তা কহ্মাইচিৎ।

গাথা ৭-১
যস্ন ৪৩-১

সং—যস্মৈ কস্মৈ চিদ্ যদ্ ইষ্টম্, তদ্ এব অস্মৈ ইষ্টম্।

কেবল তাহাতেই কাহারও অধিকার, যাহাতে সকলেরই সমান অধিকার আছে।

(ঝ) বিশ্বমৈত্রী (১)

যা ক্ষেবিষা গেউস্ চা উর্ব্বাণেম্।

গাথা ১-১
যস্ন ২৮-১

(১) Dhalla—Zaroastrian Theology. P. 12

সং—যথা গোঃ উর্ব্বাণম্ স্কবাণি।

যেন বিশ্বের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারি।

এই নয়টী তত্ত্বই আবার ইসলামের ভিত্তি। ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে যদি ইসলাম বলা যায়, তবে সমাধি হইতে মধুর কণ্ঠে হাফেজের ব্যঙ্গধ্বনি শুনা যাইবে—

১ ২ ৩ ৪ ৫
গর মুসলমানি আঁজ ইন বুদ,
×
৬ ৭ ৮
কি হাফেজ দারদ
৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
আহ আগর আজ পায়-ত্র ইম রোজ,
×
১৫ ১৬
বুবদ ফরদাই ॥

৭ ৬ ৪ ৩ ২ ৫ ১১ ১৪ ১২
হাফেজ যা আচরণ করে, তাই যদি মুসলমানি হয়, তবে আজের পরে

১৬ ১৯
যেন কাল আর না হয়।

এই নিবিড় সাদৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়াই, ইসলামিক সভ্যতার অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক, হলেণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাধর পণ্ডিত Dozy সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে মৌলিকতার অভাবই পারস্যদেশে ইসলামের নিরর্গল প্রচারের একমাত্র কারণ (১)।

বিশুদ্ধ ইসলামকে পার্শীতন্ত্রের শাখাস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। নব পারস্যের ধর্ম্মগুরু বাহাপন্থার প্রচারক আলি আহম্মদ বাবের নিগূঢ় অভিপ্রায় ইহাই ছিল বলিয়া মনে হয়। কোরাণকে ইসলামের চূড়ান্ত ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া বাহাপন্থীরা মনে করে না (২)।

(১) Claud Field—Persian Literature. P. 33

(২) (i) Sell—The Faith of Islam. P. 133

(ii) Mott—The Moslem World of Today. P. 307

কোরাণ নিরপেক্ষ ইসলাম ও থাকিতে পারে, ইহাই তাহাদের আশয়। পার্শীতন্ত্রই সেই ইসলাম। পার্শীতন্ত্র আবার বেদান্তের শাখা—অথর্ব্ব বেদের অন্যতর অবয়ব ভার্গব বেদের প্রস্থান। অতএব বিশুদ্ধ ইসলাম বেদান্তের অনুগত বটে। ইসলামের ইসলামত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও উহাকে আর্য্যসভ্যতার অঙ্গীভূত করা যাইতে পারে। তজ্জন্য যে একটীমাত্র উপকরণের প্রয়োজন, তাহা অথর্ব্বান জরথুস্ত্রের আশিষ্।

কারণ ইসলামের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা পাঁচটী আচার (দীন), ও ছয়টী প্রত্যয়কে (ইমান) "ইসলামের ভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। যে পাঁচটী আচার 'ইসলামের' পঞ্চস্তম্ভ" (২)। আখ্যা লাভ করিয়াছে তাহারা রোজা, নমাজ, হজ, জাকাৎ ও কলিমা। রোজা=উপবাস, নমাজ=আহ্নিক উপাসনা, হজ=তীর্থযাত্রা, জাকাৎ=দান, ও কলিমা=মন্ত্রজপ। সকল ধর্ম্মতন্ত্রেই এই সব আচারের সমাবেশ আছে। দেশ ভেদে উহার বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করে মাত্র। বিশেষতঃ আচার বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র, বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রাণ। আচার উপায় ও বিশ্বাস উপেয়। যে ছয়টী তত্ত্বে বিশ্বাস-স্থাপন ইসলামের ব্যাপক লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, সেই ছয়টী তত্ত্ব—(ক) ঈশ্বর, (খ) ঈশ্বরের প্রেরিত গ্রন্থ (গ) ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ (ঘ) দেবদূতগণ (ঙ) শেষদিনের বিচার ও (চ) দৈব-বিধান (৩)। ভার্গববেদে ইহাদের নাম যথাক্রমে (ক) মজ্দা, (খ) গাথা, (গ) জরথুস্ত্র, (ঘ) অমেষা স্পেন্ত, (ঙ) চিন্বৎ-পরেতু ও (চ) হুনর। যাহারা এই ছয়টী তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, কোরাণের আদেশ (৪) মান্য

(১) Blair—Sources Islam. P. 113

(২) Kamaluddin—Islam and Zaroastrianism. P. 117

(৩) (i) Blair—Sources of Islam. P. 20

(ii) Koran—4·135

(iii) Kamaluddin—The Ideal Prophet. P. 215

(৪) কোরাণ ২-৫

করিলে, তাহাদিগকে কাফের (অবিশ্বাসী) বলা চলে কি ? যদি কেহ মনে করেন যে আরবীয় ভাষায় কথা না বলিলে পরমেশ্বর বুঝিতে পারিবেন না, তাহাকে ঈশ্বরের উপাসক না বলিয়া আরবিকত্বের উপাসক বলাই সঙ্গত (১)। অবশ্য জাতীয় ঐক্যের জন্য ভাষার ঐক্যের প্রয়োজন। পরন্তু সেই একক ভাষাটি, সকল ভাষার মধ্যে দুর্ব্বোধ্য-তম (২) আরবিক না হইয়া, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জলতম (৩) পারসিক হইলে, লোকের সুবিধা ছাড়া অসুবিধার কোনও কথা নাই। পারসিকের মূল জেন্দ ভাষা, পাণিনিদ্বারা অনুশাসিত। 'ছন্দসি' বলিয়া পাণিনিতে যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ আছে, তাহারা বহুল জেন্দভাষারই বিশেষত্ব (৪)। বৈদিক ভাষার সহিত, বাংলা অথবা হিন্দীর যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, পারসিকের সম্বন্ধ ও সেইরূপ নিকট (৫)।

পারসিক ভাষার মহাকাব্য শাহ-নামাতে, সংস্কৃত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা যায় না, এমন শব্দের সংখ্যা শতকরা পাঁচটীর বেশী নহে (৬)। কেবল আরবিক লিপিতে লিখিত হয় বলিয়াই, পারসিক আমাদের পর হইয়া রহিয়াছে। পারসিক আমাদের ভ্রাতা না হইতে পারে, ভ্রাতৃব্য তো (Cousin) বটেই,—এক বৈদিক উৎসেরই বিভিন্ন ধারা। সার্ব্বভৌমিকত্ব আবার কেবল বেদেই আছে।

(১) Cash—The Expansion of Islam. P. 190
(২) Gibbs—Arabic Literature. P. 13
(৩) (i) Browne—Literary History of Persia Vol 1 P. 377
(ii) Pollock—A Little Persian is not a Dangerous thing P. 16
(৪) Maxmuller—Chips from a German Workshop Vol 1 P. 84
(৫) (i) Macdonell—Vedic Mythology P. 7
(ii) Darmetester—Zend Avesta Part I—Introduction P. XXI
(৬) **Browne—Literary History of Persia Vol II—146**

নাবিধ বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য একমাত্র বেদান্ত দ্বারাই সম্ভবপর—
তার তাহার পরিচয়।

১ ২
বা জায়-এ কি চূঁ কিষণ যোগেশ্বর আস্ত্

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
কি আজ নূর-এ উ হর দো আলম পূর আস্ত্॥
× ×
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২
বা জায়-এ কি অর্জ্জুন কমান-দার হস্ত্।
× ×
২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭
বা ইকবাল-এ খুবি সরোকার হস্ত্॥
× ×
২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭
হাম আন জা আস্ত্ দৌলত হাম আন জা আস্ত্ দাদ।
× ×
৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬
হাম আন জা আস্ত্ ফতেহ ও জফর ইয়াদ বাদ॥
× ×

ফৈজী—ফারসী গীতা—১৮ অধ্যায়

২ ৩ ৫ ৪ ৬ ৭ ১১
সেই জায়গায় কি যথায় কৃষ্ণের মত যোগেশ্বর আছেন,——যাহার
১০ ১৩ ১৪ ১৫ ১০ ১৯ ২০ ২১
জ্যোতিতে উভয় জগৎ পরিপূর্ণ, সেই জায়গায় কি যথায় অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর
২৫ ২৪ ২৬ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১
যাহা শুচিতার প্রভায় পরিপ্লুত,——কেবল সেই জায়গায় আছে
৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১
সম্পদ, কেবল সেই জায়গায় আছে ন্যায়, কেবল সেই জায়গায় আছে
৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬
জয় ও অভ্যুদয়, একথা যেন স্মরণ থাকে।

এইজন্য ব্যাপক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে, বেদবাহ্য আরবিক অপেক্ষা বেদমূলক পারসিক ভাষার উপযোগিতাই বলীয়ান্। আরবিকত্বের মোহ ছাড়িয়া দিলে ইসলামকে জারথুস্ত্রতন্ত্রের নামান্তর বলিয়াই মনে হইবে। যিনি গাথায় ইসলাম দেখিতে পান না, তিনি ইসলাম কী তাহা জানেন না। যদি কেহ বলেন "সেতারের সুরে গান করিতে পারিব না, দামামা আমার চাইই" তবে তাহার সঙ্গীতে দক্ষতা অপেক্ষা দামামায় উৎকট অনুরাগই বেশী প্রকাশ পায়। সম্রাট আকবর আরবিকত্বের মোহ কাটাইয়াছিলেন। তাহাকে অগ্নিহোত্রী জারথুস্ত্র মনে করিবার পক্ষে কোনও বাধা ছিল না (১)।

বিশেষতঃ জারথুস্ত্রতন্ত্রের আরবাসংস্করণরূপে নিজকে বেদান্তের অনুগত মনে করিতে পারিলেই ইসলাম সার্থকতা লাভ করিবে। নতুবা ইসলাম প্রচার নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

কারণ, একেশ্বরবাদ, নিরাকারোপাসনা, জাতিভেদরাহিত্য, কোনটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য নহে। ইহুদি বা খ্রীষ্টপন্থায়ও তাহারা তুল্যরূপেই বিদ্যমান। বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রেরণাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য——তাহা দেশ ও বর্ণের ব্যবধান অতিক্রম করিয়াছে। মনুষ্যবিশেষের যাহা সাধনার ধন, জাতি-দেশ বর্ণনির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রই তাহার ফলভাগী, এই মহান সত্য ইসলামের পৃষ্ঠপোষক বলিয়াই ইসলামের জীবনীশক্তি এত প্রবল। প্রতি জনপদেই নরে নরে অবস্থিত নারায়ণ, এই আদর্শের আহ্বানে সাড়া দিয়া থাকে——তাই ইসলাম দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদার আদর্শ, ইসলাম পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব কেবল মুসলমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—— তাহা মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব মাত্র। অমুসলমানের জন্য তাহাতে কোনও

(১) Ghani—Persian Language and Literature of the Mogul Court Voll. III—P. 247

স্থান নাই (১)। ঘৃণা ও অপমানই অমুসলমানের প্রাপ্য বলিয়া অনেক মুসলমানের ধারণা। অসহিষ্ণুতাই ইসলামের মারাত্মক দোষ (২)। অসহিষ্ণুতার প্রতীকার একমাত্র বেদান্তদ্বারাই সম্ভবপর—কারণ বেদান্তই সকল বিরোধের সামঞ্জস্য করিতে পারে। সাকারনিষ্ঠ রামচন্দ্রও যেমন বেদান্তের অবতার, নিরাকারনিষ্ঠ জরথুস্ত্রও তেমনই বেদান্তেরই অবতার (৩)। বেদান্তের দৃষ্টিতে উভয়েই সমান প্রিয়। বেদান্ত উভয়েরই কল্যাণকামনা করেন, একজনের হানিদ্বারা অপরের লাভ আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভ্রাতৃবিরোধস্থলে বিহ্বল মাতার ন্যায়, একের জয় ও অপরের অপরাজয়, ইহাই তাহার কামনার বিষয়।

সো অহং কিতবমাতেব দ্বয়োর্ অপি মহামতে।
একস্য জয়ম্ আশংসে দ্বিতীয়স্যাপরাজয়ম্ ॥

শান্তিপর্ব্ব ৮১-১১

মানব জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব মনুষ্যজীবনের অনুত্তর আদর্শ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নির্ব্বিশেষে সারূপ্য (Identity) তাহার পথ নহে; সবিশেষ সামঞ্জস্যই (Harmony) তাহার পথ। নতুবা ঐক্যের কোনও মূল্য থাকে না। বর্ণের বৈচিত্র্যই রামধনুর সৌন্দর্য্যের কারণ। একটী মাত্র বর্ণদ্বারা রামধনু গঠিত হইতে পারে না—সে বর্ণ যতই সুন্দর হউক। ইসলাম সারূপ্য স্থাপন করিতে পারে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে জানে না। কারণ বিরুদ্ধ মতবাদের জন্য কোনও স্থান ইসলামে নাই। পরন্তু জরথুস্ত্রতন্ত্র দ্বারা সামঞ্জস্য সম্ভবপর। কারণ হিন্দু ও পার্শী, উভয়তন্ত্রই বেদান্তেরই অন্যতর অঙ্গ।

---

(১) (i) Macdonald—Aspect of Islam P. 273
(ii) Margolionth—Early Development of Muhammadianism P. 232
(iii) Zwemer—The Muslim Doctine of God P. 110
(২) Sell—Historical Development of the Quran P. 172
(৩) দেব=দ্যুতিশীল=প্রদ্যুম্ন। অসুর=ব্যাপ্তিশীল=অনিরুদ্ধ।
(বেদান্তের চতুর্ব্যূহ)

বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে ঐক্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ঐক্যের উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তিবিশেষের সাধনাকে সাধারণের সম্পত্তি করিয়া দেওয়া। বৈশিষ্ট্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির বা জাতির বিশিষ্ট সাধনাও কিছু থাকিবেনা—সাধারণ-ভোগ্য করিবার মত কোনও সম্পদ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সেরূপ ঐক্য নিরর্থক—মনুষ্যজাতি তদ্দ্বারা লাভবান হইতে পারিবে না। তাহা উচ্চকে নিম্নে টানিয়া নামায়, নীচকে উপরে তুলিয়া লয় না।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব যদি ইসলামের আদর্শ হইয়া থাকে তবে ইসলামকে বেদান্তের অনুগত হইতেই হইবে, অর্থাৎ নিজকে পার্শীতন্ত্রের আরবা সংস্করণ মনে করিয়া, জরথুস্ত্রকে পয়গম্বর ও গাথাকে স্বাধ্যায় বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। নতুবা জগতের অন্যান্য ধর্ম্মতন্ত্রের সহিত উহার কোনও সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

আর বিশ্বভ্রাতৃত্ব যদি ইসলামের লক্ষ্য না হইয়া থাকে, তবে ইসলামের জন্ম ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহুদিতন্ত্রের সহিত ইসলামের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কেবল ইহুদিসংঘের দ্বার ভিন্নজাতির পক্ষে রুদ্ধ, আর ইসলামিক সংঘের দ্বার সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত। ইসলামিক রাষ্ট্রের কোনও সীমানা নাই (১)। দেশের ঐক্যই অন্য সর্ব্বত্র জাতিগঠনের ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, ধর্ম্মতন্ত্রের ঐক্যই ইসলামের জাতিগঠনের বনিয়াদ্ (২)। বৌদ্ধতন্ত্র আর ইসাহিতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ গোষ্ঠিসমূহকে একটী জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা ইসলামই করিয়াছে। জাতিগঠন বিষয়ে উহারা সচেতন ছিল না, তাই বৌদ্ধতন্ত্র বা ইসাহিতন্ত্র একটি

(১) Cash—The Expansion of Islam P. 42.

(২) Andre Servier—Islam and the Psychology of the Musalman. P. I.

সাধারণ ভাষার উপযোগ উপলব্ধি করিতে পারে নাই (১)। এইজন্য বাইবেল বা ত্রিপিটক মূলভাষায় পড়িতে হইবে এই রূপ নির্ব্বন্ধ ইহারা করেন নাই। প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজ নিজ ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়া লইয়াছে। পক্ষান্তরে আরবী মূল সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া, কোনও ভাষায় কোরাণের অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করা মুসলমান শাস্ত্রে বিগর্হিত (২)। আরও বড় কথা এই যে ইসাহি বা বৌদ্ধতন্ত্র রাজনীতির সহিত কোনও সংশ্রব রাখা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই (৩)। কিন্তু রাজনীতির সহিত কোনও সম্পর্ক না রাখিলে জাতিগঠন হয় না। তাই মুসলমান জাতিগঠন করিয়াছে। বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান তাহা পারে নাই।—সমস্ত বৌদ্ধ বা সমস্ত খ্রীষ্টান নিজদিগকে একজাতি-ভুক্ত বলিয়া মনে করে না। নিখিল মুসলমান আপনাদিগকে এক জাতিভুক্ত বলিয়া মনে করে। খিলাফত সেই জাতীয়তার প্রতীক। পাতশাহার আদেশ অপেক্ষা খলিফার আদেশ বলবত্তর। একটী সংঘের অধীন যাহারা তাহারাই এক জাতিভুক্ত। খলিফা সেই সংঘের নায়ক। ধর্ম্মতন্ত্রের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক মনে করেন না বলিয়াই হয়ত মহাত্মা গান্ধীকে শ্রেষ্ঠ মুসলমান বলিয়া অনেকে দাবী করেন (৪)।

লোকে কথায় বলে যে রক্তের টানই সবচেয়ে বড় টান। কিন্তু ইসলাম দেখাইয়াছে যে ধর্ম্মতন্ত্রের টানই বড় টান। একবার মুসলমান হইয়া গেলেই পারসিক আর পার্শীর জন্য বেদনা

(১) Andre Servier—Islam and the Psychology of the Musalman. P. 19

(২) Browne—Literary History of Persia Vol. II P. 4.

(৩) Macdonald—Aspects of Islam. P.251. 259.

(৪) Amrita Bazar Patrika. May 17. 1932—Opinion of Begam Fatima Sharifa Izzat Pasha.)

অনুভব করে না, ভারতীয় আর হিন্দুর জন্য অনুকম্পা করে না। একই পূর্ব্বপুরুষের রক্ত যাহাদের শরীরে প্রবাহিত তাহাদের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ দাঁড়ায়। আর যাহার ভাষা পর্য্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, সেই হয় পরম আত্মীয়। মোগল, পাঠান, তুরকী, পারসী, আরবী—ইহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি; কিন্তু ইসলামের দৌলতে ইহাদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য অপেক্ষা ঐক্যই বেশী পরিস্ফুট (১)। পারসী পাঠান ও হিন্দুর শিরায় শিরায় যে একই রক্ত প্রবাহিত, তাহারা যে মূল একই ভাষার বিভিন্ন বুলিতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার তাৎপর্য্য অনেকেই পরিগ্রহ করিতে পারেন না। অন্যত্র সর্ব্বত্রই ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতির কোনও সংস্রব রাখার প্রয়োজন আদৃত হয় নাই। কেবল মজদায়স্ন (২) ও ইসলামই, জীবনকে বিভিন্ন সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে ভাগ করিয়া লইয়া ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিতে, রাজী হয় নাই। তাই ইসলাম ধর্ম্মতন্ত্রের বনিয়াদে জাতিগঠনের প্রয়াস করিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয়তা যদি আন্তর্জাতিকতার (Internationalism) সহায়ক না হয়, ইসলাম যদি বিশ্বভ্রাতৃত্বের পথে সোপান না হইয়া প্রাচীর হইয়া উঠে, তবে বিশ্ব-মানবের নিকট ইসলামের কোনও আদর থাকিতে পারেনা। তাহা হইলে মুসলমান সম্প্রদায়, ইহুদিসম্প্রদায়ের বৃহৎ সংস্করণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে, আর আরবদিগকে ইহুদিতন্ত্র গ্রহণ করাইয়া ছিলেন এইমাত্র হইবে হজরত মহম্মদের গৌরব। বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ পরিবর্জ্জন করিলে, ইসলামের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয় (৩)।

---

(১) Andre Servier—Islam and the Psychology of th Musalman. P. 3.

(২) (i) Jackson—Zaroastrian Sudies P. 213.

(ii) Casartelli—Philosophy of the Mazda-yasnia Religion. P. 155.

(৩) Mott—Muslim World Today. P. 284.

পার্শীতন্ত্রের অভিনব সংস্করণরূপে গণ্য করিলেই ইসলামকে যথাযথ দেখা হয়, এই ইঙ্গিত করিয়াছেন মুস্লিমজগতের শিরোমণি সদৃশ দুইজন অতিরথ ধর্ম্মগুরু। একজন ইমাম গজ্জালি, আর একজন ইমাম আবদুল বাহা। ইহারা দুজনেই আবার পারস্যের সন্তান, পবিত্র আর্য্যবংশেই ইহাদের জন্ম (১)। একজন সূফীপন্থার ও অন্য জন বাহীপন্থার প্রতিষ্ঠাতা। একজন দেখাইয়াছেন যে অধ্যাত্মবাদকে ছাড়িয়া দিলে ইসলাম কতকগুলি নিরর্থক আচারের সমষ্টি মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। আর একজন দেখাইয়াছেন যে বিশ্বভ্রাতৃত্বকে ছাড়িয়া দিলে, ইসলাম সংকীর্ণ ওয়াহেবি (২) সম্প্রদায়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

অপর পক্ষে অধ্যাত্মবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ গ্রহণ করিলে, কেবল ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া, পার্শীতন্ত্রের সহিত ইসলামের আর কোনও পার্থক্য থাকে না। আর পার্শীতন্ত্রের শাখা বলিয়া ইসলামকেও বেদান্তের অনুগত মনে করা যাইতে পারে।

সেরূপ হইলে হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষের কারণ ও অপসৃত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান মৌলবী আবদুস্ সামাদ, হিন্দু মুসলমান কলহের মূল কারণ অতি যথার্থরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"Hindu hates the Musalman, not the religion but the man Musalman hates the Hindu, not the man but the religion" (৩) অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান ব্যক্তিটীকে ঘৃণা করে, মুসলমান ধর্ম্মটীকে নহে, আর মুসলমান হিন্দুধর্ম্মটীকে ঘৃণা করে হিন্দু ব্যক্তিটীকে নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে হিন্দুতন্ত্রে বিভিন্ন মতবাদের জন্য স্থান আছে,

(১) (i) Zwemer—Al Ghazzali (A Muslim Seeker after God) P 53.

(ii) Holley—Bahai (The Spirit of the Age) P. 19

(২) Margolionth—Mahammadanism. P. 177.

(৩) Bengal Provincial Conference Special Session. 5-12-1931.

অতএব ধর্ম্মমতের পার্থক্য হিন্দু সহ্য করিতে জানে। অপিচ হিন্দুতন্ত্রে কর্ম্মযোগের (Ethics—নীতিশাস্ত্র) সদ্ভাব হেতু, ধর্ম্মজ্ঞান (Rectitude) প্রবল থাকায়, হিন্দু চরিত্রবলে খুব উন্নত। ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়া হিন্দুকে নিন্দা করিবার মত বিশেষ কিছুই নাই। সম্প্রদায় দুইটীর পরস্পর বিদ্বেষের স্থূল কারণ এই যে মুসলমান মনে করে যে হিন্দুর প্রাধান্যের অর্থ যদি বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজার প্রাধান্য হয়, তবে হিন্দুর প্রাধান্য লোপ করাই মার্জ্জিত রুচি লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য। আর হিন্দু মনে করে যে আমি যদি প্রতিমা-পূজা করিয়া জাহান্নামেই যাই, তাহাতে মুসলমানের ক্ষতি কি? সে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আসে কেন? কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য কলহের প্রকৃত কারণ নহে, কৃষ্টির (Civilisation) পার্থক্যই সম্প্রদায় দ্বয়ের বিদ্বেষের নিগূঢ় কারণ। হিন্দু মনে করে যে হিন্দুস্থানের সভ্যতায় এমন কিসের অভাব আছে, যদ্ধেতুক হিন্দুস্থানের অধিবাসী এক চতুর্থাংশ লোক নিজেদের কুলক্রমাগত কৃষ্টি বিসর্জ্জন দিয়া একটী বৈদেশিক কৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিল। আর মুসলমান মনে করে যে তাহাকে উর্দু ছাড়াইয়া হিন্দী পড়াইতে, পায়জামা ছাড়াইয়া ধুতি পরাইতে, হিন্দুর কী অধিকার আছে। যদি ধর্ম্মমতের পার্থক্যই কলহের কারণ হইত, তবে হিন্দুর সহিত ব্রাহ্ম, শিখ বা আর্য্যসমাজীর তুমুল কলহ লাগিয়াই থাকিত। আর ধর্ম্মমতের সাদৃশ্যই যদি প্রীতিবন্ধনের হেতু হইত তবে ব্রাহ্ম, শিখ বা আর্য্যসমাজীর সহিত মুসলমানের অনবচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দই বর্ত্তমান থাকিত। বস্তুগত্যা ইহার বিপর্য্যাসই দৃষ্টিগোচর হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্ম শিখ বা আর্য্যসমাজীর সহিত হিন্দুরই অপেক্ষাকৃত বেশী সৌহার্দ্দ, আর মুসলমানেরই অপেক্ষাকৃত বেশী বিদ্বেষ দেখা যায়। অতএব অশনে-বসনে-ভাষণে-ভূষণে কৃষ্টিগত সাদৃশ্যই সৌহৃদ্যের মূল। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের কৃষ্টিকে পরকীয় মনে করে বলিয়াই বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। (১)

(১) 'স্বদেশে বিদেশে ক্রীশ্চান বন্ধু আমার অনেক আছেন। কাহারও পিতা, কাহারও বা পিতামহ কেহ বা স্বয়ং, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন;

এই বৈসাদৃশ্য দূর করিবার অভিপ্রায়ে, জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হইতে হইতেই হিন্দু নেতাগণ মুসলমানদিগকে ভারতীয় কৃষ্টি গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। "আমরা প্রথম ভারতবর্ষীয় তৎপরে হিন্দু ও মুসলমান," ইহা কংগ্রেসের একটী মুখ্য অভিমত। বর্ত্তমান সময়ে তুরস্ক, পারস্য ও গান্ধারে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাগণও ভারতীয় কৃষ্টির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। বঙ্গীয় মুসলমান তরুণ সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে, উহার সভাপতি মৌলবী সেরাজউলহক যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। উহা হইতে কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

"আজ তুরস্ক, ইরাণ, পারস্য প্রভৃতি জনপদ নিজ নিজ দেশের প্রাচীন স্মৃতি স্মরণ পূর্ব্বক, পূর্ব্বগৌরবের সংবোধ ও সংবেদ লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। আরব আরব্যের ভাবে, পারস্য পারস্যের ভাবে, তুরস্ক তুরস্কের ভাবেই জাগিতেছে। পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্থান, আরব গৌরবের কাণা কড়িও গ্রহণ না করিয়া, স্বকীয় অমুসলমান পূর্ব্বপুরুষদের অতীত যুগের কীর্ত্তি কাহিণীর গৌরব কাহিনীর স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়া নূতন রাষ্ট্রজীবন গঠন করিতেছেন।

পারস্য আরবীয় যুগের বিজাতীয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের যমশেদ, জোহাক, ফরিদুন, কায়কোবাদ, খশরু, জাল ও রোস্তমের নামেই মাতিয়া উঠিতেছে। তুরস্ক ও তাহার বৌদ্ধ

কিন্তু নিজ হইতে তাহারা নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার যো নাই যে সর্ব্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাই বোন নেই। আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে প্রেমে মজিয়া ধর্ম্মত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি সে পর্য্যন্ত এমনই বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার যো নাই" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা।—হিন্দু মিশন—শ্রাবণ ১৩৩৯—পৃ ১১১।

লেখক বিস্মৃত হইয়াছেন যে মুসলমান পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি। ইরাণীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, বৈচিত্র্যদ্বারা ভারতীয় জীবনে সৌন্দর্য্যসম্ভার বৃদ্ধির হেতুরূপেই মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্থকতা। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে মুসলমানের উপস্থিতি নিষ্ফল।

পূর্ব্বপুরুষ চেঙ্গিস, হালাকু, কুবলাই ও মঙ্গু খাঁ প্রভৃতি বীরেন্দ্রবর্গের ছবি বা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণই ভারতের প্রাচীন গৌরবময় মহিমাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। (মহাবীর ভীষ্ম, সত্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র, সব্যসাচী অর্জ্জুন, শূরকুলসূর্য্য কর্ণ প্রভৃতি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিবংশীয়গণের অসাধারণ বীর্য্যগরিমার জন্য সে কোন গৌরবই বোধ করে না; কিন্তু করাটাকেও কলঙ্কজনক মনে করে। অন্য দিকে সে আরব পারস্যের বীর পুরুষদিগের গৌরবের বড়াই করিলেও তাহাতে মনে কোনও জোর পায় না। কারণ সে জানে যে তাহাদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই।)

বাংলার এই লক্ষ লক্ষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের ভিতর, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাঠ রাজপুতের জ্যোতি ও তেজঃপূর্ণ রক্তপ্রবাহ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহারা কেহই সেই গৌরবের স্মৃতি সম্মুখে ধরিতে না পারায়, নীচতা ও অন্ধকারে ঘুরপাক খাইতেছে। কেহ কেহ কৃত্রিমভাবে আপনাদিগকে মোগল পাঠান শেখ সৈয়দ বলিয়া দাবী করিলেও, মন তাহাতে মোটেই জোর পাইতেছে না। তার মানে মনের কাছে কোন চালাকিই খাটিতে পারেনা। (১)

---

(১) খ্বাজা দানিস্ত কি মন
আশেক ম ও হিচ না গুফ্‌ত।
হাফেজ আর নিজ বিদানদ,
কি চুনিন-অম্ চে শবদ॥

আমি যে প্রেমিক, প্রভু তাহা জানেন তবু কিছু বলেন নাই। হাফিজ নিজেও যদি জানে যে আমি এই, তাহাতে আর কী হইবে? যাহা মনে মনে সত্য বলিয়া জানি মুখে অস্বীকার করিলেই তাহা মিথ্যা হয় না।

যখন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভীম, পার্থ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ, কিম্বা কপিল কনাদ পতঞ্জলি প্রভৃতি জগদ্‌গুরু দার্শনিকগণ, অথবা ব্যাস, বাল্মিকী, ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ভিষক্‌গণ, কিম্বা গার্গী, আত্রেয়ী প্রভৃতি নারীবৃন্দের গৌরবের কথায় হিন্দু ছাত্র বা যুবকের বুক ফুলিয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে হিন্দুকুলসম্ভূত মুসলমান ছাত্র ও যুবকের মন দমিয়া যায়। তাহারা চারিদিকে হাতড়াইয়া গৌরবের কিছু দেখিতে পায় না। কি ভীষণ ব্যবস্থা? মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাঠ রাজপূত ও শিখ ছিল। সুতরাং তাহাদের সম্মুখে প্রাচীন হিন্দুর বেদবেদান্ত উপনিষদ্, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান রচনার যে গৌরব——যাহার কাছে, ফিনিসিয়া, মিডিয়া, জুডিয়া ব্যাকট্রিয়া, কালডিয়া, ট্রয়, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি সকলেরই মাথা নত—সেই গৌরবের মহাজ্যোতিঃ হইতে ভারতীয় মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিলে, মুসলমান কখনও ভারতবক্ষে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এ জন্য শুধু হিন্দুকে আপনার মনে করিলে চলিবে না। ভারতের সমস্ত গৌরবকেই হিন্দুর ন্যায় কুক্ষিগত করিয়া লইতে হইবে” (১)।

কিন্তু মুসলমানের জাতীয়তা ধর্ম্মতন্ত্রের উপর সংস্থাপিত, ধর্ম্মতন্ত্রের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর সেই ধর্ম্মতন্ত্র হিন্দুতন্ত্র হইতে এত পৃথক্, যে প্রতিমা-পূজা ও জাতিভেদমূলক হিন্দুতন্ত্রের মর্ম, অনেক মুসলমানের পক্ষেই কঠিন পরীক্ষা। ইসলামের আদর্শ বজায় রাখিয়া হিন্দু-কৃষ্টির সহিত মিলন সম্ভবপর কিনা তাহাতে অনেকেই সন্দিহান। কিন্তু পার্শীতন্ত্র সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। পার্শীতন্ত্র মুসলমানকে একান্তই আপনার করিয়া লইতে পারে। বৈশিষ্ট্যও

(১) হিন্দুমিশন জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯-৮২ পৃষ্ঠা

অক্ষুণ্ণ থাকে, মিলনও হয়,—আর সাধনার বৈচিত্র্য দ্বারা জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হয়। আরবে কোনও সভ্যতা ছিল না। আরবিক কৃষ্টি একটা কথার কথা মাত্র (১)। বাধ্য হইয়া ইসলামকে পারসিক কৃষ্টির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। ইসলাম পারসিক কৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই, যদি আমরা পারসিক কৃষ্টিকে পর মনে করি, তবে ইসলাম হিন্দু-কৃষ্টি গ্রহণ করিলে, হিন্দু-কৃষ্টিকেও পর মনে করিতে পারি। বরং পারসিক কৃষ্টির যতটা অংশ ইসলাম সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, সেই পরিমাণে ইসলাম আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। অবশ্য মুসলমান যদি সাদি হাফেজ ও রুমিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল হারিরির মকামতের চর্চ্চাই করিত, তবে আমাদের ধন্যবাদের কারণ থাকিত না। কিন্তু মকামতকে পরিত্যাগ করিলে ইসলামের কিছু আসে যায় না—রুমির মশনবীকে পরিত্যাগ করিলে ইসলাম ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে। মশনবীর বীজমন্ত্র আবার গাথাতেই পাওয়া যায়।

অতএব জরথুস্ত্রের গাথাই হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে এই পরস্পরীণ বিদ্বেষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে। গাথার সহিত পরিচয় হইলে হিন্দু বুঝিতে পারিবে যে মুসলমান যে সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বিজাতীয় নহে——অহিন্দু হইতে পারে, অবৈদিক নহে। উহা অথর্ব্ববেদের অন্যতর অঙ্গ ভার্গব উপস্থার পরিন্যাস। আর মুসলমান বুঝিতে পারিবে যে বৈদিক সাধনার অর্থই বহু দেববাদ ও মূর্ত্তিপূজার পরিগ্রহণ নহে। অথর্ব্ববেদের ঋষি-রাজ অথর্ব্বান জরথুস্ত্র বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজার যাদৃশ নিন্দা করিয়াছেন, কোরাণের নিন্দা তাহা অপেক্ষা তীব্রতর নহে। অতএব কোরাণীয় ধর্ম্মগ্রহণের জন্য বেদের বাহিরে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। কোরাণকে

(১) There is a Greek civilization, and a Latin civilization there is no Arab civilization—Andre-Servier—Islam and the Psychology of the Musalman P. 9

গাথার বিবৃতি বলিয়া মনে করিলে সকল দিক রক্ষা পায়। এরূপ ধারণা কোরাণীয় শিক্ষার অননুমোদিত নহে। কারণ জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগুরু একমাত্র সেমিতিক জাতির মধ্যে নিবদ্ধ, ইহা সম্ভবপর নহে। কোরাণও তাহা বলে না। সেমিতিক জাতীয় ধর্ম্ম-গুরুদিগকে কোরাণ নামে নামে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নাম ধরিয়া উল্লেখ করা হয় নাই এমন আরও অনেক ধর্ম্মগুরু আছেন, কোরাণ তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন (১)। প্রত্যেক জাতিতেই ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাব কোরাণের স্বীকৃত (২)। তাহারা নিজ নিজ ভাষায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন (৩)। এই সব ধর্ম্মরাজ কাহারা? রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র, গৌতম ও বর্দ্ধমান যদি ধর্ম্মরাজ না হইয়া থাকেন, তবে ধর্ম্মরাজ কথার কোন সার্থকতা থাকে না। ধর্ম্মগুরুদিগের মধ্যে সম্মানের তারতম্য করিতে কোরাণ স্পষ্টভাষায় নিষেধ করিয়াছেন (৪)। অবশ্য সকল পয়গম্বরের সিদ্ধান্তই সকলের নিকট সমান আদরণীয় নহে। উপাসকদের মধ্যে কেহ মূর্ত্তিতে আসক্ত, কেহ অমূর্ত্তে ভক্তিপরায়ণ। কাহারও গার্হস্থ্যে স্পৃহা, কাহারও সন্ন্যাসে অনুরাগ। বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সমকক্ষ হইলেও, কেহ বা রামচন্দ্রের আদর্শে, কেহ বা জমদগ্নির আদর্শে সমধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন

রাঘবে ভার্গবে বাপি অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামচন্দ্রঃ ধনুর্দ্ধরঃ॥

কিন্তু সাম্প্রদায়িক রুচিদ্বারা বিচার করিলেও, অথর্ব্বান্ জরথুস্ত্র ও তাঁহার গাথাকে জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি মুসলমানের নাই (৫)। কোরাণে এমন কোনও তত্ত্ব

(১) কোরাণ—৪০-৭৮, ৪-২৪৬
(২) কোরাণ—১০-৪৮, ১৩-৮, ১৬-৩৮, ৩৫-২২।
(৩) কোরাণ—১৪-৪।
(৪) কোরাণ—২-২৮৫।
(৫) Kamaluddin—Islam and Zaroastrianism P. 38

নাই যাহা গাথায় দুর্লভ। অন্যদেশীয় মুসলমানদের কথা যাহাই হউক, ভারতীয় ও ইরানীয় মুসলমানদের পক্ষে গাথার প্রত্যাখ্যান অবৈধ। কারণ নিজ নিজ জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের প্রত্যাখ্যান করা কোরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে (১)। তাহাতে আস্থা স্থাপন করাই প্রকৃত বিশ্বাসীর কর্ত্তব্য (২)। আরবীয়গণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, এই জন্যই কোরাণ আরবীয় ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল (৩)।

অতএব দেখা যায় যে কোরাণের অপব্যাখ্যায় নির্ভরই, কতিপয় মুসলমানের পরমতামর্ষের কারণ। পূর্ব্বপ্রচারিত তত্ত্বসমূহ পুনঃ প্রচার করাই কোরাণের উদ্দেশ্য, একথা কোরাণ বার বার বলিয়াছেন (৪)। গাথার তত্ত্বই কোরাণ আবার প্রচার করিয়াছেন একথা বলিলে কোরাণের অনভিপ্রেত কথা বলা হইল বলিয়া যিনি মনে করেন, তিনি কোরাণে অনভিজ্ঞ। কারণ কোরাণ ফুরকানের (স্পেন্ত-অংগ্র-পৃথক্কারী গাথার) প্রতিষ্ঠাপক (৫)। "কোরাণের প্রচার হইলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহার প্রমাণ্য স্বীকার করিয়া বলিবেন "এই সমস্ত তত্ত্বে আমরা পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বাস পরায়ণ ছিলাম (৬)।"

("পূর্ব্ব হইতেই" বলার তাৎপর্য্য লক্ষনীয়।)

অতএব কোরাণকে গাথার প্রতিবিম্ব বলিয়া মনে করিলেই সকলদিক রক্ষা পায। আর সেরূপ হইলে, হিন্দুকে অথর্ব্ববেদের আঙ্গিরস শাখার, আর মুসলমানকে অথর্ব্ববেদের ভার্গব শাখার বর্ত্তমান প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এক অথর্ব্ববেদেরই দুইটী অঙ্গ মনে করিলে পরস্পর বিদ্বেষের আর কোনও কারণ থাকে না।

(১) কোরাণ—৪৫-২৭।
(২) কোরাণ—৪২-১৪।
(৩) কোরাণ—১২-২, ৪১-৪৪, ১৩—৩৮, ১৯-৯৪, ৪৩-২, ৪৪-৫৮।
(৪) কোরাণ—১০-৩৮, ২—৯১, ৫-৫২ ৬-৯২, ১২-১১১, ২০-১৩৩, ৩৫-২৮, ৩৭-৩৬।
(৫) কোরাণ—৩-২।
(৬) কোরাণ—২৮-৫৩।

অথর্ব্ববেদের দুইটী শাখা—আঙ্গিরস ও ভার্গব। আর্য্যকৃষ্টির দুইটী অঙ্গ, হিন্দু ও পার্শী। বিকাশের পার্থক্য থাকিলেও, ইহাদের উদ্দেশ্যের কোনও পার্থক্য নাই। মহাকবি ইকবালের ভাষায় বলা যাইতে পারে—

চূঁ নিগাহ্, নূর-এ দো চশম্-অম্ ও এক্-অম্।

ইকবাল—ইসরার-এ খুদি।

চক্ষু যদিও দুইটী, দৃষ্টিশক্তি একই। দক্ষিণ ও বাম বাহুর ন্যায় একই শরীরের দ্বাপর অঙ্গ বলিয়া, হিন্দু ও পার্শী পরস্পরের ঘনিষ্ঠ মিত্র। রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্রও উভয়েই তাহাদের তীর্থঙ্কর ধর্ম্মরাজ। জরথুস্ত্র ইরাণে প্রিয়তর হইতে পারেন, কিন্তু রামচন্দ্রও অপ্রিয় নহেন। রামচন্দ্র ভারতে প্রিয়তর হইতে পারেন, কিন্তু জরথুস্ত্র ও অপ্রিয় নহেন। পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু বিদ্বেষের কোনও হেতু নাই। বরং অন্যোন্যের ত্রুটি সংশোধনের জন্য অন্যোন্যের উপযোগ আছে (১)। কিঞ্চ ইরাণীয় সাধনার প্রতিনিধি ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়া, মুসলমানও এই গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত (২)। অতএব দুইশত চল্লিশ শ্লোকে নিবদ্ধ জরথুস্ত্রের গাথাই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একতম সমাধান। গাথার সহায়তায় হিন্দুর মুসলমান প্রীতি, আর মুসলমানের হিন্দুপ্রীতি, বিবর্দ্ধিত হইতে পারে। ইসলামের সহিত হিন্দুর কোনও বিরোধ

(১) ভারতের প্রায় সমুদয় মুসলমানই এককালে হিন্দু ছিল। কেন তাহারা মুসলমান হইল? কেন ইহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে এবং এই হিন্দু মুসলমান সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে? এর জন্য দায়ী কে? বলা যাইতে পারে, উচ্চবংশের হিন্দুরা কখনও স্বেচ্ছায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে না। হইতে পারে ইহা সত্য কথা। হিন্দুসমাজ তাহার নিম্নশ্রেণীকে আপন গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে পারেন না কেন? লালতুদাই রায়—প্রবাসী, ভাদ্র—১৩৩৭ পৃঃ ৬৫৭

(২) Zwemer—Disintegration of Islam P. 155

নাই,—ইসলামের মূলতত্ত্বগুলি ভার্গববেদের তত্ত্ব হইতে অভিন্ন। আরবিকত্বের সহিতই হিন্দুর বিরোধ। কারণ আরবিকতা আর্য্যসাধনার মর্য্যাদা—বেদ-বেদান্ত-গীতার সম্মান—জানে না। গাথার আকার ক্ষীণ—অবান্তর বিষয় তাহাতে স্থান পায় নাই। কুৎসা-গ্লানি-নিন্দা-উপন্যাস, গাথার কোথাও নাই। সারমাত্রকৃশ গাথাকে আশ্রয় করিলে ইসলামের প্রভা শাণিত হীরকের ন্যায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। নিপুন সমীক্ষক ইসলামের উত্তমরূপ গাথাতেই প্রত্যক্ষ করিবেন।

(১) আচার-পঞ্চক—

রোজা নমাজ প্রভৃতি আচারপঞ্চক মজ্দা-যস্নের অবিরোধী। পরন্তু ঐক্যদ্বারা সংঘের শক্তি বর্দ্ধনের হেতু বলিয়া জারথুস্ত্র-মণ্ডের হিতকর।

(২) প্রত্যয়-ষটক—

মজ্দা-যস্নই, পরমেশ্বর, পয়ঘম্বর, প্রেরিত গ্রন্থ, প্রভৃতি ছয়টি তত্ত্বের মূল উৎস।

(৩) নিষ্ঠা-নবক—

একেশ্বরবাদ, মূর্ত্তিপূজা নিষেধ প্রভৃতি নয়টী নিষ্ঠা মজ্দা-যস্নের বিশেষত্ব।

(৪) কর্ম্মযোগ—

অমেষাস্পেন্ত (পুণ্যনীতি) শোভিত গাথার কর্ম্মযোগ অনবদ্য। ক্ষথ্র (তিতিক্ষা), বহিস্ত মন (প্রজ্ঞা) ও হউর্বাতা, (অধি-আত্মা) গাথার তিনটী প্রধান অমেষা (নীতি)। ইহারাই কর্ম্মযোগের সর্ব্বস্ব। ন্যায়ের প্রসার ও অন্যায়ের প্রতিরোধ উভয়ই অষার (ধর্ম্মের) সমতুল অঙ্গ বলিয়া গাথায় আদৃত।

(৫) ভক্তিযোগ—

গাথার প্রেমনিষ্ঠ ভক্তিযোগই সূফীবাদের জনক।

(৬) জ্ঞানযোগ—

মজদা ব্রহ্মেরই প্রকাশ। জ্ঞানযোগ গাথা (১) হইতে নির্ব্বাসিত নহে। জ্ঞানযোগের মূলসূত্র—"পূর্ণম্ অদঃ; পূর্ণম্ ইদম্, পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।" 'এই জীব ঐ ব্রহ্মেরই বিস্তার'। এই তত্ত্বই গাথার মুখে "বহিস্তা থ্যা, বহিস্তা য়েম্, অযা বহিস্তা হজওসেম্" (২) রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৭) নিদান—

ইসলামের উৎপত্তি মজদাযস্নে—ইহুদিপন্থার পরম্পরাক্রমে। ইসলামের স্থিতি মজদাযস্নে একেশ্বরবাদ, মূর্ত্তিপূজা নিষেধ প্রভৃতি লক্ষণে। ইসলামের পরিণতি মজদাযস্নে—অধ্যাত্মবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রেরণায়।

ইসলামপন্থায় যাহা আছে, মজদা-যস্নে তাহা সবই আছে। ইসলামে যাহা নাই—ভক্তি যোগের পরাকোটি, আর জ্ঞানযোগের বৈভব——মজদা-যস্নে তাহাও আছে। অপিচ পার্শীতন্ত্র হিন্দু বিদ্বেষ দ্বারা কলুষিত নহে। সমষ্টিগত ভাবে হিন্দু বিদ্বেষ বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের পরিপন্থি। ব্যষ্টিগতভাবে বিদ্বেষ হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি করে। যাহারা ইসলামের দোষগুলির পরিহার ও গুণগুলির অধ্যাহার করিতে চান, মজদা-যস্নই তাহাদের একমাত্র শরণ।

ব্রাহ্মসমাজে 'প্রেরিত গ্রন্থের' স্থান নাই। এক-স্বাধ্যায়তা যে দূর ও নিকটকে, অতীত ও বর্ত্তমানকে, একই চিন্তাধারায় চালিত করিয়া ঐক্য বন্ধনকে দৃঢ় করে, ব্রাহ্ম সমাজ তাহা লক্ষ্য করে নাই। আর্য্যসমাজে 'প্রেরিত পুরুষে'র স্থান নাই। অবতারের আদর্শ চরিত্রকে কত উন্নত করে, একই অবতারে আত্মসমর্পণ মানুষে মানুষে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, আর্য্যসমাজ তাহা উপেক্ষা করিয়াছে। শিখ-সমাজ,

(১) জুবান অকারণ—বেন্দিদাদ-ফরগাবদ-১৯

(২) যস্ন ২৮-৮

প্রাচীনকে প্রত্যাখান করিয়াছে, বেদ থাকিতে উপবেদের আশ্রয় নিয়াছে, গীতাকে গ্রন্থশেষ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। আচারের ঐক্য যে সংঘের ঐক্য বর্দ্ধনের প্রধান উপায় একথা ইহারা প্রায় সকলেই উপেক্ষা করিয়াছে। রোজা, নমাজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে কেবল ব্যক্তিগত শুচিতাবৃদ্ধির হেতুরূপে ব্যবহার না করিয়া, সমষ্টির মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করতঃ সংঘের শক্তিবৃদ্ধির হেতুরূপে প্রয়োগ, একমাত্র ইসলামই করিয়াছে (১)। তাই মূলতত্ত্বের ঐক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামের তুলনায় ইহাদের পরিধি এত সঙ্কুচিত। অপিচ কোনও কোনও অদূরদর্শী মৌলবী ইহাদিগকে ইসলামের ব্যর্থ অনুকরণ বলিয়া উপহাস করিতেও ত্রুটি করেন না। ইহারা ইসলামের অনুকরণ হইতে পারে, কিন্তু ইসলাম কাহার অনুকরণ সে কথা তাহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ইরাণের ধর্ম্মরাজ অথর্ব্বান্ জরথুস্ত্র যে পর্ব্বনবক-শোভিত পরশু হস্তে ধারণ করিয়া আছেন (২) আরবসমাজে প্রতিফলিত হইয়া তাহাই ইসলামের আকার পরিগ্রহণ করিয়াছিল ভার্গববেদের নবনীতসদৃশ গাথাই ইসলামের বীজ। ব্রাহ্ম-সমাজ বা আর্য্য সমাজ দ্বারা ইসলামের প্রয়োজন সিদ্ধ না হইতে পারে— পার্শীতন্ত্র দ্বারা ইসলাম অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজন সাধিত হয় কারণ পারস্যের সভ্যতাই ইসলামের জীবন। পারস্যের ভাষা ও সাহিত্য, পারস্যের কবি ও দার্শনিক, পারস্যের শিল্প ও কলা, পারস্যের রাজা ও মন্ত্রী, পারস্যের পোষাক ও পরিচ্ছদ তুলিয়া নিলে, ইসলামি

(১) (i) Khoda Baksh—Essays, Indian and Islamic P. 16
(ii) Margoliouth—Early Development of Muhammadianism P. 150
(iii) Macdonald—Vital forces of Christianity and Islam P. 13

(২) (i) Vendidad—IX-14
(ii) Jackson—Zaroaster—The Prophet of Ancient Iran P. 290

সভ্যতা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রিক্ততায় পর্য্যবসিত হইবে (১)। পারসিক কৃষ্টির মূল, গাথা। প্রাগ্-ইসলামিক যুগেই পারসিক কৃষ্টি সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। পারসিপোলিসের প্রাসাদে, বিহিস্তানের শিলালিপিতে, ম্যারাথন-থার্মপলির বিজয়ডঙ্কাতে, নশিরবানের দরবারে, জন্দি-শাহপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরবেজের সঙ্গীতবিজ্ঞানে, সেই কৃষ্টির পরিচয় আমরা পাই। গাথা আবার অথর্ব্ববেদের অর্দ্ধাঙ্গ ভার্গব উপস্থার সারস্বরূপ। পারসিক কৃষ্টি বৈদিক কৃষ্টিই বটে। পারসিকের পায়জামা আচকানের উপর, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর দাবীই অগ্রগণ্য।

হিন্দু মুসলমানের ঐক্য বেদান্ততন্ত্রের অবান্তর ফল। অবান্তর ফল হইলেও ইহা একটী তুচ্ছ ফল নহে। লাহোরের মিশনারি ধর্ম্মপ্রাণ Bancroft সাহেব ১৫-১-৩২ তারিখে New York Times পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে "পরস্পর বিভিন্ন দুইটী বিচিত্র সভ্যতার সামঞ্জস্যের চেষ্টাই বর্ত্তমানে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।" এই চেষ্টা যদি সফল হয়, এইরূপ বিসদৃশ দুইটী সভ্যতার সামঞ্জস্য যদি সম্ভবপর হয়, তবে জগতে এমন কোনও সভ্যতা নাই যাহাকে এই সনাতনতন্ত্রের ক্রোড়ীভূত করা যাইতে না পারে। এইরূপ একটী বিশ্বতোমুখ সামঞ্জস্যের উদ্ভাবনই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা। পৃশ্নি ও গাথা উপলক্ষিত বেদান্তচর্চ্চার মধ্যেই যে এরূপ সামঞ্জস্যের বীজ অন্তর্নিহিত আছে, নিবিষ্টচিত্তে প্রণিধান করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

(১) (i) O'Leary—Arabic Thought and its place in History P. 103

(ii) Andre Servier—Islam and the Psychology of the Musalman P. 239

(iii) Khoda Baksh—Essays, Indian and Islamic P. 76

ইসলামের মূলতত্ত্বগুলি জারথুস্ত্র-তন্ত্র হইতে অভিন্ন। জারথুস্ত্র-তন্ আবার অথর্ব্ববেদের অন্যতর অঙ্গ ভার্গব বেদের প্রস্থান। অতএ মূলতত্ত্ব লইয়া বিচার করিলে ইসলামকে বৈদিকতন্ত্রের প্রশাখা বলিয় মনে না করিবার কোন হেতু নাই। ইসলাম পার্শীতন্ত্রের অপভ্রংশ মুসলমান প্রচ্ছন্ন পার্শী। ভার্গব বেদকে অগ্রাহ্য না করিলে মুসলমানে সহিত হিন্দুর ধর্ম্মমত নিয়া কোনও কলহ থাকিতে পারে না। ধর্ম্মে মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও কলহ নাইও। যাহা কিছু কলহ তাহা কৃষ্টি পার্থক্য হইতেই উদ্ভূত, কৃষ্টিগত পার্থক্য আশ্রয় করিয়াই তাহ বর্ত্তমান। কিন্তু ইসলামিক কৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার পুনঃ আনাই পারসিক কৃষ্টি, আর পারসিক কৃষ্টিও ভারতীয় কৃষ্টির ন্যা আর্য্যকৃষ্টিরই অন্যতর বিকাশ, এই দুইটি কথা মনে রাখিলেই কৃষ্টিগ পার্থক্য নিয়াও হিন্দু মুসলমানের বিরোধের অবসর কমই থাকিবে গাথার বৈদিক শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিয়া মুসলমান যদি নমাজ (১ বন্দনা পাঠ করিতে আরম্ভ করে, তবে ইসলামের ইসলাম ও ক্ষুণ্ণ হয় না, হিন্দুর সহিত প্রণয়বন্ধনও দৃঢ় হয়। কারণ মূলত দ্বারাই ইসলামের ইসলামত্ব——আরবিক ভাষা একটা আকস্মিক উপাধি মাত্র। ইসলামের মূলতত্ত্বের প্রচার না করিয়া, কোরাণ যদি কতকগুলি অজা-গবী কাহিনীর সমাহার মাত্র হইত, তাহা হইলে কি লোকে কোরাণের তেমন সম্মান করিতে পারিত? ইসলামের মূলত প্রচার করিয়াছে বলিয়াই কোরাণের গৌরব, আর কোরাণে

(১) নমাজ কথাটী আরবিক নহে, পারসিক। ইহা সংস্কৃত নমস্‌-শব্দের রূপান্তর। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে পারসিক 'নমাজ' শব্দ ছাড়িয়া দিয় আরবিক 'সালাৎ' শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সিরাজগঞ্জে কতিপয় মুসলমান নেতা মাতৃভাষায় নমাজ-আবৃত্তির প্রথা প্রচলিত করি চেষ্টা করিতেছেন। ২৬ ৮ ১৯৩২ তারিখের Advance পত্রিকার সম্পাদকী স্তম্ভে ইহার আলোচনা আছে।

াণীর বাহন বলিয়াই আরবিক ভাষার গৌরব। ইসলামের মূলতত্ত্বগুলি াদি গাথায়ও দেখিতে পাই, তবে গাথার বাণীর বাহন বলিয়া জেন্দ ভাষার সম্মানই বা কেন না করিব? আর মুসলমান জেন্দ ভাষার ম্মান করিতে আরম্ভ করিলেই হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের নিবৃত্তি ইবে। কারণ জেন্দ (ছন্দস্) ভাষা, বৈদিক ভাষা; পাণিনি ারা অনুশাসিত। জেন্দ ও গাথায় অনুরক্তি হইলে, মুসলমানের হিত পার্শীর আর কোনও পার্থক্য থাকিবে না।

ইসলামিক কৃষ্টি যাহাকে আমরা বলি, তাহার উপাদানগুলির ধ্যে কেবল কোরাণ ও আরবিক ভাষাই আরবের উপহার; বাকী র্ব্বস্বই ইরাণের (আর্য্যায়ণের) অবদান। আরবিক ভাষা পরিত্যাগ রিয়া জেন্দকে গ্রহণ করিলে, মুসলমান সর্ব্বতোভাবেই বৈদিক মাজের গণ্ডীভুক্ত হইয়া পড়িবে।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন জেন্দের (সংস্কৃতের) চর্চ্চাদ্বারা মুসলমান কন বৈদিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে যাইবে? আরবিকের র্চ্চাদ্বারা হিন্দুই কোরাণিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন?" হার প্রথম উত্তর এই যে বেদান্ত সমঞ্জসক (synthetic)। হিন্দুর ন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোরাণিক সমাজে হিন্দুর জন্য কোনও স্থান াই। পক্ষান্তরে জরথুস্ত্রের আশীর্ব্বাদে, ভার্গবদেবের কৃপায়, সলমানের মুসলমানত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বৈদিক সমাজে মুসলমানের ন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তজ্জন্য ইসলামের সারতত্ত্বের বিন্দুমাত্রও রিত্যাগ করিতে হয় না; কেবল তত্ত্বের বাহন আরবিক ভাষার রিবর্ত্তনই পর্য্যাপ্ত। বেদান্ত সার্ব্বভৌম তন্ত্র। কর্ম্মযোগ, ভক্তি-যাগ, জ্ঞানযোগ,—বেদান্তে সকলেরই সুস্থান আছে। সাকারপন্থী, রাকারপন্থী, বর্ণাশ্রমবাদী, বর্ণাশ্রম বিবাদী সকলেই তথায় সমাদৃত। (১) তীয়তঃ বেদান্ত বহুমুখীন (comprehensive)। বৈদান্তিকের

) Maxmuller—History of Ancient Sanskrit Literature P.83

পক্ষে কোরাণ হইতে জানিবার নূতন কিছুই নাই; কোরাণিকের পক্ষে বেদান্ত হইতে জানিবার অনেক কিছুই আছে। যে কোনও সাধনা অবলম্বন কর না কেন, বেদান্তের শিক্ষার বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা নাই——"উল্‌টিয়ে শোও পাল্‌টিয়ে শোও, পা থাকে পৈঠানে"। সকল তত্ত্বই বেদান্তদ্বারা উচ্ছিষ্ট। বেদান্তকে অতি-ক্রম করিয়া কোনও অভিনব তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা নিস্ফল প্রয়াস মাত্র। তাহা ত্যাগ করিয়া বরং বেদান্তের আনুগত্য স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তৃতীয়তঃ বেদান্ত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম (perfect)। বিশ্বমানবের "জীবনবেদ" (১) গীতা বেদান্তেরই মর্ম্মবাণী। গীতার সহিত পরিচয় না হইলে মানবের ধর্ম্মজ্ঞান পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। ইসলামিক তত্ত্বের আধান, জেন্দ ভাষার কোরাণ, গাথার সাহায্যে গীতায় প্রবেশলাভ মুসলমানের পক্ষে সুগম পন্থা। গীতা, পৃশ্নি ও গাথার ক্রমবিকাশ; পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। যিনি কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিতে না চান, তিনি গাথার সাহায্যে গীতাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া পবিত্র হউন। সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার, ন্যায় হিংসা-দ্বেষ অসহিষ্ণুতার কুহেলিকা (২) মুহূর্ত্তের মধ্যেই উবিয়া যাইবে। বিশ্বের নিখিল মানবকেই মুসলমান আত্মীয় বলিয়া মনে করিতে পারিবে। হিন্দুকে অনাত্মীয় মনে করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারিবে। অতএব গাথাই মুসলমানের মুক্তির পথ। গাথার সাহায্যেই মুসলমান বেদান্তের গণ্ডীভুক্ত হইতে পারিবে। বেদান্ত কাহাকেও পর মনে করে না, বেদান্তকেও পর মনে করিবার

(১) Brooks – The Gospel of Life (Introduction) P. 50

(২) Martindale – The Religions of the World P.77

হেতু কাহারও নাই। বেদান্তকে একান্ত আপনার করিয়া লইবার একমাত্র পন্থা সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা। আরবিক কোরাণের পরিবর্ত্তে, জেন্দ ভাষার কোরাণ গ্রহণ করাই মুসলমানের পক্ষে বেদান্তের পথে প্রাথমিক পদ-বিক্ষেপ। বেদান্ত আবার ধ্বংসধ্বজী নহে। কেহ যদি বেদান্তের আশ্রয়ে না আসিতে চায়, না আসুক। তাহাতে তাহারই ক্ষতি। বেদান্ত কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না—বুঝাইয়া বলে, বলপ্রয়োগ করে না। ইহাও বেদান্তের গরীয়স্ত্বের আর একটী নিদর্শন। বেদান্ত আত্মরক্ষা করিতে চায়, অপরকে আক্রমণ করিতে চায় না। বেদান্ত জিগীষু বটে, জিঘাংসু নহে। ছান্দস্ কোরাণের (অর্থাৎ গাথার) উপর যাহার ভক্তি আছে, তিনি বৈদান্তিকের আত্মীয়, বৈদান্তিকও তাহার আত্মীয়; উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন। ছান্দস কোরাণের উপর যাহার রাগও নাই, দ্বেষও নাই, বৈদান্তিকও তাহার সম্বন্ধে উদাসীন। তাহার সহিত বৈদান্তিক, শত্রুতাও করেন না, মিত্রতাও করেন না। গাথাই ছান্দস কোরাণ, গাথাই আল্লোপনিষৎ। যিনি গাথাকে বিধ্বস্ত করিতে চান, তিনি বেদান্তের শত্রু—বৈদান্তিকও তাহার শত্রুতা করিবে।

"যো নঃ দ্বেষ্টি তম্ অন্বিচ্ছ,
যো নঃ দ্বেষ্টি তমিজ্জহি"

—আঙ্গিরস বেদ।

অতএব গাথার অভ্যর্চ্চনার উপরই হিন্দু মুসলমানের মৈত্রী অবলম্বিত। মুসলমান যদি গাথাকে স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করে, তবেই হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে। গাথার আশ্রয়েই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

পরন্তু হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য একটী মহৎ ফল হইলেও অবান্তর

ফল বটে। মুসলমান যদি গাথার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, না হইবে। (১) কিন্তু অথর্ব্ববেদের একতর শাখা, ভার্গব উপস্থার মুকুটমণি গাথা আমাদের নিত্য পাঠ্য। আর হাফেজ, ওমর খৈয়ম, বা জালালুদ্দিন রুমি, গাথাদ্বারাই অনুপ্রাণিত বলিয়া, ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিবার কোনও হেতুও আমাদের নাই। পৃশ্নি ও গাথা তুল্যভাবেই আমাদের জাতীয় আমিত্বের উপাদান; হাফেজ ও তুলসীদাস উভয়েই আমাদের সাধনার সহায়। বৈদিক কৃষ্টি বিশ্বময় প্রচারই যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা শুধু "হিন্দু-মিশনের" উপর নির্ভর করেন কেন তাহা বোঝা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে "পার্শী মিশনের" ব্যবস্থা করাও তাহাদের কর্ত্তব্য। তাহাতেই সাফল্যলাভের সম্ভাবনা বেশী। আর পার্শী-মিশনের ব্যবস্থা তাহারা না করিলে কে করিবে? পৃশ্নি ও গীতার সাহায্যে তিনবার সন্ধ্যা-বন্দনা পরিচালনার শিক্ষা প্রচারকদিগকে তাহারা যেমন দিয়া থাকেন, গাথা ও গীতার সাহায্যে পাঁচবার নমাজ-বন্দনা পরিচালনার শিক্ষাও তাহারা তেমন দেন না কেন? এই মণি-কাঞ্চন সংযোগ জগতে একেবারে অতুলনীয়। উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা উপবীত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু যদি 'পৃশ্নি'র সহিত 'গাথা'ও পড়িতে আরম্ভ করে, আর নব-জাত সংস্কার দ্বারা মেখলা (কুস্তি) গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পার্শী যদি 'গাথা'র সহিত পৃশ্নিও

(১) হিন্দী বা বাংলার ন্যায়, পার্শীও কাফেরেরই ভাষা, এই অজুহাতে লা-মজহবী মৌলবীগণের আন্দোলনের তোড়ে, ইদানীং পারসিকের অধ্যাপনা মক্তব হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। একেশ্বর মজ্দার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। পারসিক শব্দ বলিয়া "খোদা" নামটাকেও ওয়াহেবীগণ প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন না। "খোদা" কথা শুনিলে কাঠ-মোল্লারা চমকাইয়া উঠেন। "খোদা" যেন "আল্লার" শত্রু। (Sell—Faith of Islam P. 184)

পড়িতে আরম্ভ করে, তবে জগতের সকল ধর্ম্মতন্ত্রের গরিষ্ঠ ফললাভে তাহারা বঞ্চিত থাকিবে না।

গীতাতে সাকার ও নিরাকার উপাসনার সমন্বয়, অতএব 'পৃশ্নি' ও 'গাথার' সমন্বয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগের সমাবেশবশতঃ 'মূলসূত্র' ও 'ধর্ম্মপদের' সমন্বয়ও বটে। হিন্দু, পার্শী, জৈন ও বৌদ্ধ, গীতা সকলেরই নিত্যপাঠ্য।

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র বর্দ্ধমান ও গৌতম, গীতা সকলেরই প্রিয়; সকলেই গীতার প্রিয়। এই চারিজন ধর্ম্মরাজ আর্য্যসাধনার মহাবিনায়ক, বৈদিক-কৃষ্টির ধুরন্ধর দিক্‌পাল, বেদান্ততন্ত্রের ভট্টারকগুরু। কিন্তু জরথুস্ত্রও রামচন্দ্রের অবতরণের পরে, আর বর্দ্ধমান ও গৌতমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, ইহাদের সম্মিলিত সাধনার সন্ধিস্থলে, যে লোকোত্তর মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া বসুন্ধরা পবিত্র করিয়াছিলেন, সেই বাসুদেব গোবিন্দই এই চতুরঙ্গ বেষ্টিত আর্য্যসাধনার হৃদযন্ত্রস্বরূপ। তিনি মানবের শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক, যোগেশ্বর; মানবের পরিপূর্ণতার আদর্শ——দেবনর ও নরদেব। রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র, বর্দ্ধমাণ ও গৌতম, তাহার অংশস্বরূপ। তাহার অনুত্তরবাণীতে গীতার পাঞ্চজন্যে, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় আশ্চর্য্যমহিমায় ফুটিয়া উঠিয়া, নিঃশ্রেয়সের শাশ্বত পথ বিশ্বমানবকে নিরন্তর দেখাইয়া দিতেছে।

সমগ্রমানব সমাজকে ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করিবার একমাত্র গ্রন্থ গীতা (১)। ইহার অনুশাসন মানবমাত্রের প্রতিই প্রযোজ্য——ইহার আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়। গীতাই মানবকে মহামানবতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিবে। ব্যষ্টিগত জীবনে গীতার প্রতিষ্ঠা আছে। যেদিন সমষ্টিগত জীবনেও গীতাকেই কর্ম্মসূচী বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইবে, সেইদিন হিন্দু-পার্শী জগতের নেতৃত্ব লাভ করিতে পারিবে।

(১) Brooks—Gospel of Life (Introduction).

বেদের সার গীতায়। গীতার আদর্শে সমাজগঠনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, যিনি পুরাতন কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্যের নিনাদ, আর্য্যজাতিকে আবার নূতন করিয়া শুনাইয়াছিলেন, সেই একনাথ গণধর ধর্ম্মরাজ গুরু গোবিন্দসিংহের পুণ্য আশীর্ব্বাদ পল্লীতে পল্লীতে শিখসংঘের প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দু ও পার্শীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করুক।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

তৃতীয় অধ্যায়



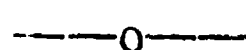
আগম (তন্ত্র)—গীতা-ফল

[শুদ্ধি—Propagation (of the Vedic Church)].

দুহ পন্থমে কপটবিদ্যা চলানি।
বহোড় তিসরা পন্থ কিজে প্রধানী ॥

গীতগোবিন্দ (নয়না স্তোত্র)।

হিন্দু ও পার্শী, উভয় পন্থাই কপট যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অতএব এই তৃতীয় পন্থার প্রয়োজন। ইহাকে জয়যুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়।



বেদে ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। পরমার্থলাভের জন্য কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান রূপ যে তিনটি পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাদের প্রত্যেকটিরই উল্লেখ আমরা বেদে দেখিতে পাই। কিন্তু গীতাতেই উহাদের বিশদ বিবরণ; কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান যোগের পরিপূর্ণরূপ গীতাতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদেও যোগত্রয়ের সমাবেশ আছে। কঠে কর্ম্মযোগের, শ্বেতাশ্বতরে ভক্তিযোগের (১) আর মুণ্ডকে জ্ঞানযোগের (২) উপদেশ সুস্পষ্ট। কিন্তু একমাত্র গীতাই এই যোগত্রয়ের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, উহাদের পারম্পরীণ সম্বন্ধ দেখাইয়া দিয়াছেন। অন্যত্র তাহা দুর্লভ।

(১) Macnicol—Indian Theism P. 163
(২) Farquhar—Outline of Religious Literature P. 59

আধ্যাত্মিক জীবনের সকল সত্যই বেদে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। গীতা উহাদিগকে বিকশিত করিয়াছে। বাকী ছিল জীবনে উহাদের প্রয়োগ।

যে মহাপুরুষ নিজের জীবনে উহাদের প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহার সমগ্র জীবন একটী অখণ্ড গীতাপাঠ সদৃশ, যাহার আদর্শ দেখিয়া কি ভাবে গীতার শিক্ষা স্বীয় জীবনে প্রযোগ করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়, যিনি গীতার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ, সেই গণধর একনাথ গুরু গোবিন্দ সিংহের রণধীর মূর্ত্তি, জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবার উৎসাহ আমাদিগকে অহরহ দিতে থাকুক।

একনাথ গুরুগোবিন্দ সিংহ, গীতার ধর্ম্ম, বেদের সত্য, নিজের জীবনে প্রয়োগ করিয়াছেন কেবল ইহাই নহে। অমৃতসরের অধিপতি গুরুগোবিন্দ, বিশ্ববরেণ্য বেদামৃত বিশ্ববাসীকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মের দ্বার তিনি বিশ্ববাসীর জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন। এইখানেই তাহার বিশেষত্ব।

সাকার ও নিরাকার উপাসনার প্রভেদ, সন্ন্যাসাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য-প্রধান ভারতীয় সাধনার, আর জিগীষাশ্রিত (১) ক্ষাত্র প্রধান ইরাণীয় সাধনার বিবাদ, আঙ্গিরস শাখার আর ভার্গব শাখার মধ্যে যে বিরোধ, তাহার সমন্বয় সাধন করিবার জন্য বাসুদেব গোবিন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২)

আর এই সমন্বয়ের মূল সূত্রকে পরিপুষ্ট করিয়া, উহার ব্যাপ্তি পরিবর্দ্ধিত করিয়া, আর্য্য ও অনার্য্যের যে বিরোধ তাহা দূর করিবার জন্যই গণধর একনাথ গুরুগোবিন্দ সিংহ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

উভয়ের উদ্দেশ্যও এক, কার্য্য প্রণালীও একই প্রকার, আর কার্য্যের ফলও এক। দেশাচারের অনাবশ্যক আবর্জ্জনার স্তূপ দূরে

(১) (i) Macdonell—Comparative Religion P. 54
(ii) Jackson—Zaroaster, the prophet of Ancient Iran P.2
(২) Vaidya—Epic India - P. 60

নিক্ষেপ করতঃ বৈদিক সাধনার গূঢ় প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া, সাধুতার বিকাশ ও অসাধুতার বিনাশ দ্বারা মনুষ্য জাতিকে পরমার্থের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিল এই উভয় মহাপুরুষের জীবনের সাধনা।

বাসুদেব গোবিন্দ বলিয়াছেন,—

পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

গীতা ৪—৮

সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ আর ধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। আর গুরু গোবিন্দ বলিয়াছেন ;—

ধর্ম্ম চলাবন
সন্ত উবারণ
দুষ্ট সবোঁকো মূল উপাড়ন।

গীত গোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)।

ধর্ম্মের সংরক্ষণ, সাধুদের উন্নয়ন আর দুষ্টদের উন্মূলনের জন্য আমি আসিয়াছি।

একজন বলিয়াছিলেন "আমি যুগে যুগে আসিয়া থাকি" আর একজন বলিলেন "আমি আসিয়াছি"।

কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সমন্বয় সাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ গীতায় প্রকটিত করা হইয়াছিল। কিন্তু "উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, বিরোধ নাই" শুধু এই মাত্র বলিয়া ছাড়িয়া দিলে, কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইবে, জীবনের বিশিষ্ট (Concrete) উদ্দেশ্য কী, তাহা হয়ত অনেকে নিজে স্থির করিয়া লইতে পারেন না, এই জন্যই বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গীতা নির্ব্বাক্ থাকেন নাই, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

"লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি"

গীতা—৩—২০

অপি লোক সংগ্রহম্ এব সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।

পরন্তু মনুষ্য জাতির ঐক্য সাধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিয়া যাও।

গীতায় মনুষ্য জাতির ঐক্য-সাধনের সূচনা। এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল পরবর্ত্তী যুগে, গীতার একনিষ্ঠ সেবক, ধর্ম্মরাজ একনাথ গুরু গোবিন্দ সিংহের দ্বারা।

ব্রাহ্মণ্য মূলক আত্মত্যাগ, আর ক্ষাত্র মূলক আত্মপ্রতিষ্ঠা, হিন্দুর ধর্ম্ম পরায়ণতা আর পারসীকের কর্ম্মশীলতার (১) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, মহাভারতের যুগে তাহা চরম কোটিতে পৌঁছিয়াছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির বারবার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাস আশ্রয় করিতে চাহিতেছেন, আর বন পর্ব্বে, উদ্যোগ পর্ব্বে, সভাপর্ব্বে ও শান্তি পর্ব্বে, ভিন্ন ভিন্ন মুণিগণ (বিশেষতঃ ধর্ম্মবিদ্ বিদুর) এই সমস্যার সমাধানের জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট ধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তারপর বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও যখন, বিশিষ্ট রূপে ভারতীয় এই "সন্ন্যাস রোগে" আক্রান্ত হইলেন, তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতার বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দু-পারসীকের বিসম্বাদ, সাংখ্য ও যোগের দ্বন্দ্ব, চিরদিনের জন্য মীমাংসা করিয়া দিলেন (২)। আর্য্যতন্ত্রের উভয় শাখার, অথর্ব্ব বেদের উভয় ধারার মধ্যে মিলনের আর কোনও বাধা রহিল না।

কিন্তু কেবল আর্য্যদিগকে লইয়াই মনুষ্যজাতি গঠিত নয়। বরং বসুন্ধরা মাতার সন্তানদের মধ্যে আর্য্য অপেক্ষা অনার্য্যেরাই সংখ্যা বলে বলীয়ান। আর্য্যগণের ঐক্য সাধন মনুষ্যজাতির ঐক্য

(১) (i) Macnicol—Indian Theism P. 16.
(ii) Macdonell—Comparative Religion P. 54.
(২) Telang—Bhagavod Gita (Introduction)—P. 24.

প্রতিষ্ঠার সহায়ক বটে—সর্ব্বস্ব নহে। আর্য্য অনার্য্যের সাম্মিলন না হইলে মনুষ্যজাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা অথবা লোক সংগ্রহ হয় না—বিশ্বমানবের জন্ম হয় না। আর্য্য অনার্য্য উভয়েই একই পরমেশ্বরের সৃষ্ট।

একৈ নয়ন একৈ কান
একৈ দেহ একৈ বান
গীতগোবিন্দ (অকাল স্তুত)—৫৯

নয়ন, কান, দেহ ও বাণী সকলের একই প্রকারের।

অনার্য্যদিগকেও বেদান্ত ধর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য প্রথম আহ্বান করিয়াছিলেন—তথাগত গৌতম বুদ্ধ, আর মহাবীর বর্দ্ধমান জিন (১)। গৌতম বুদ্ধের আশীর্ব্বাদেই চীন ও জাপানকে আমরা আত্মীয় বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি, ব্রহ্মদেশবাসী ভিক্ষু উত্তমকে হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে পাইতে পারিয়াছি। (২)

কিন্তু কতিপয় আর্য্যের, অনার্য্যের বিরুদ্ধে বিরাগ, এত প্রবল ছিল যে অনার্য্যদিগকে আত্মীয় বলিয়া মনে করা দূরের কথা, তাহারা বরং বিষ্ণুর অবতার গৌতমবুদ্ধ ও বর্দ্ধমান-জিনকেই অবৈদিক বলিয়া রটনা করিতে লাগিলেন।

নতুবা বেদোক্ত কর্ম্মযোগের বিশুদ্ধরূপ যিনি দেখাইয়াছেন যতিগণের আদর্শ সেই গৌতম বুদ্ধকে, আর বেদোক্ত জ্ঞানযোগের বিশুদ্ধরূপ যিনি দেখাইয়াছেন ভিক্ষু কুলের আদর্শ সেই বর্দ্ধমান জিনকে, অবৈদিক মনে করিবার অন্য কী কারণ আছে? বেদের নিন্দা তো গীতাতেও আছে। তাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তো কেহ অবৈদিক বলিয়া বলে না।

গৌতম বুদ্ধ ও বর্দ্ধমান জিন প্রবর্ত্তিত, অনার্য্যদিগকেও এক গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য এই যে আহ্বান, তাহাতে সকল আর্য্য,

(১) Macnicol—Indian Theism P. 63.
(২) Amrita Bazar Patrika—21-4-35.

অকুণ্ঠিত চিত্তে যোগ দিলেন না। ফলতঃ শক, খস, গুরখা প্রভৃতি কতকগুলি জাতি আর্য্যগণের সাত্মতা লাভ করিলেও, শবর, দরদ, পহ্লব প্রভৃতি জাতিগুলি বেদান্তের স্বাদে বঞ্চিত রহিল।

তন্মধ্যে শবর (১) জাতিই প্রধান। মহাত্মা মুসা মঘবান জরথুস্ত্রের প্রেরণায় একেশ্বরবাদ, নিরাকারোপাসনা, পরলোকে বিশ্বাস প্রভৃতি শিখাইয়া শবর জাতির ভিতর ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন (২)। ইহার নাম ইহুদিপন্থা। মহাত্মা ঈশা তথাগত গৌতমবুদ্ধের অনুসরণে ত্যাগের মহিমা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মহারাজা অশোক যে সমস্ত বৌদ্ধ প্রচারককে গ্রীক সীমান্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই গৌতম বুদ্ধের আদর্শ ইহুদিদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া এসেনিয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন (৩)। তাহারাই যীশুখৃষ্টকে আত্মত্যাগের প্রেরণা দিয়াছিলেন। হজরত মহম্মদ ইহুদিতন্ত্রের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে ইসলাম নামে অভিহিত করেন (৪)। আর ঐ ধর্ম্মতন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেন।

---

(১) শবর শব্দের অপভ্রংশ—হ—ব—র। সংস্কৃত শ, স = জেন্দ্ হ। (যথা সিন্ধু = হিন্দু, সপ্ত = হফত, অসুর = অহুর)। 'হবর' শব্দ হইতে 'হিব্রু', ও হবরের অপভ্রংশ 'হরব' হইতে আরব শব্দের উৎপত্তি। বাংলা ভাষায় 'হিব্রু' ও 'আরব' লিখিতে পার্থক্য এত বেশী যে এই ব্যুৎপত্তি অনেকে উদ্ভট মনে করিবেন। কিন্তু যে কোনও আরবী অভিধান খুলিলেই দেখা যাইবে যে শুধু 'অ' 'ব' ও 'র' এই তিনটী অক্ষর দ্বারাই এই দুই শব্দ লিখিত হয়। বর্ত্তমান উচ্চারণ যদিও খুব পৃথক্।

(২) Chatterjee—Ethical Conceptions of the Gatha, P. 538.

(৩) (i) Dutt—Ancient India—Vol II—P. 340.
(ii) Geiger—Civilisation of Eastern Iranians—Vol II P. 170.

(৪) Hurgronji—Muhammadianism P. 61.

একনাথ গুরুগোবিন্দ সিংহ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বৈদিক ধর্ম্মতন্ত্রের সঙ্কট সময়। আর্য্যায়ণে মঘবান জরথুস্ত্রের পতাকা ভূমি বিলুণ্ঠিত, আর্য্যাবর্ত্তে রামচন্দ্রের তূর্য ধ্বনি থামিয়া গিয়াছে। বেদদ্বেষী ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ছলে বলে ও কৌশলে, ইসলাম পন্থা প্রচার করিতেছেন। বেদান্ততন্ত্র বোধ হয় আর টিকে না।

যিনি আর্য্য ও অনার্য্য উভয়েরই একমাত্র রক্ষক তাঁহার নিকট সংস্কৃত ভাষা ও আরব ভাষার মূল্য সমানই। একের দ্বারা অপরের নিপীড়ন তিনি চান না। কোরাণও বলিয়া গিয়াছেন "রুদ্র যদি ইচ্ছা করিতেন তবে সকল মনুষ্যকেই একতন্ত্রভুক্ত করিতেন (১)। ঔরঙ্গজেব সে কথা ভুলিয়া গিয়া বেদপন্থীদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করিতে লাগিলেন। তাহার বল অপরিমিত। তিনি তরবারির বলে জিজিয়া কর স্থাপন করিয়া বেদপন্থীদিগকে মুসলমান করিতে লাগিলেন। বেদের ধর্ম্ম বুঝি আর রক্ষা পায় না। ভগবদ্গীতার মধুর সঙ্গীত বোধ হয় চিরদিনের তরে লুপ্ত হইতে চলিল। সাধুসজ্জনের নিপীড়ীত কণ্ঠ হইতে নিরাশার আর্ত্তনাদ বাহির হইতে লাগিল :—

বল ছুটকো, বন্ধন পড়ে
কছু না হোত উপায়।
কহু নানক অব উট হরি
জ্যো হোয়ি সহায়॥

গুরু-গ্রন্থ, মহল্লা—৯

বল ক্ষীণ হইয়াছে, চারিদিকে বন্ধন পড়িয়াছে (তেঘ বাহাদুর রূপী), নানক বলিতেছেন হরি যেমন গজের সহায়তা করিয়াছিলেন, সেইরূপ সহায়তা যদি না করেন, তবে আর কোনও উপায় দেখি না (২)।

(১) সুরা—১৬,—৯৫ (5—104)
(২) তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরুগোবিন্দ সিংহ P. 131.

নির্য্যাতিতের আর্ত্তনাদ বিশ্ববিধাতার চরণপ্রান্তে পৌঁছিল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাত্রির শেষ প্রহরে, যুগাবতার ধর্ম্মরাজ গুরুগোবিন্দ সিংহ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। (১)

দশম বর্ষীয় বীরবালক ঘনতমিস্রার অন্তরালে উষার আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইলেন। অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা সেই দিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক শত্রুর হৃদয় কম্পিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন ;

বল হুয়া বন্ধন ছুটে
সব কিছ্ হোত উপায়
নানক সব কিছ্ তুমরে হাতমে
তুমহি হোত সহায়। (২)

আদিগ্রন্থ, মহল্লা—১০

বল আসিয়াছে, বন্ধন খসিয়া পড়িয়াছে। সকল অবস্থাকেই সিদ্ধির উপায়ে পরিণত করা যায়। হে তেঘ বাহাদুর রূপী নানক,—তোমার নিজের উপরই সাফল্য নির্ভর করে। তোমার সহায়তার জন্য তুমি নিজেই পর্য্যাপ্ত।

গুরু গ্রন্থের চারিটী শ্লোক তত্কালীন হিন্দু সমাজের অবস্থা সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত করে। যেন একজন চিত্রকর সুনিপুণ তুলিকায় একটী সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছে।

শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হিন্দু সমাজ তেঘ বাহাদুরের ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছে,

(১) (i) বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরুগোবিন্দ সিংহ—P. 17
(ii) Kartar Sing—Life of Guru Govinda Sinha—P. 18
(২) তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরুগোবিন্দ সিংহ—P. 132

সঙ্গ সখা সব ত্যজি গয়ে
কোউ না নিবহো সাথ।
কহু নানক ইয়ে বিপত্তিমে
টেক এক রঘুনাথ। (১)

আদিগ্রন্থ, মহল্লা—৯

মিত্র ও অনুচরেরা সব ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। কাহাকেও নিকটে দেখি না। (তেঘ বাহাদুর রূপী) নানক বলেন এই বিপত্তিতে রঘুনাথই এক মাত্র আশ্রয়।

আর নব জাগ্রত হিন্দু সমাজ সাফল্যের উপায় উদ্ভাবন করিয়া. আশায় উচ্ছসিত হইয়া, গুরু-গোবিন্দের কণ্ঠে দৃপ্ত উৎসাহে বলিয়া উঠিতেছে,

নাম রহো সাধু রহো
রহো গুরু-গোবিন্দ
কহু নানক ইয়ে জগতমে
কে না জপো গুরুমন্ত্র ॥ (২)

আদিগ্রন্থ, মহল্লা—১০

এখনও হিন্দুর নাম লুপ্ত হয় নাই, হিন্দু সমাজে সজ্জনের অভাব হয় নাই, আর তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য গুরুগোবিন্দ এখনও বর্ত্তমান আছে। (গোবিন্দ রূপী) নানক বলেন তোমরা গুরুমন্ত্র (গুরুগ্রন্থ) গ্রহণ কর না কেন?

যিনি শত্রুর স্পর্দ্ধায় লজ্জা দিয়া একদিন দর্পভরে বলিয়াছিলেন,

"চিড়িয়া কোলোঁ বাজ তড়াউ।
তবৈ গোবিন্দ সিংহ নাম কহাউ"

গীতগোবিন্দ (রহেতনামা) (৩)

(১) Sher Sing—Guru Govinda Singji—P. 43
(২) Rup Singh—Universal Religion P. 12.
(৩) Puran Singh—Victory of Faith P. 39.

'যদি আমি চটক দ্বারা বাজ তাড়াইতে পারি, তবেই আমার নাম গোবিন্দ সিংহ।' আর মোগল রাজকে বিধ্বস্ত করতঃ নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া যিনি "গোবিন্দ রায়" নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক "গোবিন্দ সিংহ" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, (১) সেই বীর শৈবের মুখেই আর্য্যজাতির অধিনায়কত্বের এই দাবী শোভা পায়।

অনন্য সাধারণ মণীষাদ্বারা গুরুগোবিন্দ সিংহ আর্য্যসমাজদেহে যে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন, এই চারিটী শ্লোক যেন সেই দৃশ্যের নান্দী-বাচন। পটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, গুরু গোবিন্দের আধিনায়কত্বে হিন্দু সমাজ নব-কলেবর গ্রহণ পূর্ব্বক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে। কি কাব্য-কৌশলে, কি ঐতিহাসিক গৌরবে, কি নৈতিক-প্রেরণায়, এই শ্লোক চতুষ্টয় বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য।

গুরু গোবিন্দের রচনার মধ্যে মাত্র এই দুইটী প্রত্যুক্তিই আদিগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে।

আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতঃ "শির দিয়া পর সর নহি দিয়া।" (২)—আমি শির দিলাম কিন্তু সার (ধর্ম্ম) দিলাম না—দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতে বলিতে পিতা তেঘবাহাদুর যখন ধর্ম্মান্ধ ঔরংজেবের আদেশে দিল্লীনগরীতে জহ্লাদের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তখন পুত্র গোবিন্দ রায় দশ বর্ষীয় বালক মাত্র।

ধর্ম্মপ্রাণ নিষ্পাপ অজাতশত্রু তেঘ বাহাদুরের নির্ম্মম হত্যায় জাতিবৎসল হিন্দু মাত্রই নিদারুণ বেদনায় মথিত হইতে লাগিল কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের অসীম বলের সম্মুখে একটী নগণ্য বালকের করুণ আর্ত্তির কি মূল্য আছে? একটী বালক কেন শত শত বালককে পিতৃহীন হইবে, শত শত পিতাকে

(১) Kartar Singh—Guru Govinda Singh—P. 120

(২) শীর দিয়া পর সিরর ন দিয়া—বিচিত্র নাটক।

পুত্রশোক পাইতে হইবে। বৈদিকমার্গ অনুসরণরূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান যাহারা করে, ঔরংজেব তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। ক্ষমাই যদি করিবে, তবে দারাশিকো আর ঔরংজীবে প্রভেদ রহিল কোথায়?

হৃদয়ের আবেগ যাহারা মুহুর্ত্তের উচ্ছ্বাসে নিঃশেষিত করিয়া দেয়, সেইরূপ চপলমতি ব্যক্তিদ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। সিদ্ধির জন্য শক্তির প্রয়োজন। ভোজ বাজির আম গাছের মত শক্তিশৈল একদণ্ডে গজাইয়া উঠে না। পলে পলের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা প্রবাল দ্বীপের মত উহাকে গড়িয়া তুলিতে হয়। পিতৃহত্যার সমাচার শুনিবা মাত্রই বালক গুরুগোবিন্দ অসি হস্তে অসহিষ্ণু ভাবে দিল্লীর দিকে ধাবমান হইলেন না। নির্লিপ্ত উদাসীর ন্যায় হিমাচলের উপত্যকায় আত্মগোপন করিলেন। জাতির মুক্তির জন্য, বেদ উদ্ধারের জন্য, তিনি কঠোর তপস্যায় রত হইলেন; অরি-মেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য সমিধ্ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

শত্রুঞ্জয় পরাক্রম সঞ্চয় করিয়া তিনি যখন হিমালয়ের নিভৃত উপত্যকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন তখন গুরুগোবিন্দ ত্রিংশ বর্ষীয় যুবক।(১)

পরন্তপ গুরুগোবিন্দের নিভৃত সাধনা কালীন মানসিক অবস্থার সুন্দর একখানি চিত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে দিয়াছেন।

এখনো বিহার কল্পজগতে
অরণ্য রাজধানী।
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা।
দিবা নিশি শুধু বসে' বসে' শোনা
আপন মর্ম্মবানী॥

(১) Kartar Singh—Life of Guru Govinda Singh—P. 46

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে
দুর্গম গিরি মাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী কল্লোলে।
গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে ॥
এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ
আরো কতদিন হবে।
চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ।
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।
কবে প্রাণ খুলি' বলিতে পারিব
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ ॥

ইসলামের শক্তির মূল উৎস কোথায়, গুরু গোবিন্দ নিপুণভাবে তাহা বিশ্লেষণ করিতেছিলেন। কোরাণে এমন কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নাই যাহা পৃশ্নি ও গাথাতে পাওয়া যায় না। তথাপি দিন দিন কোরাণের বৃদ্ধি, আর পৃশ্নিও গাথার ক্ষয়। দিন দিন কোরাণ জিতিতেছে আর পৃশ্নি গাথা হারিয়া যাইতেছে। দেশে দেশে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে আর হিন্দু পার্শীর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ তাহার নিকট অবিদিত রহিল না।

তাঁহার লোকোত্তর দৃষ্টি দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে একমাত্র

সংঘ শক্তিই মুসলমানকে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ করিয়াছে। হিন্দু ও পার্শীকে সংঘবদ্ধ করাই গুরুগোবিন্দের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হইল।

আরবেই হউক, পারস্যেই হউক, ভারতেই হউক আর তুরস্কেই হউক, সকল দেশের সকল মুসলমানই নিজদিগকে একগোষ্ঠিভুক্ত মনে করিয়া একযোগে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। ইহাই হইল মুসলমানের প্রভাবের হেতু। হিন্দুগণ ও পার্শীগণ ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। হিন্দু—পার্শী মিলিয়া কার্য্য করা তো দূরের কথা, সমস্ত হিন্দুগণ কিম্বা সমস্ত পার্শীগণ ও একসঙ্গে মিলিত হইতে পারিত না।

"এক ঈশ্বর, এক গুরু ও এক গ্রন্থের" নামে সম্মিলিত হইতে আহ্বান করিয়া, গুরু গোবিন্দ হিন্দু পার্শীর সংঘশক্তি উদ্বুদ্ধ করিলেন। হিন্দু পার্শী সংগঠিত শিখ-সংঘ, মুসলমানকে পরাজিত করিল।

পৃথিবীর ষোল কোটি মুসলমানের মধ্যে আট কোটির বাসই ভারতবর্ষে (১)। দিল্লীর বাদশাহই ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। শিখের সিংহনাদে দিল্লীর সিংহাসন শতধা বিদীর্ণ হইল। আর্য্যের লীলাভূমি পঞ্চনদ প্রদেশ মুসলমান প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া "বাহি গুরুজীকি ভাতি" (আশ্চর্য্য গুরুর প্রভা) বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ
নির্ম্মম নির্ভীক।

মুসলমানের হাত হইতে শিখগণ পঞ্জাব কাড়িয়া লইল। ভারত সাম্রাজ্যের প্রতীক স্বরূপ কোহ্-ই-নুর মণি রণজিত সিংহের হস্ত

(১) Mott—Muslim World To-day P. 93.

গত হইল (১)। শিখের নিকট হইতেই ১৮৪৯ সনে ইংরেজ পঞ্জাব জয় করিয়াছে। মুসলমানের নিকট হইতে নহে (২)। অবশ্য মুসলমানের হাত হইতে পঞ্জাব কাড়িয়া লওয়া উদ্বুদ্ধ শিখ শক্তির একটা অবান্তর ফলমাত্র। পরন্তপ গুরুগোবিন্দ অনেক যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যদি তাহাকে প্রতাপসিংহ বা শিবাজীর সহিত তুলনা করা হয়, তবে তাহা ভীমসেনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের, অথবা সুলতান মামুদের সহিত হজরত মহম্মদের তুলনার মতো উপহসণীয় হইবে। একজন রণনিপুন যোদ্ধা, শারীরিক বলে বলীয়ান—আর একজন আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্য ঈশ্বর প্রেরিত মহামানব। সাম্রাজ্যই একজনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, সর্ব্বস্ব—আর একজনের পক্ষে উহা উপলক্ষ্য, উপকরণ মাত্র। শিবাজী ও প্রতাপ সিংহ রাষ্ট্রগঠণ করিয়া ছিলেন ; জাতি গঠন করেন নাই। গুরুগোবিন্দ সিংহ জাতি গঠন করিয়াছেন। (৩) সমাজের উন্নতির জন্য একটী বিশিষ্ট পদ্ধতি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শিবাজী ও প্রতাপ সিংহের বীরত্ব তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া গিয়াছে—গুরুগোবিন্দের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিলে যে কোনও দুর্ব্বল জাতিই অচিরে বলশালী হইয়া উঠিতে পারে। গুরুগোবিন্দের আবির্ভাবের পর হইতেই ইসলামের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে লাগিল। ইসলামের মূল কারণ ছিল সংঘ শক্তি। এই সংঘশক্তি গুরুগোবিন্দ অক্লেশেই আয়ত্ত করিয়া লইলেন গুরু গোবিন্দের জীবন দ্বারা হিন্দু-পার্শী নব জীবন লাভ করিল। হিন্দু পার্শীকে সম্মিলিত করিয়া তিনি যে নূতন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার নাম শিখ-সঙ্গত।

(১) Griffin—Ranjit Sing—P100

(২) শরৎ চন্দ্র রায়—শিখ গুরু ও শিখ জাতি P. 146.

(৩) Kartar singh —Guru Govinda Singh—P. 275

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

ইসলামের সহিত তুলনায় শিখ পন্থার অনেকগুলি উৎকর্ষ লক্ষিত হইবে।

প্রথমতঃ ইসলামতন্ত্রে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের অসদ্ভাব। প্রজ্ঞানিষ্ঠ গৌতম বুদ্ধের কর্ত্তব্যময় জীবন, কিম্বা ব্রহ্মনিষ্ঠ বর্দ্ধমান জিনের আত্মনির্ভর, ইসলামে দুর্লভ। গীতাগ্রন্থের উত্তরাধিকার সূত্রে শিখপন্থা যোগত্রয়ের প্রভায় সমুজ্জ্বল। (১)

ইসলাম "ধর্ম্মগ্রন্থের" উপর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেশমাতৃকার সেবার জন্য ইসলামে কোনও স্থান নাই। ভারতীয় মুসলমান ভারতকে ভালবাসিবে, পারসিক মুসলমান পারস্যকে ভালবাসিবে, ইসলাম একথা মানিতে চায় না। দেশপ্রেমের সহিত শাস্ত্র প্রেমের সামঞ্জস্য ইসলাম করিতে পারে নাই। শিখ ধর্ম্ম তাহা পারিয়াছে। গুরুগোবিন্দ বলিয়া গিয়াছেন

বাব-এ বাবরকো দেও।

গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

রাজার প্রাপ্য কর রাজাকে দিবে, আর গুরুর প্রাপ্য কর গুরুকে দিবে।

ঔরংজেব বেদপন্থীদের উপর অত্যাচার করিতেন। রাজপুরুষের অযোগ্য কার্য্য করিতেন এই জন্য ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াও গুরুগোবিন্দ চিরজীবন ঔরংজেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ অত্যাচার হইতে বিরত হইলে, গুরুজীও অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইসলাম বিদ্বেষই যদি তাঁহার অস্ত্রধারণের কারণ হইত, তবে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বাহাদুর শাহের আমলে তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন না।

অন্য ধর্ম্মতন্ত্রাবলম্বীদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া একই রাষ্ট্রে অবস্থান মুসলমান জানে না—জিজিয়ার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে আকুল করিয়া তোলে। শিখ এই দোষ হইতে মুক্ত। ইহার প্রধান

(১) অকালস্তুত—৬০
—২২৯

কারণ এই যে গুরুদ্বারে কাহারও জন্যই স্থানের অভাব নাই। রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্রের সম্মিলিত সাধনার ফলে সাকারোপাসকও শিখের আত্মীয়, নিরাকারোপাসকও শিখের আত্মীয়। 'পাষাণ পূজায় কোনও ফল নাই' (১)—গুরুগোবিন্দ এই কথা বারবার বলিয়া গিয়াছেন, আবার নয়না দেবীর স্তুতিপাঠও তিনিই গাহিয়াছেন। (২)

শিখতন্ত্রে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম যোগের সমন্বয় আছে, আবার রাষ্ট্রপ্রেম ও শাস্ত্রপ্রেমেরও সমন্বয় আছে। তদুপরি বিশেষ কথা এই যে কোনও নির্দ্দিষ্ট আচারকে সনাতন বিধিরূপে গণ্য করিয়া, গুরুগোবিন্দ জাতির ভবিষ্যত্ উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া যান নাই।

শিখ ধর্ম্মের মত গাণপত্য (Democracy) অন্য কোনও ধর্ম্ম তন্ত্রে নাই। 'পঞ্চ পিয়ারা' নামে বিখ্যাত, দয়াসিংহ প্রমুখ পাঁচজন শিখকে নির্ম্মল—পন্থায় প্রথম দীক্ষা দান করিয়া, গুরুগোবিন্দ আবার নিজেই তাহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, পাঞ্চজন্যের মাহাত্ম্য অবিসংবাদিত ভাবে রটনা করিয়া গিয়াছেন।

গাণপত্যের অপর ফল "গুরুমতা" নামক সংস্থা। গুরুর নামে মিলিত হইয়া যে সভায় শিখগণ আপনাদের "মত" নির্ণয়

(১) কাহেকো পূজত পাহনকো,
কুছ পাহনমে পরমেশ্বর নাহি।
তাহিকো পূজ প্রভু কহকৈ।
যিহ পূজত অঘ উঘ মিটাই।

গীত গোবিন্দ (তেত্তি সবৈয়া)।

(২) সুখ পসারে কালিকা
দৈত্য চবাবে দাঁত।
পন্থ চলাবে জগতমে
দুষ্করে তবৈ শাত॥

গীতগোবিন্দ—নয়না স্তোত্র

করে, তাহার নাম গুরুমতা। সমাজের যে কোনও সমস্যার সমাধানের উপায় এই গুরুমতা। কোনও নূতন রীতি সমাজে গ্রহণীয় কিনা, কোনও পুরাতন রীতি বর্জ্জনীয় কিনা, তাহার মীমাংসার ভার গুরুগোবিন্দ স্মৃতি শাস্ত্রের উপর রাখেন নাই, রাখিয়াছেন গুরুমতার উপর। গুরুমতা অধিবেশনের নিয়ম এই, যে কোনও স্থানের শিখগণ নিজেদের ভিতর পাঁচ জনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবে। এই প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া আবার পাঁচ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবে। অথবা নির্দ্দিষ্ট দিনে অমৃতসরে হরি মন্দিরে যে সমস্ত শিখ উপস্থিত থাকিবে তাহাদের মধ্য হইতে পাঁচ জন প্রধান ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবে। এই পাঁচ জনের মধ্যে গরিষ্ঠ সংখ্যকের মতে যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, একমাত্র তাহাই সমস্ত শিখ সমাজে গ্রাহ্য হইবে (১)। সমুদ্র যাত্রা করিতে পারা যায় কিনা, বিধবা বিবাহ সঙ্গত কিনা, খৃষ্টানকে শুদ্ধি-করা যায় কিনা, ইহা স্থির করিবার জন্য শিখদিগকে 'বায়ু পুরাণের পাঠ ভেদ খুঁজিয়া আয়ুশেষ' করিতে হয় না। গুরুমতার নির্ণয় দ্বারাই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগের সদ্ভাব, দেশপ্রীতির সদ্ভাব আর গুরুমতার ব্যবস্থা বশতঃ শিখতন্ত্র ইসলাম, খৃষ্টান প্রভৃতি পরকীয় ধর্ম্মতন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অন্তরঙ্গ উৎকর্ষ বশতঃ ইহার জয় অবশ্যম্ভাবি।

বস্তুগত্যা বৈদিক ধর্ম্মের দুইটী রূপ—পুরাণ ও আগম। একই বৈদিকধর্ম্মের বিন্যাস হইলেও উভয়ের ব্যাখ্যা প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পুরাণের পন্থা হইল বিদ্যা অথবা আত্মজয়, আর আগমের পন্থা হইল অবিদ্যা অথবা প্রকৃতিজয়। আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনই জীবনরক্ষার উপায়। পুরাণ বলেন নিজের

(১) Teja Sing—Sikhs and Organisation P. 7

চরিত্রই এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে যে প্রতিবেশের সহিত কোনও রূপ সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়। আগম বলেন প্রতিবেশকেই এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, যে তাহা কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত করিতে না পারে। পুরাণের আদর্শ তিতিক্ষা, আগমের আদর্শ জিগীষা। পুরাণের আদর্শ সংযম, আগমের আদর্শ শক্তি। পুরাণ বলেন শত্রু তোমার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে, তাহাতে তোমার মনে যেন কোনও বিকার উপস্থিত না হয়, তুমি যেন তাহাকে আর এক গণ্ড পাতিয়া দিতে পার। আগম বলেন, চপেটাঘাতে তোমার মনকে বিকৃত হইতে দিবেনা তাহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অনর্থক চপেটাঘাত সহ্য করিয়া কোনও লাভ নাই, নিজে এমন শক্তি অর্জ্জন কর, যেন শত্রু চপেটাঘাত করিতে সাহস না পায়। চপেটাঘাত সহ্য করাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা নহে। পুরাণ বলেন আবেষ্টন যেন তোমাতে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে না পারে, তুমি আবেষ্টন অপেক্ষা শক্তিশালী—— গুণাতীত। (Let not the environment affect you—you are superior to it) আগম বলেন তুমি আবেষ্টনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইও, তুমি তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী। (Let you change the environment—you are superior to it) আবেষ্টনের শক্তিকে অস্বীকার করা পুরাণের পথ, আর আবেষ্টনের শক্তিকে স্বানুকূল করিয়া লওয়া আগমের পথ।

হিন্দু ও পার্শী সমাজ পুরাণের পথ অনুসরণ করিয়া দিনে দিনে আধিভৌতিক শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিল। আবেষ্টনকে জয় করা দূরের কথা, জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা ও তাহাদের মনে স্থান পাইতনা। এই রোগের চিকিৎসা করিয়া, আবেষ্টনের উপর প্রভুতা লাভের শক্তি, গুরুগোবিন্দই তাহাদিগকে আনিয়া দেন। মুসলমানের পরাভব এই শক্তিরই অন্যতম ফল মাত্র।

মাধ্যমিক-কারিকা রচয়িতা আচার্য্য নাগার্জ্জুন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক (১)। বেদান্তের কর্ম্মযোগমূলক ব্যাখ্যা তিনিই করিয়াছেন। ভক্তিযোগ মূলক ব্যাখ্যা করিয়াছেন আচার্য্য রামানুজ, আর জ্ঞানযোগমূলক ব্যাখ্যা করিয়াছেন আচার্য্য উমাস্বাতি তাঁহার তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে (২)। শঙ্করভাষ্যকে এই সকল ব্যাখ্যার সমাহার বলা যাইতে পারে। মহাত্মা রাহুলভদ্র আচার্য্য নাগার্জ্জুনের গুরু। তিনিই বৌদ্ধতন্ত্রে মহাযানপন্থা প্রবর্ত্তিত করেন (৩)। মহাযানপন্থাই বৈদিক সাধনার দ্বার বৈদেশিকের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তুরস্ক সম্রাট্ কনিষ্ক, আর গ্রীক সম্রাট্ মিলিন্দ, এই মহাযানপন্থা অবলম্বন করিয়াই বৈদিকসাধনায় দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্র কর্ম্মযোগের পথ। ভক্তিযোগের অর্থাত্ ঈশ্বরোপাসনার অবকাশ তথায় নাই। অথচ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিয়া কোন ও ধর্ম্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলে তাহা তেমন সুদৃঢ় হইতে পারে না (৪)। অন্ততঃ অধিকাংশ লোক ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম্মের কথা কল্পনা করিতে পারেনা। মহাযান পন্থার সত্য হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকেন তাহা ও সঙ্গত নয়, অথবা মহাযান পন্থা গ্রহণ করিলেই পূজা অর্চ্চা ছাড়িয়া দিতে হইবে, তাহা ও সঙ্গত নয়। এই জন্য ভক্তিবাদের সহিত মহাযান পন্থার সংযোগের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। ইহা হইতেই তন্ত্র অথবা আগম শাস্ত্রের উত্পত্তি। অর্থাত্ আগমকে "সেশ্বর মহাযান পন্থা" বলা যায়। প্রচলিত হিন্দু তন্ত্রের ন্যায় ইহাতে ঈশ্বরোপাসনার বিধান রহিয়াছে (৫)। আবার মহাযান পন্থার ন্যায় ইহার

(১) Farquhar—An Outline of Religious Literature P. 117
(২) Farquhar—An Outline of Religious Literature P. 164
(৩) তিলক—গীতারহস্য—P. 583.
(৪) Radha Krishnan—An Idealist View of Life P. 72
(৫) Saunders—The Gospel for Asia P. 16

দ্বার বিশ্ববাসীর জন্যই উন্মুক্ত—কেবল মুষ্টিমেয় আর্য্যের জন্যই নহে। অপিচ মহাযান পন্থারই মতো ইহার আদর্শ শক্তিশালী গৃহস্থ,———ক্ষমাশীল ভিক্ষু নহে। কবে ও কাহা কর্ত্তৃক ভক্তিযোগ ও মহাযান পন্থার সমন্বয় দ্বারা, আগম শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা এখন ও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। তবে মনে হয় খৃস্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে অবধূত গোরক্ষনাথ আগম শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন। উত্পত্তি যখনই হইয়া থাকুক না কেন, আগম শাস্ত্র অথবা শক্তিতন্ত্র, গণধর গুরুগোবিন্দসিংহেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যেমন পৌরাণিক যুগের শ্রেষ্ঠপুরুষ, সেইরূপ আগমের আদর্শের পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখিতে পাই একনাথ গুরুগোবিন্দ সিংহে। পুরাণ ও আগমের, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুগোবিন্দ সিংহের, আনুকূল্য দ্বারাই আমরা বৈদিক সাধনার রহস্য সম্যক্ অবগত হইতে পারি। শিখতন্ত্রই বৈদিক সাধনার অন্তিম ও অন্তিকতম বিকাশ।

হিন্দু ও পার্শীতন্ত্রের সমন্বয় দ্বারাই শিখতন্ত্র সংগঠিত। হিন্দু-তন্ত্র ব্যক্তিগত জীবনকে চারিটী আশ্রমে ও জাতীয় জীবনকে চারিটী বর্ণে বিভক্ত করিয়া নিয়াছে। বর্ণ ও আশ্রম হিন্দুতন্ত্রের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু বিশিষ্ট লক্ষণই সব সময় শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নহে। যেমন দুই পায়ে হাঁটা মনুষ্যজাতির বিশিষ্ট লক্ষণ, কিন্তু উহাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নহে। বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ লক্ষণের পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া অনেকে বর্ণাশ্রমকেই হিন্দুতন্ত্রের সার-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন। বর্ণব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রুচিশীল পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির কর্ম্মপ্রণালীতে কতকটা সাম্যভাব আনয়নের একটা প্রয়াস মাত্র। সমাজকে চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বর্ণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। একই বর্ণের জন্য বিহিত কর্ত্তব্যের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। সেই বর্ণভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই একই প্রকার কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করে বলিয়া

তাহাদের রুচিতে ও ব্যবহারে অনেকটা সাম্যভাব আসিয়া পড়ে। শ্রেণি হয় চারিটা বটে, কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণির ভিতর ব্যক্তিগত বৈষম্য লোপ পাওয়াতে, বর্ণ-ব্যবস্থাদ্বারা মোটের উপর মনুষ্য জাতিকে একই সমাজভুক্ত করিবার সহায়তা করা হয়।

পার্শীতন্ত্রে বর্ণব্যবস্থা নাই। সমাজের লোকগুলি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হয় না——সকলেই একশ্রেণিভুক্ত হয়, একই সংঘ গড়িয়া তোলে। জেন্দভাষায় এই সংঘের নাম "মঘ"। সংঘের নেতাকে বলা হইত মঘপতি—তাহার অপভ্রংশ "মোবেদ" বা পার্শী পুরোহিত।

যাহারা চার শ্রেণিতে বিভক্ত হয় তাহাদিগ অপেক্ষা যাহারা এক শ্রেণিতে বিভক্ত, তাহাদের সংহতি অধিক প্রবল। হিন্দুর পক্ষে সংহতিবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। বিশেষতঃ পার্শীতন্ত্রের "মঘ" ও গুরুগোবিন্দের নিকট সমান আদরণীয়। এই জন্য আশ্রম ও বর্ণের সহিত তিনি সংঘকেও আনিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। চারি বর্ণের লোকই যে একই সংঘভুক্ত, একই দেহের প্রত্যঙ্গস্বরূপ, বর্ণাভিমানের প্রাবল্যে হিন্দু তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিল। হিন্দুর সংঘাত্মবুদ্ধিকে জাগরিত করাই গুরুগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ অবদান।

অপরপক্ষে বর্ণাভিমানের প্রাবল্যে লোকে যেমন সমগ্র জাতির সহিত আত্মীয়তার যোগসূত্র হারাইয়া ফেলে, সেইরূপ সংঘাভিমানের প্রাবল্য ঘটিলেও, হৃদয়ের উদারতা নষ্ট হইয়া যায়——সংঘান্তরভুক্ত লোককে পীড়ন করিতে মানুষ আর দ্বিধা করে না। খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মতন্ত্র প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করিলে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। আফ্রিকাতে বেলজিয়মের অত্যাচার ও উৎকট সংঘাভিমানের ফল; যদিও সে সংঘ রাষ্ট্রগত, শাস্ত্রগত নহে। নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কোনও দোষ

থাকিতে পারে, কিন্তু জাতিগতভাবে সংঘান্তরভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ঘৃণা করিবার অন্য কোনও হেতু নাই।

একদিকে গুরুগোবিন্দ যেমন হিন্দু-পার্শী সংঘাভিমান উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অপর দিকে সংঘাভিমানের প্রাবল্য যাহাতে সংঘান্তরকে বিদ্বেষ করিতে না শিখায়, এইজন্য সমগ্র মনুষ্যজাতির একত্বের কথা গুরুগোবিন্দ বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বরং আন্তর্জ্জাতিকতাই যে জাতীয়তার লক্ষ্য, সংঘ যে লোক সংগ্রহের সোপান স্বরূপ, আর কোন ও পয়ঘম্বরই গুরুগোবিন্দের মতো তারস্বরে এই কথা রটনা করিয়া যান নাই।

হিন্দু তুরক কোউ
রাফজী ইরান-শাহী।
মানুষকে জাতি সবৈ
একৈ পহিচানবে॥
গীতগোবিন্দ (অকালস্তুত)

হিন্দু ও মুসলমান, ইহুদি ও পার্শী, সকলেই মানুষ, সকলেই এক।

গুরুগোবিন্দের সমাজ গঠন আলোচনা করিতে হইলে আশ্রম ও বর্ণের সহিত সংঘ ও সংগ্রহ এই দুইটী সংস্কার ও আলোচনা করিতে হইবে। আর্য্যসমাজের নবকলেবর গঠনে (ক) আশ্রম (খ) বর্ণ (গ) সংঘ ও (ঘ) লোকসংগ্রহ এই চারিটী সংস্কার কোনটীকেই উপেক্ষা করা চলে না।

নূতন রকমের চরিত্র সৃষ্টিই নূতন ধর্ম্মতন্ত্র প্রচারের সার্থকতা বলিয়া অনেকে বলিয়া গিয়াছেন। একজন খৃষ্টান হইতে একজন মুসলমানের দৃষ্টিপ্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়াই পয়গম্বরের গৌরব হজরত মহম্মদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন (১)।

(১) Rodwell—Koran (Introduction by Margoliouth.)

এই যুক্তিদ্বারা বিচার করিলে, গুরুগোবিন্দকে একজন তীর্থঙ্কর, একজন অবতার না বলিবার কোনও কারণ নাই। হিন্দু ও পার্শীর সম্মিলন দ্বারা গুরুগোবিন্দ যে অভিনব চরিত্রের সৃষ্টি করিলেন তাহা হিন্দুও নহে, পার্শীও নহে, আবার হিন্দুও বটে, পার্শীও বটে। এই অভিনব চরিত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা যদি তীর্থঙ্কর না হইয়া থাকেন তবে তীর্থঙ্কর কাহাকে বলিব। বর্ত্তমান জগতে গুরুগোবিন্দই অন্তিম তীর্থঙ্কর। "Last of the Prophet" বলিয়া হজরত মহম্মদ কোরাণে যে দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, (১) গুরুগোবিন্দের আবির্ভাবের পর তাহা গুরুগোবিন্দের উপরই প্রযোজ্য।

যে অভিনব চরিত্র গুরু গোবিন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা এই সংস্থা চতুষ্টয়দ্বারা প্রভাবিত।

(ক) আশ্রম :

প্রথমতঃ শিখগণ গৃহস্থ আশ্রমের পক্ষপাতী। যতি ও ভিক্ষুগণ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া থাকে। গৃহস্থের বিনাশ হইলে যতি ও ভিক্ষুরও বিনাশ হইয়া থাকে। গৃহস্থ না থাকিলে যতি ও ভিক্ষুকে রক্ষা করিবে কে? গুরু নানকের পুত্র শ্রীচন্দ উদাসী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। শিখ সঙ্গত তাহাকে আপন বলিয়া মনে করে নাই। সন্ন্যাসী পুত্র শ্রীচন্দের পরিবর্ত্তে গৃহস্থ শিষ্য অঙ্গদকেই গুরু নানক গুরুপদের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। গুরু গোবিন্দও মুক্তকণ্ঠে গার্হস্থ্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কহা ভয়ো যো দো লোচন মুদকৈ
বৈঠি রহিও বকধ্যান লগাই ও।
নাহত ফিরিউ লিয়ে সাত সমুদ্রোঁ
লোক গইউ পরলোক গবাইউ॥

গীত গোবিন্দ (অকালস্তুত)

(১) Koran—33—40

আমি বলিয়া দিতেছি যে, যে ব্যক্তি দুই চক্ষু বুজিয়া বকধ্যানে বসিয়া থাকে, কিম্বা যে ব্যক্তি সাত সমুদ্রে অবগাহনের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার ইহলোক পরলোক দুইই যায়।

জগত পদার্থ
সকল পাবহু।
ভোগ হু আপ ভি
অপর ভোগাবহু॥

গীত গোবিন্দ (সূর্য্যপ্রকাশ)

সংসারে থাকিয়া সাধনাকে যুগাচার্য্য রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন—দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ করা। আগমোক্ত এই সাধনার পথ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে ব্রাহ্ম সমাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ গুরুগোবিন্দ বহু পূর্ব্ব হইতেই গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

(খ) বর্ণ

শিখ বর্ণে ক্ষত্রিয়। অর্থাৎ শিখের উপর কেহ অত্যাচার করিলে "ক্ষমাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ" বলিয়া শিখ তাহা বরদাস্ত করে না। এক গালে থাপর দিলে, যীশুখৃষ্টের মতো সে আর এক গাল পাতিয়া দেয় না। আততায়ির গালে দুই থাপর লাগাইয়া দেয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এমন কথা বলেন নাই যে দুর্য্যোধন রাজ্য নিয়া গিয়াছে তাহাতে কি আসে যায়। উহাকে ক্ষমা করিয়া, রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া বনে চলিয়া যাও। ক্ষমা মানসিক ধর্ম্ম। শত্রুর উপর কোনও ক্রুদ্ধ ভাব পোষণ না করার নাম ক্ষমা। কিন্তু শত্রুকে অত্যাচার করিতে দিবে কেন? বিশেষতঃ ক্ষমা শক্তিশালির ধর্ম্ম। যে অক্ষম, প্রতিশোধ নিবার ক্ষমতাই যাহার নাই ক্ষমার কথা বলিয়া সে নিজকে কেবল হাস্যাস্পদ করে। শত্রুকে উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ উন্মত্ত ব্যক্তি কোনও আঘাত করিলে, যেমন তাহাকে প্রতি-প্রহারে জর্জ্জরিত করিবার কোনও সার্থকতা নাই সেইরূপ শত্রুর উপর কোনও প্রতিহিংসার ভাব পোষণ করিতে নাই।

কিন্তু উন্মত্ত ব্যক্তির হাতে তরবারি দেখিলে যেমন তাহা কাড়িয়া নিতে হয়, হাত পায়ে বেড়ি দিয়া তাহার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা লোপ করিয়া দিতে হয়, শত্রুর সহিত ও সেইরূপ আচরণ করিবে। তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিবে না যে সে মনে করে যে পরের উপর অত্যাচার করিবার জন্মগত অধিকার তাহার আছে। পাখিটী উড়িতে পারেনা দেখিলে বালকও উহাকে ধরিতে যায়। আত্মরক্ষায় অক্ষম দেখিলে সকলেরই অত্যাচারের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয়। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন The coward makes the bully. তাই গুরুগোবিন্দ বলিয়া দিয়াছেন,

যে কোই মারে ইটে ঢিম,
পাথর হানে রসায়।

গীতগোবিন্দ (রহেতনামা)

যে ঢিল ছুড়িবে তাহাকে পাথর মারিবে।

(গ) সংঘ

সংঘই শিখতন্ত্রের বিশেষত্ব। শিখ অর্থই সংঘবদ্ধ হিন্দু ও পার্শী। কথা আছে "সংঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে।" তাই শিখ এত শক্তিশালী। শিখের বিক্রমে মোগল সাম্রাজ্য উড়িয়া গিয়াছিল, পাঠান ঘরের বাহির হইতে পারে নাই, চিনিয়ালবালার সঙ্কট ইংরেজের এখন ও মনে আছে। সমাজের শক্তি গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পরস্পরকে বিনষ্ট করে। তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া, একই পথে চালিত করার নাম সংহতি। একই কেন্দ্রিয় শক্তির আদেশ প্রতিপালন করিবার যে শিক্ষা, তাহার নাম সংঘবন্ধন। আর কোন ও ধর্ম্মরাজই সংঘবন্ধনকে এত দৃঢ় করিতে পারেন নাই। শিখ শিখের জন্য প্রাণ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

শিখ শিখ পৈ
বাড়ত প্রাণ ॥

পন্থপ্রকাশ

তাই সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও শিখের বদ্ধমুষ্টি দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের হৃদয়ে ও ত্রাসের সঞ্চার করে।

গুরুগোবিন্দ বলিয়া গিয়াছেন

সংঘ মেরো রূপ হৈ খাস।
সংঘমে হুঁ করুঁ নিবাস॥

গীতগোবিন্দ (সূর্য্যপ্রকাশ)

তাই শিখ সংঘতেই গুরুর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

গুরু সংঘ সংঘ গুরু।
আবতে হুয়ী ঐসী বিধি সুরু॥

গীতগোবিন্দ (সূর্য্যপ্রকাশ)

সংঘের সেবা ছাড়া শিখের পক্ষে আর কোন ও উচ্চতর কর্ত্তব্য নাই।

চারি বর্ণে বিভক্ত হওয়াতে হিন্দু সংঘের সমগ্র রূপ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ কমই পায়। পার্শীসমাজে সংঘ সেবা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সংঘাত্মভাব তাদৃশ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। সংঘকে সে উপায় বলিয়াই মনে করে, কখন ও উপেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই পার্শী ভক্ত যৌথ উপাসনা জানেনা, গুরুদ্বার নির্ম্মাণ করিতে সে পারে নাই। পরস্পরের মিলনের আকাঙ্খা তাহার এত প্রবল নহে, যে তজ্জন্য গুরুদ্বারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবে। হিন্দু পার্শীর এই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্যই গুরুগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর রুদ্রের প্রসাদে তাহাতে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। সংঘের উন্নতির জন্য শিখ যে কত সহজে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহা না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই।

কে কার আগে প্রাণ
করিবেক দান
লেগে গেল কাড়াকাড়ি॥

(ঘ) লোক-সংগ্রহ।

শিখের ন্যায় সংঘ প্রেমিক জাতি জগতে আর একটীও নাই। কিন্তু সংঘপ্রেম শিখের হৃদয়কে সংকীর্ণ করিয়া দেয় নাই——সকল বিশ্ববাসীর জন্যই তাহার হৃদয়ের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। অশিখকে শিখ করিয়া লইবার জন্য সে সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া আছে বটে, কিন্তু অশিখকে লোপ করিয়া দিবার প্রবৃত্তি তাহার নাই। বরঞ্চ তাহার সরল সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন, সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের যোগ্যতা তাহাকে দিয়াছে। যিনি সন্ন্যাসী তিনি সবই ত্যাগ করেন—আপনাকেও পর করেন। আর যিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না, পরকেও আপন করিয়া ল'ন। "উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" শিখের পক্ষে কেহই পর নয়—সকলেই আপন। প্রত্যহ সে নূতন নূতন লোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে করিতে জীবন যাত্রায় অগ্রসর হয়, আর বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতে চায়। বিশ্বের কেহই তাহার পর নহে। সকলেই তাহার আপন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় অমিত্রকে সে মিত্রে পরিণত করিতে জানে। সকলেই এক বিশ্বেশ্বরের সৃষ্ট, এক বিশ্বেশ্বরের সন্তান—কাহাকে সে পর মনে করিবে?

অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দু ও পার্শীগণ মুসলমানকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত। গুরু গোবিন্দ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমের সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। অত্যাচারীকে শক্তিহীন করিবার সফল চেষ্টা তিনিই করিয়াছিলেন।

তুর্ক শত্রু হাম মারণ করণে।
পাকড়ো খণ্ডা তিনকো হরণে॥

গীতগোবিন্দ (নয়নাস্তোত্র)।

কিন্তু ধর্ম্ম জগতে ইসলামের দান, বিশ্বমানবের ইতিহাসে সভ্যতার এই বিশিষ্ট ধারাকে, গুরুগোবিন্দ সাদরে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। দ্বন্দ্বের অন্তরালে যে ঐক্য বিদ্যমান, উপাসনা প্রণালীর পার্থক্য

সত্ত্বেও সকলেই যে একই পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, এই মহান্ সত্য শুনাইয়া দিয়া গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও পার্শীকে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আল্লা ও অভেখ সোই।
পুরাণ ও কোরাণ ওই।
এক হি স্বরূপ সব ঐ।
এক হি বনাব হৈ॥

গীতগোবিন্দ (অকালস্তুত)।

গুরু নানকই হিন্দু মুসলমানদের ঐক্যের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যেন ছিল ভিক্ষুকের ক্রন্দন। ঐক্যের কথা অবতারণা করিয়া দুর্ব্বল হিন্দুর পক্ষে প্রবল মুসলমানের করুণা ভিক্ষা মাত্র। দুর্ব্বল কখ ও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না—"ধূমো বায়োরিব বশে বলং ধর্ম্মানুবর্ত্ততে"—ধর্ম্ম বলেরই অনুসরণ করে। তাই গুরু নানকের করুণ ক্রন্দন মুসলমানকে অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত করে নাই। গুরুগোবিন্দ উল্টা গঙ্গা বহাইয়াছিলেন। তিনি দর্পভরে বলিয়াছিলেন—

চিড়িয়া কোঁলো বাজ তড়াউঁ।
তবৈ গোবিন্দ সিংহ নাম কহাউঁ॥

গীতগোবিন্দ (রহেত নামা)

আমি চটক দ্বারা বাজকে তাড়াইব, তবেই গোবিন্দ সিংহ নাম সার্থক হইবে।

তাহার এই দর্প তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষার গুণে বহুকাল সঞ্চিত জাড্য ও দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু আবার সদর্পে দণ্ডায়মান—পিতৃ সিংহাসন লাভ করিবার জন্য সম্রাট্ বাহাদুর শাহ গুরু গোবিন্দের আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছেন (১)। মোগল

(১) Cunningham—History of the Sikhs—P. 118.

সাম্রাজ্য যিনি ধ্বংসোন্মুখ করিয়াছিলেন সেই বান্দা বাহাদুর (১) কিম্বা ভারতবর্ষের যিনি শেষ স্বাধীন সম্রাট্ সেই রণজিৎসিংহে (২) যে বীরত্বের লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, শিখ সংঘে এখনই তাহার পূর্ব্বাভাষে সমুজ্জ্বল। সেই বীর্য্যের উপলব্ধিতেই গুরুগোবিন্দ ঔরংজেবকে লিখিয়াছিলেন, "সর্প শিশুপুত্রগণকে নিহত করিয়াই কি তুমি মনে করিয়াছ ত্রাণ পাইবে। কাল ভুজঙ্গ এখনও জীবিত।"

চিহা শূদ, কি চূঁ বাচ্চাগান কুস্তি চার।
কি বাকী বা মন্দা আস্ত্, পেচিদা মার॥

গীতগোবিন্দ (জাফরনামা)

তাই গুরু গোবিন্দ ঐক্যের জন্য আহ্বান মুসলমানকে করেন নাই। ঐক্যের কথা অবতারণ করিয়া গুরু গোবিন্দ মুসলমানের করুণা ভিক্ষা করেন নাই। বরং ঐক্যের কথা উল্লেখ করিয়া, মুসলমানের কৃষ্টিতে যাহা সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করিতে হিন্দু-পার্শীকে উপদেশ দিয়াছেন। এইজন্য গুরু গোবিন্দের আহ্বান অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিল। মোগল সেনাপতি সৈয়দ খাঁ গুরু গোবিন্দকে বিধ্বস্ত করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রণাঙ্গনে গুরু গোবিন্দের নীল-লোহিত সৌম্য-রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (৩)।

যুদ্ধ করিতে যে আসিয়াছিল গুরু গোবিন্দ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেই অগ্রসর হইলেন, জীবের প্রতি অনুকম্পার (Sympathy) মহিমা শুনাইয়া তাহার করুণা ভিক্ষা করিলেন না। বীরের হৃদয়ে বীরত্বের স্পন্দন সাড়া দিল, সৈয়দ খাঁ গুরু গোবিন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন (৪)। তাঁহাকে আত্ম সমর্পন করিলেন।

(১) Nirang—Transformation of Sikhism—Chap 12.
(২) রজনীকান্ত গুপ্ত—আর্য্যকীর্ত্তি P, 82.
(৩) Sher Sing— Sri Guru Govinda Singhji—P 110.
(৪) কুহন সিং—গুরুমত সুধাকর—P 612.

অপর পক্ষে গুরু গোবিন্দ আপনার শিখ দিগকে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আপনেতে নির্ব্বলকো জান।

তিসপর কোপ ন করহু সুজান॥

গীতগোবিন্দ (রহেত নামা)

এই আত্ম মর্য্যাদা জ্ঞান, পরের অনুগ্রহ প্রার্থনার সন্দেহের অবকাশও যথায় আছে তাহাতে জুগুপ্সা, গুরুগোবিন্দের চরিত্র অতুল মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে বীরত্বের বীজ বিন্দু মাত্রও রহিয়াছে, তিনি গুরু গোবিন্দের চরিত্রে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না।

নানক দেবের সহিত গুরু গোবিন্দের বৃত্তির এই যে পার্থক্য, "শত্রুর মুদ্রায়ই শত্রুর ঋণ পরিশোধের" (১) ব্যবস্থার প্রতিই গুরু গোবিন্দের এই যে পছন্দ, বক্ষ্যমাণ ঘটনায় তাহা সুচারুরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

নীল বর্ণ ও সবুজ বর্ণের পোষাক মুসলমান গণের প্রিয়। কথিত আছে নানক দেবও নীল বর্ণের পোযাক পরিতেন।একটী শিখ কবিতায় তাহাকে নীলাম্বর বলরামের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে (২)। তাহার অনুকরণে অনেক শিখও নীলবর্ণের পোষাক পরিত। নীলবর্ণ পোষাক ধারনের একটি কারণ ইহাও ছিল যে লোকে যেন শিখকে মোগল পাঠান অপেক্ষা হীনবীর্য্য মনে না করে। আদি গ্রন্থের একটি দোহরার একটি দল এইরূপ—

নীলবর্ণ কাপড় পহনে
তুরুক পাঠানি আমল কিয়া

নীলবর্ণের পোষাক পরিয়া, মোগল পাঠানের প্রভাব আমরাও আয়ত্ত করিলাম।

(১) Macnicol—Indian Theism P. 136
(২) Cunningham —History of the Sikhs —P460.

প্রারম্ভে গুরুগোবিন্দও নীল বর্ণের পোষাক পরিতেন। কিন্তু মোগল পাঠানের অনুকরণ বলিয়া নীলবর্ণের পোষাক গোবিন্দ সিংহের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানে আঘাত করিতে লাগিল। ঔরংজীবকে পত্র লিখিবার পর তাহার নীলবর্ণের পোষাক খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি এক এক খণ্ড ধরিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—

নীলবর্ণ কাপড় ফঁড়ে
তুরুক পাঠানি আমল গিয়া: (১)

মোগল পাঠানী আমল শেষ হইয়াছে নীলবর্ণ পোষাকের আর প্রয়োজন নাই—তাহা ফাঁড়িয়া ফেলিলাম।

দোহরার দুইটী মাত্র শব্দ তিনি পরিবর্ত্তিত করিলেন। 'পহ্নে' স্থলে 'ফঁড়ে' আর 'কিয়া' স্থলে 'গিয়া।' পরিবর্ত্তিত শব্দ দুইটীর উচ্চারণগত বৈষম্য বিশেষ প্রবল নহে। কিন্তু মুস্লিম কৃষ্টির প্রতি হিন্দুর দৃষ্টি-কোণের কিরূপ গভীর পার্থক্য! একটী মুসলমানের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার অনুকরণ করিতে চায়. অপরটী অনুচি-কীর্ষার গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিয়া উহাকে পুড়িয়া ছাই করিতে চায়! আর্য্য কৃষ্টির গৌরব গুরু গোবিন্দকে আকুল করিয়াছিল। নানক দেবের সহিত তাহার এই পার্থক্য ইউরোপীয় সমালোচকের চক্ষু এড়ায় নাই।

গুরুগোবিন্দের অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব যাহারা বুঝিতে পারে নাই, নানক দেবের দৃষ্টি ভূমির এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন, তাহাদের কাহারও কাহারও মনঃপূত হয় নাই। কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছিলেন, আদি গ্রন্থের বাণীর, আদি গ্রন্থের ঐতিহ্যের, এরূপ পরিবর্ত্তন করা, গুরুগোবিন্দের পক্ষে কি সঙ্গত হইবে? তাহাদিগকে উপরোধ

---

(১) (i) তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরু গোবিন্দ সিংহ—P. 317
(ii) Macantiffe—The Sikh Religion Vol V—P. 209

করিয়া গুরুগোবিন্দ বলিলেন, প্রাণ প্রতিম চার পুত্রের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও কি আমি এই অধিকারটুকু লাভ করি নাই? (১) চারি পুত্র যে ব্যক্তি বলি দিতে পারিয়াছে, তাহার আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করিবার কি কোনও হেতু আছে? তাঁহার আন্তরিকতায় বিশ্বাস থাকিলে এ পরিবর্ত্তনও তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইবে না। তাহারা নির্ব্বাক্ হইলেন।

কথিত আছে গুরুগোবিন্দ পোষাকের সকল খণ্ডগুলি দগ্ধ করেন নাই। একখণ্ড অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতে দুর্দ্ধর্ষ নিহং শাখার উৎপত্তি। তাহারা নীল বর্ণের পোষাকই পরে। (২)

মুস্লিম কৃষ্টিকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে, গুরুগোবিন্দের তাহা অভিপ্রায় ছিল না। তাহার যে অংশ রক্ষণীয়, যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। গুরুগোবিন্দ কর্ত্তৃক শেষ বস্ত্রখণ্ড রক্ষার ইহাই আশয়।

ফলকথা তত্‌কালে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছিল যে ইসলাম জয়ের, আর বেদান্ত পরাজয়ের হেতু। এই জন্য দলে দলে হিন্দু-পার্শী ইসলাম তন্ত্র গ্রহণ করিতেছিল। এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা একান্ত আবশ্যক, এই জন্য গুরুগোবিন্দ বলিতেন, পাঠানরা ও তো মুসলমানই, তবে তাহারা মোগলের নিকট হারিয়া গেল কেন? যে যোগ্যতা অর্জ্জন করে সেই জয়লাভ করে।

মেহন্নত করহি মজুরি পাওহি।

সূর্য্যপ্রকাশ

বেদান্তের আশ্রয় ত্যাগ না করিয়াও কিরূপে যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায়, গুরুগোবিন্দ তাহা দেখাইয়া দিলেন। ইহা আত্মবিকাশ—পর পীড়ন নহে।

(১) তিন কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরুগোবিন্দ সিংহ P. 318.
(২) Kartar Singh—Guru Govinda Singh—P. 209.

গুরু গোবিন্দ ম্লেচ্ছ বলিয়া মুসলমানকে ঘৃণা করেন নাই। যিনি বিশ্বরূপ, যিনি অনন্তরূপে, অনন্ত ভাবে, আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, আরব সভ্যতার বিশিষ্ট ধারাও তাহার অন্যতম প্রকাশ। এই জন্য কোরাণ ও মস্‌জিদকে সম্মান করিবার উপদেশ গুরু গোবিন্দ দিয়া গিয়াছেন। বিশ্বামিত্র গুরু গোবিন্দের বিশ্বপ্রেমের অমর সঙ্গীত, ইরাণ ও ভারতের পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইয়া অনার্য্যের প্রতি আর্য্যের অবজ্ঞার ভাব দূর করিতে থাকুক।

দেহরা মজিদ সোই--পূজা ও নিমাজ উ-ই
মানুষ সবৈ এক পৈ, অনেক কো প্রভাব হৈ।
দেবতা অদেব যখ, গন্ধর্ব্ব তুরুক হিন্দ
নিয়ারে নিয়ারে দেখনকে, বেশকে স্বভাব হৈ।
একই নয়ন একই কাণ, একই দেহ একই বাণ
থাক বাত আতস ও, আবকে রলাও হৈ।
আল্লা ও অভেখ সোই, পুরাণ ও কুরাণ উই
এক হি স্বরূপ সবই, এক হি বনাব হৈ॥

গীত গোবিন্দ (অকালস্তুত)

এই ধর্ম্মতন্ত্র প্রচারের জন্য গুরুগোবিন্দ যে সংঘ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পাঁচটী বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। তাহারা এই—

ক। অনাড়ম্বরত্ব (Simplicity)

খ। গাণপত্য (Democracy)

গ। সংগঠন (Consolidation)

ঘ। শুদ্ধি (Propagation)

ঙ। রাষ্ট্রিকতা (Politics)

(ক) অনাড়ম্বরত্ব

স্মৃতির বিধান-বাহুল্যের নাগপাশ গুরুগোবিন্দ কাটিয়া দিয়াছিলেন। রবিবার বারবেলা কতক্ষণ থাকিবে, চতুর্থীতে বেগুণ খাইতে

পারা যায় কিনা, ধোপা সঙ্গে থাকিলে যাত্রার ফল শুভ হইতে পারে কিনা, এই সব উদ্ভট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া হিন্দু জড়বৎ স্থাণু হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বলিয়াছেন "অচলায়তন"। কুক্কুটের ডিম্ব যদি শরীর পুষ্টির জন্য আবশ্যক নির্দ্দোষ খাদ্য বলিয়া বুঝিতেও পারে, (১) তথাপি হিন্দু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ স্মৃতিতে ইহার বিধান আছে কিনা জানা নাই। কুশলতাই ছিল গুরুগোবিন্দের একমাত্র নিকষ· "যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম।" সঞ্চরণের সুবিধার জন্য তিনি চিরদিনের ধুতি ছাড়াইয়া দিয়া, সমগ্র জাতিকে একদিনে কচ্ছ (Half-pant পরাইয়া দিয়াছিলেন। "যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"— বিচার বিহীন আচার দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, ধর্ম্ম লোপ হয়। তাই গুরুগোবিন্দ বলিয়াছেন—

যে যে স্মৃতিযোঁকে ভয়ে অনুরাগী
তিন তিন ক্রিয়া ব্রহ্মকো ত্যাগী।

গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

স্মৃতির বিধান পালন করিতে গিয়া হিন্দুরা ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘণ করিতেছে।

স্মৃতির বিধানের সহস্র বন্ধনে হিন্দু ও পার্শীর প্রাণশক্তি আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের সহজ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিবার ভরসা তাহার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রতি পদ বিক্ষেপেই তাহাকে চিন্তা করিতে হইত "শাস্ত্র কী বলে?"। সে শাস্ত্রেরও আর অন্ত নাই। "মন্বত্রি বিষ্ণু-হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরা" প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক একটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। "নাসৌ মুণির্ যস্য মতং ন ভিন্নম্"— যিনি ভিন্ন কথা বলেন না তিনি মুনিই নন। যথাযোগ্য প্রণালীতে কাজটী অনুষ্ঠিত হউক, ইহা বাঞ্ছনীয় বটে,—কিন্তু পাছে ভুল-ভ্রান্তি

(১) স্বাস্থ্য—আষাঢ়-১৩৪২—পৃঃ ১৫৭

হয় এই ভয়ে কাজে হাত না দিয়া বসিয়া থাকার মত বোকামি আর কিছুই নাই।

"কৃতম্ এবা অকৃতাচ্ শ্রেয়ঃ
ন পাপী য়োঃ অ্স্ত্যঅকর্ম্মণঃ।"

শান্তি পর্ব্ব—৭৫—১০

কিছুই না করার চেয়ে যা কিছু করাই ভাল। নিষ্কর্ম্মার চেয়ে অধম আর কেহই নয়। শাস্ত্রবিধানের চাপে পড়িয়া হিন্দু ও পার্শী জড়বৎ নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুগোবিন্দ তাহাদিগকে গতিশক্তি দিলেন। জগন্নাথের রথ আবার চলিতে আরম্ভ করিল। স্মৃতির শাসনের নিপীড়নের ফলে "খেতে শুতে যেতে, প্রদীপটী জ্বলিতে, কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন" অবস্থায় জন-সাধারণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল, দলে দলে লোক গিয়া ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। বিবেকানন্দের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'তাহা কেবল আত্মপক্ষের ক্ষয় নহে, পরপক্ষের বৃদ্ধিও বটে' (which does not mean a man the less, but an enemy the more)। ১)

একনাথ গোবিন্দ সিংহ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিলেন। স্মৃতির নিপীড়ণ হইতে লোকে রক্ষা পাইল, অথচ বৈদিক তন্ত্র তাহাদিগকে ছাড়িতে হইল না।

মহম্মদ ফানি নামক একজন মুসলমান গ্রন্থকার খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে দবিস্তান নামক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনি তত্কালীন প্রচলিত ধর্ম্মমত গুলির সমালোচনা করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের উপর শিখ পন্থা প্রচারের ফল উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়া-ছেন—প্রতাপ মল্ল নামক এক ব্যক্তির পুত্র ইসলাম পন্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পিতা পুত্রকে বলিলেন, ইসলাম গ্রহণের

(১) Hindu Review—April 1935. Page 101.

আর কী প্রয়োজন আছে? আচার ব্যবহারের যে স্বচ্ছন্দতা ইসলাম দিয়া থাকে শিখ পন্থায়ও তাহা সবই পাওয়া যায়। অতএব অনর্থক পৈতৃক পন্থা বৈদিকতন্ত্র কেন পরিত্যাগ করিবে? (১) প্রতাপ মল্লের উপদেশ তাহার পুত্র গ্রহণ করিয়াছিল। অন্যান্য পিতারাও যদি পুত্রদিগকে প্রতাপ মল্লের মতন উপদেশ দিতে পারেন, তবে তাহারাও বৈদিক সংঘের আশ্রয় ত্যাগ করিবে না।

হিন্দু সমাজের অনুন্নত শ্রেণী বলিতে যাহাদিগকে বুঝা যায়, আজকাল প্রায়ই শুনা যায়, কতকগুলি অধিকারের দাবী করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন, যে সেই অধিকারগুলি না পাইলে তাঁহারা একযোগে খৃষ্টান বা মুসলমান হইয়া যাইবেন। শিখ-সঙ্গত সম্বন্ধে কোনও খবর রাখেন না বলিয়াই, মুসলমান বা খৃষ্টান হইবার কথা তাঁহাদের মনে আসে। মাদ্রাসের ত্রিচীনপল্লী জেলার কুলি তালাই তালুকের প... শ্রেনির এইরূপ দাবী সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন (২)—

"Men who threaten to leave their Religion, becaus[e] some other men pretending to be of the same faith a[s] they, prevent them from entering temples, have littl[e] Religion about them." অর্থাৎ মন্দির প্রবেশে বাধা পাইলেই যাহাদের ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহণের কথা মনে পড়ে, স্বীয় ধর্ম্ম তন্ত্রের প্রতি অনুরাগ তাহাদের কমই আছে। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু স্বীয় ধর্ম্ম তন্ত্রের প্রতি অনুরাগও তাহাদের কম নহে। কম নহে বলিয়াই যুগযুগান্তর ধরিয়া লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হইয়াও তাহারা হিন্দু সমাজের ক্রোড় পরিত্যাগ করে নাই, এখনও তাহারা প্রতিকারই চাহে। হিন্দু-তন্ত্র পরিত্যাগ করিতে চাহে না। ইহাদিগকে শিখ-তন্ত্রের আশ্বাস শুনাইবার জন্য কি কেহই নাই? শিখ-সঙ্গতে যোগদান করিতে

(১) Macauliffe—Sikh Religion Vol. IV. —P. 219
(Sacred Books of the East Series)

(২) Amrita Bazar Patrika—30-3-35.

ইহারা মনুষ্যত্বের সকল অধিকারই পাইতে পারে অথচ বেদ-বেদান্ত-গীতার প্রতি শ্রদ্ধাও ইহাদিগকে হারাইতে হয় না। শিখ তন্ত্র প্রচারের শান্তিময় ফল দ্বিগুণিত। তদ্দারা অনুন্নত শ্রেণীগণ বৈদিক চক্রে অবস্থিত থাকিতে পারিয়া আত্মার তৃপ্তি পাইবে। অপর দিকে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতিও ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে।

শিখ-সংঘের বার্ত্তা বহণ করিয়া প্রচারক যদি গ্রামে গ্রামে শিখ সমাজ ও গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করেন, তবে দলে দলে লোক আসিয়া তাহাতে যোগ দিতে থাকিবে। দেশ হইতে আর্য্যকৃষ্টি বিলোপের আশঙ্কা দূর হইবে।

আজকাল স্বামী সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমিশন শুদ্ধির প্রচেষ্টা দ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাদৃশ সফলতার প্রয়োজন, ইহা তাদৃশ সফলতা লাভ করিতেছে না। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া পূজ্যপাদ স্বামিজী লিখিয়াছিলেন, সংগঠন ব্যতীত শুদ্ধিতে সাফল্য লাভ সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মান্তর হইতে গৃহীত হিন্দুগণ সমাজে অচল থাকে—তাহাদের মেয়ে কেহ নেয় না, ছেলের জন্য পাত্রী পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তন ঘটাইতে না পারিলে শুদ্ধি ক্রিয়া কখনও সাফল্য লাভ করিবে না। (১)

বর্ণ ভেদের আঁটা আটি যেখানে প্রবল, তথায় ধর্ম্ম তন্ত্রান্তর হইতে লোকগ্রহণের রীতি একরূপ থাকিতে পারে না বলিলেই চলে। কোনও বর্ণের লোকই ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তিকে নিজ শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইতে চায় না—সকলেই মনে করে এ বিপদ অন্যের ঘাড়ে চাপুক।

অবশ্য যে ব্যক্তি গোড়ায় হিন্দুই ছিল, মাঝখানে মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল, পুনরায় হিন্দু হইলে তাহাকে তাহার মৌলিক বর্ণই দেওয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলনা, তাহাকে কোন্ বর্ণ দেওয়া হইবে, এই সমস্যার সমাধান হয় নাই বলিয়াই

(১) বিনয় কৃষ্ণ সেন - হিন্দুসংগঠন ১২৭

হিন্দু সমাজে শুদ্ধি প্রথা আশানুরূপ চলে নাই। যাহা চলিয়াছে তাহা পুনঃ হিন্দুকরণ ও তাহার অঙ্গ স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। মুসলমান যেমন মৌলিক হিন্দুকে মুসলমান করিয়া লয়, হিন্দু তেমন মৌলিক মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইয়া সমাজে চালাইতে পারে নাই।

অবশ্য অনেক অনার্যাও হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। যেমন মনিপুরী বৈষ্ণবগণ, কিম্বা কালীপূজক সাঁওতাল গণ (১)। কিন্তু তাহারা যখন হিন্দু সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়াছে, একটা শ্রেণিকে-শ্রেণি-শুদ্ধ সমস্ত লোকই আসিয়া জুটিয়াছে। তাহাদের বিবাহ প্রভৃতি সমাজিক সংস্কার নিজেদের মধ্যেই চলিয়াছে। তাহারা হিন্দু সমাজের অন্য কোনও শ্রেণির সহিত মিশিতে যায় নাই। এমন কি অনেক সময় তাহাদের ধোপা নাপিত পুরোহিত পর্য্যন্ত পৃথক্ রহিয়াছে। এইরূপ করিয়া হিন্দু সমাজে চারিবর্ণ স্থলে ছত্রিশবর্ণ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা সকলেই নিজকে হিন্দু বলে বটে, কিন্তু পরস্পর সামাজিক সংশ্রব একরূপ না থাকিবারই মতো। ফলকথা একটা শ্রেণিকে শুদ্ধি করিবার প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে বটে, একটি ব্যক্তিকে শুদ্ধি করিবার প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত নাই। পার্শী সমাজে ব্যক্তিকে শুদ্ধি করা দূরে থাকুক, একটা শ্রেণিকে শুদ্ধি করিবার প্রথাও প্রচলিত নাই। হিন্দু পার্শী সমাজ ব্যয় জানে—আয় জানে না, হিন্দু পার্শী সমাজ ক্ষয় রোগ গ্রস্ত।

এই ক্ষয় রোগের সফল চিকিৎসা যিনি করিয়াছিলেন তাহার পবিত্র নাম গণনাথ গুরু গোবিন্দ সিংহ।

একটা শ্রেণিশুদ্ধ লোক শুদ্ধি করিয়া লওয়া বহুকাল সাপেক্ষ। লোক লোচনের অন্তরালে ধীরে ধীরে তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে। কাহারও ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা এ বিষয়ে সাফল্যলাভ অনিশ্চিত। প্রতিপক্ষের

(১) Vaidya—Epic India—P 80.

সচেষ্ট বাধাদ্বারা তাহা একেবার রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। অপর পক্ষে যাহারা শ্রেণিশুদ্ধ সকলকে শুদ্ধি করিবার জন্য বসিয়া থাকেন না, যেমনেই হউক ঐ শ্রেণির কয়েকজন লোককে শুদ্ধি করিয়া লন, শুদ্ধীকৃত ঐ কয়েকজন লোকের দ্বারা আবার শ্রেণিস্থ বাকী লোকদিগকে শুদ্ধি করিবার সুবিধা তাঁহাদের হইতে থাকে। বিশেষতঃ ধর্ম্মান্তরিতদের নব ধর্ম্মতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ অতি প্রবল থাকে—নূতন ধর্ম্ম সংঘকে সেবা করিবার আকাঙ্খা অতি তীব্র থাকে। এইরূপ ব্যক্তিগত শুদ্ধি দ্বারাই ইসলাম তন্ত্র চক্ষের উপর চীন দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

ব্যক্তিগত শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজেও ব্যক্তিগত শুদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া হইতেছে তীব্রতর। প্রথমতঃ ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তি অর্দ্ধ-হিন্দু হয়, পূর্ণ-হিন্দু হইতে পারে না। কারণ তাহাকে সামান্য ভাবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না সে হিন্দুসমাজের কোনও বিশিষ্ট বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, সে পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে তাহার স্থিতি অনিশ্চিত। অনিশ্চিত কেন, হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ তাহার পক্ষে নিশ্চিত বলিয়া বলা যাইতে পারে। শুদ্ধি বিষয়ে ইহা প্রবল বাধা। তাহা হইলেও এই বাধা অভাবাত্মক। ইহা ছাড়া ভাবাত্মক বাধাও আছে। হিন্দু সমাজে এমন অনেক লোক আছেন যাহারা শুদ্ধির প্রবল বিরোধী। শুদ্ধীকৃত লোককে তো তাহারা সমাজে কোনও স্থান দিতে প্রস্তুত ননই, যাহারা শুদ্ধির সহায়তা করে তাহাদিগকেও ইহারা স্বধর্ম্ম বিরোধী বলিয়া ঘৃণা করেন। অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকও এই দলভুক্ত। মুন্সীগঞ্জে স্বামী সত্যানন্দের কালী মন্দির প্রবেশের বাধা ইহারাই জন্মাইয়াছিলেন। আবার বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সংঘও ইহারাই স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে হিন্দু সমাজ হইতে এই মতাবলম্বী লোক কখনও একেবারে লুপ্ত হইবে না।

ইহার প্রধান কারণ এই যে বর্ণাশ্রম বিভাগের উপরই হিন্দুর সমাজ গঠিত। হিন্দুর আজন্ম শিক্ষাদীক্ষা বর্ণাশ্রমের পার্থক্য রক্ষায়ই তাহাকে প্রবৃত্ত করায়। এই জন্য শুদ্ধির প্রচেষ্টা দ্বারা হিন্দু সমাজে চিরস্থায়ী আত্মকলহের উৎপত্তি হইয়াছে। শুদ্ধিতে আগ্রহ দ্বারা তাহার বলবৃদ্ধি না ঘটিয়া বলহানি ঘটিতেছে। বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজের বিচ্ছেদ আরও বাড়িতেছে।

এ অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় এর নাথ গুরুগোবিন্দের আশীর্ব্বাদ। যাহারা সামান্য ভাবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, বিশিষ্ট ভাবে কোনও বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয় না তাহাদের জন্য স্থান রহিয়াছে শিখ-সঙ্গত। শিখ-সঙ্গতই বর্ণহীন পঞ্চমবর্ণ—কোনও বর্ণেই যাহার স্থান নাই সেই শিখ। "যেষামান্যা গতির্ নাস্তি তেষাং গতির্ বারাণসী।" অতএব ব্যক্তিগত শুদ্ধিকে সঞ্জীবিত রাখিতে শিখ সঙ্গতের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ শিখ সমাজকে হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক্ রাখিবার উপদেশ দিয়া গুরুগোবিন্দ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, আত্মকলহ হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছেন। মুসলমান ও খৃষ্টানকে শুদ্ধি রূপ অনাচারের অনুষ্ঠান শিখ সমাজ যত বেশীই করুক না কেন, তাহাতে হিন্দুর বলিবার কিছুই নাই। কারণ হিন্দু স্মৃতির বিধান শিখ মানে না, গোড়াতেই সে কথা সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে সে নিজকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় না, হিন্দুর সহিত মিশিয়া যাইতে চায় না।

অতএব তাহাদ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম বিগড়াইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। এই জন্য একজন শুদ্ধীকৃত নব হিন্দুকে দেখিলেই বর্ণাশ্রমীর যেরূপ মনে হয় যে হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল, একজন শুদ্ধীকৃত শিখকে দেখিলে তাহার সেরূপ মনোবিকার উপস্থিত হয় না।

শুদ্ধির চেষ্টা দ্বারা হিন্দু সমাজে যে আত্মকলহের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবি, শিখ-সঙ্গতের পৃথক্ অবস্থিতিতে সে আত্মকলহের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

অপর পক্ষে যে গুরু গোবিন্দ সিংহ বলিয়াছেন,

দানো মারে রোহলে, দেব বাচায়ে তোয়।
সিংহ তোমারো রণ গজে, হাঁক না ঝালস কোয়॥

গীতগোবিন্দ (নয়নাস্তোত্র)

তুমি দানব মারিয়া শেষ কর, দেবকে বাঁচাও, তোমার সিংহ যখন রণে গর্জ্জন করে, কেহই সে আস্ফালন সহ্য করিতে পারে না।

যিনি বলিয়াছেন,

ধন্য জীবন তিহকো জগমৈ।
মুখতে হরি, চিতমে যুধ বিচারৈ॥

গীতগোবিন্দ (কৃষ্ণাবতার)

জগতে তাহাদের জীবন ধন্য, যাহারা মুখে হরির নাম নেয় ও অন্তরে যুদ্ধের চিন্তা করে।

তাহাকে অবৈদিক বলা চলে না। যে শিখের পক্ষে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান অমৃতসরের "হরিমন্দির", তাহাকে কাহারও হিন্দু বলিবার আপত্তি হইলে হিন্দু না বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে হিন্দুর শত্রু বলা চলে না—হিন্দুর বন্ধুই বলিতে হয়।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য্য সমাজ ও তো একপ্রকার বর্ণহীন পঞ্চম বর্ণ। উহারা থাকিতে আবার শিখ সঙ্গতের প্রয়োজন কী? (আর্য্যসমাজে বর্ণভেদ আছে—যদিও তাহাকে নাম মাত্র ভেদ বলা যাইতে পারে) এ কথার প্রত্যুত্তর আর্য্যসমাজের বা ব্রাহ্মসমাজেরই দেওয়া উচিত, শিখ-সঙ্গতের নহে। কারণ আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ থাকা সত্ত্বেও শিখ-সঙ্গত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শিখ-সঙ্গত থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্ম সমাজ কিম্বা আর্য্যসমাজ যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কেন তাহা করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন।

পরন্তু ব্রাহ্মসমাজ বা আর্য্যসমাজ দ্বারা শিখ-সঙ্গতের কাজ চলিতে পারে না।

শৌর্য্য বীর্য্যের কথা আর নাই বলিলাম। কারণ যশস্কামী রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বর্ব্বরতার চিহ্ন বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য আত্মপ্রসাদ পরিবেশন করিয়াছেন (১)। কিন্তু একটী মাত্র স্বাধ্যায়ের (scripture) সেবাদ্বারা যে সহানুভূতি বর্দ্ধিত হয়, যে সংহতি-শক্তি গড়িয়া উঠে, যে সংহতি বলে বলীয়ান মুসলমানগণ বিশ্বজয়ের কল্পনা করে, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। ব্রাহ্মসমাজে ঐক্যের বন্ধন শিথিলতম।

আর্য্য সমাজ বেদের প্রতি নিষ্ঠার দ্বারা ঐক্য বন্ধনের মূল সূত্র অটুট রাখিয়াছে। অতীতের সহিত সংযোগ তাহার অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু "গুরুমতার" প্রচলন দ্বারা, গুরুগোবিন্দ বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সংযোগের যে ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, আর্য্য সমাজে তাহা অনাদৃত। অতএব ব্রাহ্ম সমাজ বা আর্য্যসমাজ শিখ সঙ্গতের স্থান অধিকার করিতে পারে না।

গুরুগোবিন্দ যখন ধর্ম্মতন্ত্র প্রচার করেন তখন বিদ্যাচর্চ্চার সুবিধা ছিলনা, উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল না, দেশে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই ছিল, মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, পাশ্চাত্য দেশের সহিত সংস্পর্শ অনারব্ধ। তথাপি একান্ত আধুনিক দার্শনিকেরও গৌরবজনক এই "গুরুমতা" প্রথা যিনি উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহার কথা মনে করিলে হৃদয় স্বতঃই বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় আনত হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে হরিজন আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছে। গুরুগোবিন্দই হরিজন আন্দোলনের প্রাক্তন প্রধান ঋত্বিক্। তিনিই ব্যাপকভাবে হরিজন আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। "হরিজন" এই শব্দটীও তাহার রচনায় অনুপলব্ধ নহে।

হরি হরিজন দুই এক হৈ,
ভেদ বিচার কুছ নাহি ॥
গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক ৬-৬০)

(১) শরৎ চন্দ্র রায়—শিখগুরু ও শিখজাতি (রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা)

ভক্তে ভগবান—যত্র জীব তত্র শিব, ইহা তাঁহারই বাণী। আর্য্যধর্ম্ম উদ্ধারের জন্য সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা যিনি করিয়া গিয়াছেন, ক্ষণেকের জন্যও সেই মহামানবের ধ্যান মনে অতুল শক্তির সঞ্চার করিবে।

(খ) গাণপত্য (Democracy)।

গুরুগোবিন্দ নিজের জন্য কোনও বিশিষ্ট অধিকারের দাবী করেন নাই। দৈব অনুগ্রহের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া, লোকে যাহাতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে ইহাই ছিল গুরুগোবিন্দের প্রধান শিক্ষা। বালক গুরুগোবিন্দ পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

নানক সব কিছ তুমরে হাতমে,
তুম হি হোত সহায়॥

সবই তোমার হাতে, তুমিই তোমার সহায়। তাই তাঁহাতে কোনও অলৌকিক শক্তি আরোপের তীব্র প্রতিবাদ তিনি করিয়া গিয়াছেন।

যে হমকো পরমেশ্বর উচর হৈ।
তে সভি নরককুণ্ডমেহি পর হৈ॥
মৈ হৈ পরমপুরুষকে দাসা।
দেখন আয়ে জগত তামাসা॥

গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

যে আমাকে পরমেশ্বর বলিবে সে নরকে যাইবে। আমি পরম পুরুষের দাস, এই জগতের তামাসা দেখিতে এথায় আসিয়াছি।

সঙ্গে সঙ্গে কোনও অলৌকিক অধিকারের দাবীও তিনি উত্থাপন করেন নাই। বরং অপর সাধারণের ন্যায় শিখ-পঞ্চকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পঞ্চকের মহিমা তিনি দৃঢ় করিয়াছেন। যাহাতে গাণপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, শ্রীকৃষ্ণের "পাঞ্চ জন্য" আবার গর্জ্জিয়া উঠে, তজ্জন্য তাহার যে আগ্রহ, অন্য কোনও পয়গম্বরের জীবনে তাহা দেখা যায় না।

গণশক্তির প্রভাব ইসলামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ছোট বড়র প্রভেদ ইসলাম যথাসম্ভব তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বাদশাহ ও ক্রীতদাশ একসঙ্গে দাঁড়াইয়া নমাজ পড়াই তাহার আদর্শ। গুরুগোবিন্দও কল্পিত রেখাদ্বারা মানুষে মানুষে প্রভেদ গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

বড় লঘু কে ভেদ নহি
শিক্ষা লেবৈ শিখ।
বরণ জাতি কো দূর ধর
ঐসো শিখ সুলখ্।

গীতগোবিন্দ (রহেতনামা)

গণশক্তির মহিমা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহাতে গণশক্তির গৌরব শিখদের হৃদয়ে নিরন্তর সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে, এই জন্য তিনি নিজের প্রথম পাঁচজন শিষ্যের নিকট নিজেই ফিরিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। এই পাঁচজন শিখ ইতিহাসে "পঞ্চ পিয়ারা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। "পাঁচজনের গৌরব, এমনকি গুরু অপেক্ষাও অধিক" আর কোনও পয়গম্বর এই কথাটা এমন স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন কি? গুরুগোবিন্দ বলিতেন—

গুরুঘরকী মর্য্যাদা পঞ্চহু
পঞ্চহু পাহুল পূরব পীন।
হই তনখায়ি বখ্সহি পঞ্চহু
পাহুল দে মিলি পঞ্চপ্রবীন॥

গীতগোবিন্দ (রহেতনামা)

পঞ্চকই গুরুঘরের মর্য্যাদা (নিয়ম)। পাঁচজনের হাত হইতে অমৃত পান করিলে তবে তাহা সিদ্ধ হয়। কেহ দণ্ডনীয় হইলে পঞ্চকই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে, আর পাঁচজন একত্র হইলেই যে কেহকেই শুদ্ধি দেওয়া যাইতে পারে।

(১) Nirang—Transformation of Sikhism—Chap. 10.

(গ) সংগঠন।

সংগঠন শিখ পন্থার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। যেমন পার্শী তেমন হিন্দু, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত থাকাতেই পরপদদলিত হইয়া আসিতেছিল। নতুবা হিন্দু ও পার্শী শাস্ত্রে এমন কোনও পারমার্থিক তত্ত্বের, কিংবা ব্যক্তিগত হিন্দু ও পার্শী চরিত্রে এমন কোনও সৎগুণের অভাব ছিল না, যাহা তাহাদিগকে আরবের মরুভূমি বা তুরস্কের অরণ্যানী হইতে শিখিতে হইত। আর শৌর্য্য বীর্য্যের কথা তুলিলে বলিতে হয়—আর্য্যের অস্ত্র শস্ত্রের ঝঙ্কার মহাভারতের পর্ব্বে পর্ব্বে আজও শুনিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসের প্রারম্ভেই হিন্দু ও পার্শীর হস্তে ইউরোপের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি, ম্যারাথন ও থার্ম্মপলি আজও মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। ঋগ্বেদের রণদুর্ম্মদ যোদ্ধাগণ সদর্পে বলিতেন—

ইমে ইন্দ্র ভরতস্য পুত্রাঃ।
অপ্রপিত্বং চিকিতুর্ ন প্রপিত্বম্॥

ঋগ্বেদ ৩-৫৩-২৪

হে ইন্দ্র, ভারতের এই বীরপুত্রগণ কঠোরতারই অভিলাষী, শত্রুর করুণা ভিক্ষা তাহারা করেনা। দেশের সম্পদ্ ও কৃষ্টি রক্ষার জন্য—গো-ব্রহ্মণ্য-হিতায় চ—বুকের রক্ত দিতে আর্য্যগণ কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। তথাপি জীবন সংগ্রামে হিন্দু ও পার্শী কেবল হারিয়াই যাইতেছিল।

নাহি আর হাসি
ম্লান মুখ শশী
এস্ত মেবার সুন্দরীর।

মাত্র দুইটী বস্তুর অভাবের জন্যই এই বিপর্য্যয় ঘটিতেছিল, সেই দুইটি বস্তু শুদ্ধি ও সংগঠন। সংগঠনের অভাব বশতঃ সমস্ত হিন্দুগণ কিম্বা সমস্ত পার্শীগণ একযোগে মিলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিত না। শুদ্ধির অভাবের ফল আরও গুরুতর। হিন্দুস্থান জয় করিবার জন্য আরবকে একটি মাত্র সৈনিকেরও প্রাণব্যয় করিতে হয়

নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরবগণের মধ্যে কেবল মাত্র ইবন কাসিমই সিন্ধুর কতক অংশ জয় করিয়াছিল। কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যেই সিন্ধু-সৌবীরগণ হৃত স্বাধীনতা সগৌরবে উদ্ধার করিয়া লয়। ভারতবর্ষে যে সব মুসলমান পদার্পণ করিয়াছিল, তাহারা হয় তুরস্ক (মোগল) নয় আফগান (পাঠান)। আর পারসিক (ইরাণী) গণ মন্ত্রী সাজিয়া তাহাদের রাজ্য চালাইতেন। আফগানগণ হিন্দু ছিল— চন্দ্রগুপ্তের সময় নগরহার (জালালাবাদ) ও গান্ধারে (কান্দাহার) হিন্দুর রাজপতাকা উড্ডীন থাকিত, তাহা অনেক দূরবর্ত্তি কালের কথা। খৃষ্টাব্দের দশক শতকের শেষভাগে, আজ হইতে মাত্র হাজার বৎসর পূর্ব্বে, যাহাকে পরাজিত করিয়া সুলতান মামুদের পিতা সবুক্তিগিন ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন গজনীর সেই শেষ সম্রাট ছিলেন একজন হিন্দু। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার বংশ শাহীবংশ (রাজবংশ) নামে বিখ্যাত (১)। রাজা ব্রাহ্মণ আর প্রজারা মুসলমান ছিলেন এমন নয়—প্রজারা ও হিন্দু ছিল। পাঠান দিগকে আমরা এখন হিন্দুরূপে কল্পনা করিতে পারিনা বটে কিন্তু এখনও জালালাবাদে কালীমন্দির আছে, কাবুলে গুরুদ্বার আছে (২)। আর সেই কালী মন্দিরের পুরোহিত ধুতি পরেননা বটে, কিন্তু গলায় যজ্ঞোপবীত রাখেন, আর গঙ্গাজল নেওয়াইয়া পিতৃতর্পন করেন (৩)।

পারসিকগণ মঘবান জরথুস্ত্রের আদেশে ভার্গববেদের বিধান মত অগ্নি স্থাপন করিয়া বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিত। আর মোগলগণ কুবলাই খাঁও কনিষ্কের সাহচর্য্যে, তথাগত গৌতম বুদ্ধের অর্চ্চনা করিত। গৃহ বিচ্ছেদের ফলে রাজ পরিবারের কেহ কেহ গিয়া ইসলাম তন্ত্র গ্রহণ করে—যেমন প্রতাপ সিংহের বৈমাত্র ভ্রাতা সগরসিংহের পুত্র, 'মহব্বত

(১) Cambridge History of India.—Vol III—P. 14.

(২) Desh Sevak Book Agency—The Gurudwara Reform Movement P. 89.

(৩) (i) মহেশ প্রসাদ—মেরী ইরাণ যাত্রা (হিন্দী) P. 179.—189.
(ii) মাতাসেবক পাঠক—আফগানিস্থান (হিন্দী) P. 34.

খাঁ' নাম গ্রহণ করিয়া জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতির কাজ করিতেছিল। ইহারাই বাহুবলে পারস্য ও ভারতবর্ষকে ইসলামের পদানত করিয়া দেয়। ভ্রাতৃবিদ্বেষই ভারত ও পারস্যের পতনের কারণ। নতুবা আরবের বাহুতে এত বল ছিল না যে তাহা ভারতের ক্ষত্রিয় বৃন্দকে পরাজিত করিতে পারে। হজরত মহম্মদের যৌবনকাল পর্য্যন্ত আরবদেশ পারস্যের অধীন ছিল (১)। আবার হজরত মহম্মদের তিরোভাবের একশত বৎসরের মধ্যেই আরবজাতি ইতিহাসের রঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিত হয় (২)। তাহার পরে কেবল এই বিংশ শতাব্দীতে, ইংরেজের সহায়তায়, ইবন সাউদের নেতৃত্বে, আরব দেশ প্রথম স্বাধীনতা লাভ করিল। আরব জাতি নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেই পারে নাই, পরের দেশ জয় করা তো দূরের কথা। ভারত ও পারস্যকে জয় করিয়াছে পারসিক ও ভারতীয়। ইহার প্রধান কারণ শুদ্ধির অভাব। মহাব্বৎ খাঁ সাময়িক কোনও উত্তেজনা বশতঃ মুসলমান হইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধির প্রথা প্রচলিত থাকিলে, মহাব্বৎ খাঁর পুত্র পৌত্রগণ হয়ত পুনরায় হিন্দু হইতে পারিত। আর্য্য-সমাজের প্রচারের ফলে, হজরত মহম্মদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কোরেশ বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান, বাগদাদের কলেজের প্রফেসর সম্প্রতি বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন (৩)। মহাব্বৎ খাঁর পুত্র পৌত্রাদির পক্ষে হিন্দু ধর্ম্ম পুণঃগ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক। ব্যাপক ভাবে শুদ্ধি প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন গুরুগোবিন্দ (৪)। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন পাহুল। পাহুল পঞ্জাবী শব্দ—

( ) (i) Browne—Literary History of Persia—Vol. I—P. 262.

(ii) Koelle—Muhammad and Muhammadianism—P. 13

(২) Andre Servier—Islam and the Psychology of the Musalmans P. 184.

(৩) হিন্দুমিশন—১৩৪০

(৪) Lala Lajpat Roy—Hindu-Muslim Unity—P. 31.

ইহার অর্থ দরজা। গুরুগোবিন্দের প্রভাবে যে সমস্ত মুসলমান পাহুল প্রবেশিকার দ্বার দিয়া বৈদিক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সৈয়দ বুদ্ধ শাহ তাহাদের মধ্যে প্রধান (১)।

কিন্তু সংগঠন ব্যতীত শুদ্ধি চলিতে পারে না, উৎসাহের অভাবে শুদ্ধির প্রেরণা লুপ্ত হয়। সংগঠনের উৎসে জল না থাকিলে শুদ্ধির নদী শুকাইয়া যায়। সংগঠন অর্থ সংঘাত্মবোধকে উদ্দীপীত করা—স্বীয় জাতির উপরে "মমতা" বুদ্ধি জাগ্রত করা। সংগঠনের জন্য যাহা কিছু করা দরকার, আর যাহা কিছু করা সম্ভবপর, গুরু-গোবিন্দ তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই।

স্বাজাত্যাভিমানই সংগঠনের প্রথম প্রেরণা—জাতির পৃথক্ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধিই তাহার প্রথম চিহ্ন। "আমরা একটী পৃথক জাতি, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য অপর জাতি হইতে পৃথক্", এরূপ ধারণা জন্মিবার পূর্ব্বে স্বজাতির উপর ভালবাসা জন্মিতে পারে না। এটা "আমার জাতি" "আমার দেশ" এরূপ মমতাবুদ্ধি না জাগিলে, সেই জাতির জন্য সেই দেশের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগের প্রেরণা আসে না। "আমিত্বের প্রসার দ্বারাই আমিত্বের বিনাশ করিতে হয়।" ক্ষুদ্র আমিকে ক্রমশঃ বড় বড় আমিতে পরিণত করিতে হয় (২)। ইহাই অহঙ্কার লোপের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। এরূপ প্রসারের পথে জাতীয়তা একটী প্রধান ঘাটী। গুরুগোবিন্দ জাতীয়তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। স্বজাতির প্রতি মমতাবোধ জাগাইবার চেষ্টার ত্রুটি তিনি রাখেন নাই। বঙ্কিম চন্দ্র বলিয়াছেন "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" ইহা যেন গুরুগোবিন্দের বাণীরই প্রতিধ্বনি।

সেব করি ইনহীকি মন ভাবত
ঔর কী সেব সহত ন জীকো।
দান দয়ে ইনহীকো ভলে
ঔর আনকী দান ন লাগত নীকো॥

গীতগোবিন্দ (খালসেদী মহিমা)

---

(১) Kartar Singh—Guru Govinda Singh—P. 63.

(২) যদুনাথ মজুমদার—আমিত্বের প্রসার।

ইহাদের (শিখদের) সেবা করিতেই মন চায়, আর কাহার ও সেবা অন্তরে ধরেনা। ইহাদিগকেই দান দয়া ভাল, আর কাহাকেও দান তেমন ভাল লাগেনা।

বিশ্বপ্রেম ভাল কথা। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের পরিজনকে প্রতিপালন করেনা, তাহার পক্ষে বিশ্বপ্রেমের কথা বলা "ভাবের ঘরে চুরি" মাত্র। যে ব্যক্তি নিজের ছেলেকে মানুষ করিতে চেষ্টা না করিয়া সমস্ত ধনসম্পত্তি দরিদ্রকে বিলাইয়া দেয়, সে উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করে, পিতৃঋণে ঋণী থাকে। যাহাদের বিশ্বপ্রেমের ধারা স্বজাতিপ্রেমের ভিতর দিয়া প্রবাহিত না হয়, তাহারা নিজের জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। শুনা যায় বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়া কেহ কেহ মহাত্মা গান্ধীকে খাদি আন্দোলন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি নিজে শক্তিহীন সে যেমন পরের কোন ও উপকার করিতে পারেনা, যে জাতি শক্তিহীন সে জাতিও বিশ্বের কোনও উপকার করিতে পারে না। জাতীয় শক্তি লাভের একমাত্র পন্থা সংগঠন—Organisation—পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করা। তবে এই উপচীকির্ষা স্বীয়জাতিতেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বজনের প্রতি যেন ছড়াইয়া পড়ে, বিশ্বপ্রেমের অর্থ এক মাত্র ইহাই হইতে পারে। অর্থাত্ বিশ্বপ্রেম স্বজাতিপ্রেমের—সংগঠনের—পরিপন্থি নহে, স্বজাতিপ্রেমের বিকাশমাত্র। সংগঠনই গুরুগোবিন্দের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গুরুগোবিন্দ বলিয়াছেন—

ফটে হি জাহাজ একে করেঙ্গে
মিল মিল শরধা করায় তরঙ্গে। (১)

আমি বিচ্ছিন্ন আর্য্যজাতিকে ভগ্নপোতের ন্যায় মেরামত করিব। শ্রদ্ধায় পরস্পর দৃঢ় সম্বদ্ধ হইয়া এই আর্য্যতরণী হেলায় পরপারে উত্তীর্ণ হইবে।

---

(১) তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরুগোবিন্দ সিংহ P. 369.

শিখই শিখের সহায়। শিখ-সংঘ অপেক্ষা শিখের উত্তম সহায় আর কেহই নাই। এইজন্য শিখ-সঙ্গতই শিখের পক্ষে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার পাত্র। সংঘই গুরুস্বরূপ।

সংঘ মেরো রূপ হৈ খাস।
সংঘমে হুঁ করুঁ নিবাস॥
গীতগোবিন্দ

সংঘই আমার নিজ রূপ। আমি সংঘেই বাস করি।

গুরু সংঘ, সংঘ গুরু।
আবতে হুয়ী ঐসী বিধি স্থরু॥
গীতগোবিন্দ (সূর্য্যপ্রকাশ)

গুরুই সংঘ, সংঘই গুরু। আজ হইতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল

সিং সুরহেত পাঁচ যাহা মিলে।
মম স্বরূপ সো দেখো ভলে॥
গীতগোবিন্দ (রহেতনামা)

যেখানেই পাঁচজন নিষ্ঠাবান শিখ মিলিত হয়, তথায় আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে।

সংহতির মহিমা প্রচার করিবার জন্য ভাই গুরুদাস লিখিয়া গিয়াছিলেন—

এক শিখ, দো সাধুসঙ্গ,
পঞ্চ্ পরমেশ্বর।

যখন একক, তখন শুধু শিখ। দুইজন মিলিলেই তাহা সাধু-সঙ্গে পরিণত হয়। আর পাঁচজন শিখ মিলিলে, পরমেশ্বর স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন।

এই জন্যই যে কোনও স্থানেই কয়েকজন শিখ বাস করে, তাহারা সঙ্গত গঠন করে, গুরুদ্বার বানায়, আর দিবানোপাসনায় মিলিত হয়। তাহারা পরস্পরের সাহচর্য্য কামনা করে; "বার হিন্দুর তের চূলা" গড়িয়া, জাতির ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয় না। তাই যে কোনও জাতিরই সম্মুখীন হইতে শিখ ভীত হয় না।

মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ একমাত্র শিখেই পরিস্ফুট হইয়াছে, গুরুগোবিন্দ এরূপ মনে করিতেন। এজন্য অশিখকে তিনি কৃপার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাহাদিগকে দ্বেষ বা ঘৃণা করিতেন না।

যে যে আউর ধিয়ানকো ধরহি।
বহিস বহিস বাদোঁতে মরহি ॥

গীতগোবিন্দ (বিচিত্রনাটক)

যাহারা অপর কোনও মত অবলম্বন করে, তাহারা বৃথা বাগ্-বিতণ্ডার জালে পড়িয়া মরে।

শিখ পন্থার পুষ্টি ছাড়া হিন্দু-পার্শীর বাঁচিবার আর কোনও উপায় ছিল না। এইজন্যই শিখপন্থার প্রাধান্য তিনি খ্যাপন করিয়াছেন। কারণ হিন্দুর সবই ছিল, কেবল সংঘ-প্রেম ছিল না। সংঘবন্ধনের অভাবে হিন্দু মৃতের ও অধম হইয়া পড়িয়াছিল——কন্যা ও জায়ার সম্মান রক্ষা করিতে পারিত না। সংঘ-মৈত্রীর ভাগিরথী প্রবাহদ্বারা গুরুগোবিন্দ মৃত হিন্দুজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। শিখ-আদর্শ পরিত্যাগের অর্থ, সংঘের বাসনা পরিত্যাগ,——মৃত্যুকে পুনরালিঙ্গন। তাই গুরুগোবিন্দ বলিয়াছেন শিখের আদর্শ ত্যাগ করিলে কেবল বাক্যবীর হইয়া তোমরা চিরকাল দুঃখই পাইবে। এই জন্যই পূজনীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলিতেছেন "যদি হিন্দু আপনী জাতি ঔর দেশকী উদ্ধার চাহতে হৈ, তো প্রত্যেক হিন্দুকা কর্ত্তব্য হৈ, কি বহ আপনী সন্তানমে সে এক পুত্রকো অবশ্য শিখ বনা দেঁ।" (১)

সংঘের প্রয়োজনীয়তা অনেক পূর্ব্বেই গৌতমবুদ্ধ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধ (গুরু) ও ধর্ম্মের সঙ্গে সংঘের স্থান জুড়িয়া দিয়া, তিনি ত্রিশরণ মন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি"। কিন্তু তাহা ছিল

(১) শিখবীর—এপ্রিল ১৯৩৬ পৃঃ—১৪

সন্ন্যাসীর সংঘ। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে তাহা শিখায় নাই। বক্তিয়ার খিলজী ওদন্তপুরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ সহস্র যতিকে এক ঘণ্টায় সংহার করিয়াছিলেন। তাহাদের অহিংসা ব্রত বক্তিয়ার খিলজীর হিংসা হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। (১)

"এক ঈশ্বর, এক গুরু ও এক গ্রন্থ" ইহাই ছিল গোবিন্দ সিংহের মূল সূত্র। এই একের আদেশ ব্যতিরেকে অন্যের আদেশ আমরা মানিব না, ইহা শিখের মূল মন্ত্র।

"এক বিনা মন, নৈক ন জানৈ।"

গীতগোবিন্দ (তেতি-সবৈয়া)

ঈশ্বর গুরুর মধ্য দিয়া নিজকে অভিব্যক্ত করেন। গুরু আবার গ্রন্থের মধ্য দিয়া নিজকে প্রকাশিত করেন। এই জন্য গ্রন্থই হইল শিখের পরম আরাধ্য ধন। গ্রন্থই শিখের গুরু, গ্রন্থই ঈশ্বরের প্রকাশ।

তিন রূপ হৈ মোকে, শুনো নন্দ চিত লায়ি।
নির্গুণ[১] সগুণ[২] গুরুশব্দ[৩], কহু তোহি সমঝায়ি॥

গীতগোবিন্দ (রহেত নামা)

গ্রন্থকেই গুরু বলিয়া মানিতে হইবে। নন্দর-নগরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত গুরুগোবিন্দের ইহাই অন্তিম উপদেশ।

অজ্ঞাভয়ী অকালকা তব চলয়া পন্থ।
সব শিখোকা হুকম হৈ গুরু মানিয়ে গ্রন্থ॥

গীতগোবিন্দ (রহেত নামা)

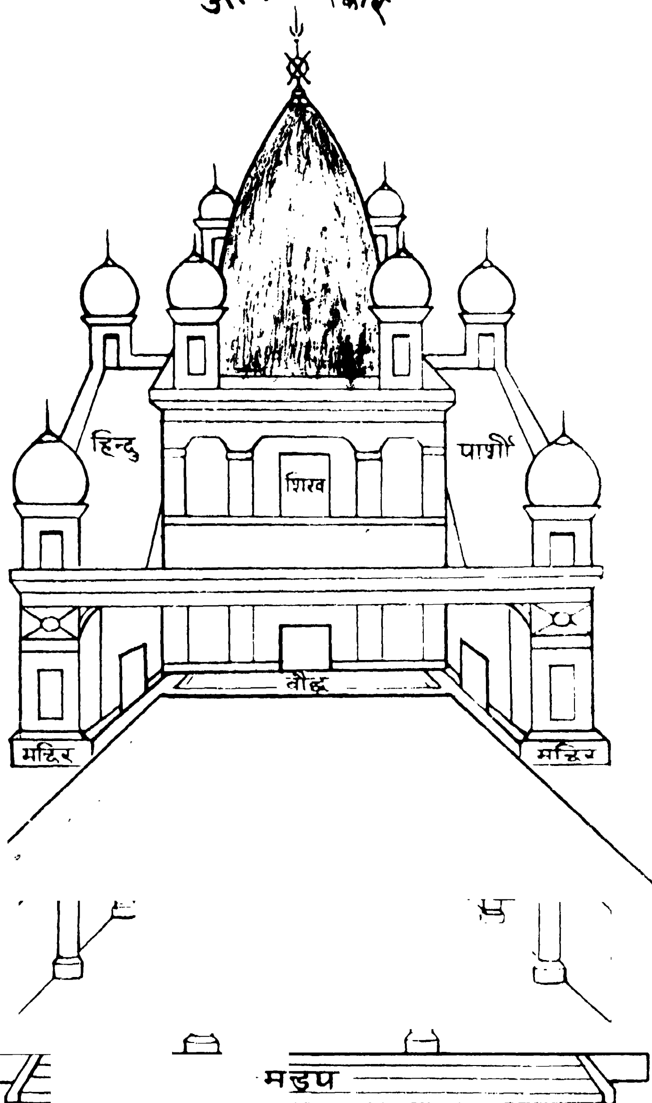
শিখ মন্দিরে হিন্দু মন্দিরের মতো কোনও বিগ্রহও নাই, আবার মুসলমানের মসজিদের মতো তাহা শূন্য-গর্ভও নহে। তথায় সিংহাসনের উপর জাতির প্রাণবস্তু গুরুগ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত, আদৃত ও পূজিত।

---

(১) Vincent Smith—Early History of India—P. 370.

रामचन्द्र ओ जरथुश्त्र

आदर्श गुरुद्वार



आज्ञा भयी अकालका तव चालाया पन्थ।
सव शिखों का हुकम है गुरु मानिये ग्रन्थ।

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

হিন্দু ও পার্শী এই উভয় পন্থার সম্মিলনের দ্বারাই, আর এই উভয় পন্থার সম্মিলনের জন্যই শিখতন্ত্র সংগঠিত। অতএব আদর্শ গুরুদ্বারে তিনটী কক্ষ থাকিবে। মধ্যস্থ বৃহৎ কক্ষে গুরুগ্রন্থের সিংহাসন। দক্ষিণ (পূর্ব্ব) পার্শ্বের পক্ষগৃহে বেদির উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বিশ্বেশ্বরের প্রতীক স্বরূপ হিন্দুর শালগ্রাম শিলা রক্ষিত। বাম (পশ্চিম) পক্ষগৃহে বেদির উপরে জ্ঞান-পবিত্রতা-আলোকের প্রতীক স্বরূপ পার্শীর অগ্নি কুণ্ড। (মধ্যবর্ত্তী বিশাল কক্ষে গুরুগ্রন্থের সিংহাসন।) দক্ষিণ পক্ষগৃহ সাকারোপাসনা, ও বাম পক্ষগৃহ নিরাকারোপাসনার, আর মধ্যগৃহ উভয়ের সম্মিলিত উপাসনার জন্য। গৌতম বুদ্ধ অথবা বর্দ্ধমান জিন, গার্হস্থ্যাশ্রমের নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। তাঁহারা বন্ধন মুক্ত সন্ন্যাসী। প্রাচীর ঘেরা কক্ষের প্রয়োজন তাহাদের নাই। সম্মুখস্থ মু অলিন্দে গৌতম বুদ্ধের, আর পশ্চাৎ দিকের মুক্ত বারেন্দায় বর্দ্ধমান জিনের স্থান। কর্ম্ম যোগ অতিক্রম করিয়া তবে ভক্তি যোগে (ঈশ্বরারাধনায়) প্রবেশ করিতে হয়। তাই গৌতম বুদ্ধের স্থান সম্মুখের অলিন্দে। আর ভক্তি যোগ অতিক্রম করিলে তবে জ্ঞান যোগে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, তাই বর্দ্ধমান জিনের স্থান পশ্চাতের বারান্দায়। এই তো মন্দিরের কথা। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে সকলের স্থান সংকুলান হয় না। গুরু গোবিন্দ প্রবর্ত্তিত চক্রোপাসনা বা দীবানা-রাধনার সুচারু ব্যবস্থা করা যায় না। এই জন্য মন্দিরের সম্মুখে থাকিবে মণ্ডপ। মণ্ডপ যত বৃহৎ হয়, যত অধিক সংখ্যক লোক একসঙ্গে উপবিষ্ট থাকিয়া চক্রোপাসনায় যোগদান করিতে পারে তাহাই বাঞ্ছনীয়। এই মণ্ডপ গাণপত্যের (Democracy) আধার। পাঞ্চজন্যের অধিপতি গণধর গুরুগোবিন্দের রণধীর প্রতিকৃতি তথায় রাখিতে হইবে। আর চক্রোপাসনার সময় ব্যতীত অন্য সময় তাহা শাস্ত্র (পাঠশালারূপে) ও শস্ত্র (ব্যায়ামশালারূপে) আলোচনায় ব্যবহৃত হইবে। আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যবহার করিয়া উহার গৌরব কখনও ক্ষুণ্ণ করা হইবেনা।

এই মন্দির ও সম্মুখস্থ মণ্ডপ (নাট মন্দির) নিয়াই গুরুদ্বার। এই গুরুদ্বারই সমাজ শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সংযোগ সেতু। এইখানেই হিন্দুমন্দিরের সহিত শিখ গুরুদ্বারের পার্থক্য। হিন্দুর পক্ষে মন্দির একটি অতিরিক্ত অলঙ্কার মাত্র। শিখের পক্ষে গুরুদ্বার একটী অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠান। গুরুদ্বার ব্যতীত শিখ সংঘের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

১৯২৬ সনের কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার সময় একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র পালকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "সাত দিনের ভিতর বাঙ্গালা দেশের সমস্ত মুসলমান সংঘবদ্ধ হইতে পারে, হিন্দুরা তাহা পারে কি? কলিকাতায় একটী কেন্দ্রিয় অফিস খুলিয়া, তাহাতে একটী রেজেষ্টারি রাখিয়া প্রত্যেক গ্রামের মসজিদের ইমামের নাম ও ঠিকানা রাখিয়া দিলে, দূরতম গ্রামের মুসলমানদিগকেও সাতদিনের মধ্যেই কেন্দ্রিয় আফিসের সিদ্ধান্ত জানাইয়া কোনও কাজ করিতে আহ্বান করিতে পারা যায়। জুম্মার নমাজের দিন ইমাম তাহা জানাইয়া দিলে অবিলম্বে সেই সমাচার গ্রামে গ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। হিন্দুরা এরূপ সংঘ বদ্ধ হইতে পারে কি?" মুসলমান নেতাটী যে অভিপ্রায়েই একথা বলুন না কেন, কথাটি অতি সত্য। যৌথ ভাবে কাজ করিবার কোনও সংস্থা হিন্দুরা উদ্ভাবন করিয়া লয় নাই। কিন্তু শিখ সম্প্রদায় সম্বন্ধে একথা খাটে না। গুরুদ্বার শিখ-সংঘের হৃদযন্ত্র স্বরূপ। হৃদযন্ত্র যেমন শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাদিগকে জীবিত রাখে, গুরুদ্বার গুলিও তেমন প্রত্যেক শিখের নিকট তাহার ধর্ম্মনৈতিক খাদ্য জোগাইয়া থাকে। শিখ সংঘের কেন্দ্র স্থল অমৃতসরের হরিমন্দির। এই কেন্দ্রিয় হরিমন্দির হইতে শিখ সংঘের সিদ্ধান্ত প্রত্যেক শিখকে জানাইয়া দিবার কার্য্যে, প্রতি পল্লীস্থ গুরুদ্বার বাহনের (Medium) কার্য্য করিয়া থাকে।

অবসন্ন হিন্দু জাতিকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিয়া গুরু গোবিন্দ বলিয়াছিলেন—

নানক সব কিছ তুমার হাতমে
তুম হি হোত সহায়॥

নানক, সবই তোমার উপর নির্ভর করে। তুমি ছাড়া তোমার আর সহায় নাই।

শিখ সম্প্রদায় আত্মচেষ্টা দ্বারা গুরুদ্বারের উদ্ভাবন করিয়া লইল। গুরুদ্বার শিখ সংঘের মিলন-ক্ষেত্র। ব্যক্তিগত উপাসনার জন্য গুরুদ্বারের প্রয়োজন তেমন প্রবল নহে। সংঘের উপাসনার জন্য তাহা অপরিহার্য্য। এই বিষয়েই হিন্দু মন্দির হইতে গুরুদ্বারের পার্থক্য। কথিত আছে যে কোনও একজন ভীরু দোকানদারকে একজন সিপাহী যষ্টি দ্বারা আঘাত করে। সে বলিল "আমাকে তো মারিলি, দাদাকে মারতো দেখি।" সিপাহী তাহার দাদাকেও আঘাত করিল। তখন দোকানদার বলিল "আমাকে তো মারিলি, দাদাকে তো মারিলি, বাবাকে মারতো দেখি।" সিপাহী উহার বাবাকেও মারিল। তখন বাণিয়া কাঁদিয়া বলিল "আমাকে মারিল, দাদাকে মারিল, বাবাকে মারিল, প্রভু জগন্নাথ ইহার বিচার করিবু।"

সমস্ত হিন্দু সমাজের অবস্থা এই হীনবীর্য্য বণিকের ন্যায়। সে জগন্নাথের উপর বিচারের ভার দিয়া বসিয়া বসিয়া মার খায়। ব্যক্তিগত ভাবে একজন মুসলমান বা একজন খৃষ্টান একজন হিন্দু হইতে অধিকতর বলবান্ নহে। তথাপি "হিন্দু কেবল মার খায়ই। তাহার কারণ সে সংঘবদ্ধ হইতে জানে না। সংঘের সম্মিলনের জন্য তাহার কোনও স্থান নাই, সংঘে যোগ দিবার জন্য তাহার প্রবৃত্তি, শিক্ষা বা উৎসাহ নাই। "হিন্দুরা কখনই মিলিত হয় না" একথা আমি বলি না। কিন্তু তাহার ধর্ম্ম জীবনে সংঘের কোনও স্থান নাই, তাহার ধর্ম্মজীবনের কোনও অনুষ্ঠানই সংঘের উপর অবলম্বিত নয়। হিন্দুতে হিন্দুতে যদি মিলিত হয়, তাহা সংঘ শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও, সংঘ শিক্ষার সদ্ভাববশতঃ নহে।

গুরুগোবিন্দ ইহা সবিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। জগন্নাথের উপর বিচারের ভার দিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। গুরুদ্বারের উদ্ভাবন দ্বারা সংঘ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই হিন্দু উপাদান দ্বারা গঠিত হইলেও, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও, শিখগণ হিন্দুর ন্যায় কেবল মার খায় না--মার দিতেও জানে (১)।

শিখগণের সংখ্যা মাত্র ত্রিশ লক্ষ। সমগ্র হিন্দু সমাজ যদি গুরু গোবিন্দের আদর্শ গ্রহণ করিত তবে পৃথিবীর ইতিহাস উল্টিয়া যাইত।

আসুন আমরা গ্রামে গ্রামে গুরুদ্বার স্থাপন করিয়া তাহাতে গ্রন্থ গুরু গীতাকে প্রতিষ্ঠিত করি। আর প্রতি দর্শ ও পৌর্ণমাসীতে তথায় উপস্থিত হইয়া "দিবান" নামক চক্রোপাসনায় যোগদান করি। আর যিনি হিন্দু পার্শী সমাজে এইরূপ আমূল অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, তাহাকে নূতন জীবন দিতে পারিয়ছিলেন তাহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করি।

ম্লেচ্ছ পরক্ক যাতে
হিন্দুয়াঁ ধসক যাতে
ধরম করম গরথ যাতে
বেদোঁ পুরাণ কী।
কলমা রটতে যাতে
গায়ত্রী ত্যজত্ যাতে
দেহোরা ডহট যাতে
মতন্ কোরাণ কী।
কবুরা বনত যাতে
তীর্থা সরক যাতে
সুন্যত্ করত্ যাতে
নিন্দত্ পুরাণ কী।
শ্রীগোবিন্দ সিং
সুরমা পূর্ণ ব্রহ্মমূর্ত্তি
না হোতা যোবে
বিষ্ণু ভগবান কী॥

---

(১) রজনী কান্ত গুপ্ত—আর্য্যকীর্ত্তি P. 79.

যদি না ভগবান বিষ্ণু, শূরবীর গোবিন্দ সিংহ রূপে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে ম্লেচ্ছ পুষ্ট হইত, হিন্দু ধ্বস্ত হইত, আর বেদ পুরাণের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ডুবিয়া যাইত। কলমা রটিয়া যাইত, গায়ত্রী ত্যক্ত হইত, কোরানের মতানুসারে দেবালয় চূর্ণ হইত। কবর প্রস্তুত হইত, তীর্থ সরিয়া যাইত, পুরাণের নিন্দিত সুন্নত্ প্রবর্ত্তিত হইত।

অনেকে এই বলিয়া আত্ম প্রসাদ লাভের চেষ্টা করেন যে "রাম, কৃষ্ণ, জরথুস্ত্র প্রভৃতি হিন্দু পার্শীর অবতারগণ কাল্পনিক পুরুষ মাত্র। তাহাদের ঐতিহাসিক কোনও সত্তা ছিল না। এই সব কাল্পনিক ব্যক্তির আরাধনাই হিন্দু-পার্শীর অবনতির প্রধান কারণ। কাল্পনিক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ধর্ম্মনেতার আশ্রয় গ্রহণ করাই হিন্দু পার্শীর কর্ত্তব্য।" (১) রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না সে আলোচনা এখানে করিব না। কিন্তু এই সমস্ত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের পক্ষে গুরুগোবিন্দ একটি কঠিন সমস্যা। যিনি মাত্র দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাকে অনৈতিহাসিক বলিবার উপায় নাই। যিনি আবহমান কাল ক্রমাগত ধুতি ও চাদর ছাড়াইয়া দিয়া, একদিনে হিন্দুকে কচ্ছ-কঞ্চুক পরাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন সেই শক্তিধর পুরুষের শক্তির কথাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে ?

ধন্য আমরা যে আমাদের পৈতৃক সাধনা সম্পদ্ রক্ষার জন্য গুরুগোবিন্দ পতিত ভারতে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়া "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন।

(ঘ) শুদ্ধি

অশিখকে তিনি অনাদরের চক্ষে দেখিতেন এই ধারণায় গুরুগোবিন্দকে সঙ্কীর্ণচেতা অনুদার সাম্প্রদায়িকতাবাদী মনে করিবার কোনও যুক্তি নাই। গীতার নির্দ্দিষ্ট "লোক সংগ্রহ" অথবা মনুষ্যজাতির ঐক্য সংস্থাপনই ছিল গুরুগোবিন্দের জীবনের লক্ষ্য—আর শিখ

(১) Khwaja Kamaluddin—The Ideal Prophet.

তন্ত্রকেই তিনি করিয়াছিলেন সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়। শিখ অর্থ সেই ব্যক্তি যে মনুষ্য জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করে, আর সেই আকাঙ্ক্ষাকে কর্ম্মে পরিণত করিবার জন্য অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট অন্য সকল লোকের সহিত এক যোগে মিলিত হয়। আর অশিখ বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে মনুষ্যজাতির ঐক্য আকাঙ্ক্ষা করেনা, লোক সংগ্রহের আদর্শ যাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করে না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি কূপমণ্ডুককে কৃপার পাত্র মনে করিলে কোন দোষ হয় না। বরং কূপমণ্ডুককে কূপমণ্ডুক বলিবার সাহস না থাকাই দোষের কথা।

অধিকন্তু শিখতন্ত্রের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল—সঙ্গতে যোগ দিবার পক্ষে কাহারওই কোনও বাধা ছিল না। যদি কেহ যোগ না দেয়, তবে তাহা সম্পূর্ণ তাহার নিজেরই দোষ। তাহার নিজের দোষের জন্য তাহাকে দায়ি করা চলে। এ বিষয়ে মৌলিক হিন্দু ও পার্শী তন্ত্র হইতে শিখ তন্ত্রের পার্থক্য লক্ষ্যের বিষয়। প্রাচীন কালে যাহাই থাকুক না কেন, অর্ব্বাচীন কালে জন্মদ্বারা হিন্দু অথবা পার্শী হইতে না পারিলে, কেহই হিন্দু অথবা পার্শী সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত না। যে জন্মতঃ খৃষ্টান অথবা মুসলমান, খৃষ্টপন্থা অথবা মুসলমান পন্থার উপর তাহার যতই বিরক্তি থাকুক না কেন, গীতার উপর তাহার যতই অনুরক্তি থাকুক না কেন, খৃষ্টান বা মুসলমান সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু অথবা পার্শী সমাজে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অসম্ভাব্য কথা ছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাহাকে খৃষ্টান অথবা মুসলমান সমাজে থাকিতে বাধ্য করাই বিড়ম্বনা। তাহার উপর আবার তাহাকে তজ্জন্য উপহাস করা নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা মাত্র। শিখ-সংঘের প্রচারের পর আর সে কথা বলা চলে না। শিখ-সংঘ সকলকেই আপন গণ্ডীভুক্ত করিতে চায়—যদি কেহ শিখ গণ্ডীর ভিতর না আসে তবে তাহা তাহার নিজের দোষ। তজ্জন্য তাহার ত্রুটি ধরা চলে।

হিন্দু ও পার্শীগণ অনার্য্যদিগকে অবজ্ঞা করিত। যতই কেন গুণবান্ হউক না, অনার্য্যকে হিন্দু ও পার্শী কখনও সমকক্ষ বলিয়া

বিবেচনা করিতে পারে নাই—তাহাকে গণ্ডীভুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করে নাই। গুরুগোবিন্দ এই প্রভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন। যে কোনও ব্যক্তিই শিখ সঙ্গতের অন্তর্ভুক্ত হইতে চায়, গুরু গোবিন্দ তাহাকেই সংঘভুক্ত করিয়া লইতেন। বিশ্বময় শিখ-সংঘ প্রচার করিবার ভার অকাল তাহাকে দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—

যাঁহা তাঁহা তোম ধরম বিথারো।
দুষ্ট দোখিয়ানকো পাকড় পছাড়ো॥

গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

তুমি যথায় তথায় ধর্ম্ম বিস্তার করিতে থাক, আর দুষ্ট উৎপীড়ক দিগকে ধরিয়া আছাড় দাও।

শুদ্ধি অথবা পাহুল সংস্কার এই বিশ্বৈক্যস্থাপনের প্রেরণার ফল। লোক সংগ্রহের প্রেরণা আবার গীতাই শিক্ষা দেয়। অতএব শুদ্ধি সংস্কার গীতার শিক্ষারই নৈয়ায়িক পরিণতি। গীতার শিক্ষায় যাহা বীজরূপে উপ্ত, গুরুগোবিন্দ তাহাকেই জীবনে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছেন। পরন্তপ গোবিন্দ সিংহ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীকৃষ্ণের লোক সংগ্রহের আদেশ গুরুগোবিন্দই সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

"লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।"

গীতা ৩-২০

লোক সংগ্রহই তোমার জীবনের লক্ষ্য হউক। গীতার এই আদেশ গুরুগোবিন্দ ব্যর্থ হইতে দেন নাই।

লোক সংগ্রহই যে তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল সে বিষয়ে সংশয়ের হেতু নাই। তিনি বলিয়াছেন—

সকল সৃষ্টি একবর্ণ হুয়া
কর ভুলানি।
ধর্ম্মনেমকি যুক্তি কিনহু
না জানি॥

গীতগোবিন্দ (নয়নাস্তোত্র)

আমি সকল সৃষ্টিকে একবর্ণে পরিণত করিব। ধর্ম্মে নিয়মের অন্য কোনও যুক্তি (প্রয়োজন) আমি স্বীকার করি না।

লোক সংগ্রহরূপ শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তিনি জোর করিয়া বলিয়াছেন যে জগতে এমন কোনও দেশ নাই যেখানে শিখ ধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইবে না।

শ্রীমুখতে পুন ধৈরজ দিন।
দেশ না রহে সিংতে হীন॥
গীতগোবিন্দ (রহেতনামা)

তাহার শ্রীমুখের বাণীদ্বারা ধৈর্য্য (উৎসাহ) দিয়া তিনি বলিলেন, এমন দেশ রহিবে না যেথায় শিখ থাকিবে না।

শিখ ধর্ম্ম বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হউক গুরুগোবিন্দ ইহা ইচ্ছা করিতেন তাহা সত্য বটে, অশিখকে তিনি কৃপণ (Pitiable) মনে করিতেন তাহাও সত্য বটে, কিন্তু অপর তন্ত্রকে অমর্ষ (In-tolerance) করিবার শিক্ষা গুরুগোবিন্দ শিখসংঘকে দেন নাই। তাই গুরুগোবিন্দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া শিখ বলিতে পারে—

যা কউ ছুটগয়ে ভ্রম উরকা
তাকো আগৈ হিন্দু কিয়া তুরকা।
গীতগোবিন্দ (চৌবিশ অবতার)

যাহার হৃদয়ের ভ্রম ছুটিয়া গিয়াছে তাহার নিকট হিন্দুইকী আর তুরকই কী? উভয়েই সমান।

(৬) রাষ্ট্রিকতা।

শিখ চরিত্রের পঞ্চম বিশেষত্ব এই যে শিখগণ জাতিয়তাবাদী। রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্পর্ক নাই, শিখগণ এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে না। শিখ মনুষ্য জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ করিয়া লয় না। যে ব্যক্তি ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে সে শুধু ধর্ম্ম লইয়াই থাকিবে, রাজনীতির কোনও ধার ধারিবে না, শিখ ইহা অনুমোদন

করে না। অথবা সমাজের কতিপয় লোক রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, আর বাকী সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমাইবে, শিখ এমন কথাও সঙ্গত মনে করে না। সমগ্র জীবন লইয়াই মানুষ মানুষ। রাজনীতির চর্চ্চাও প্রত্যেকের জীবনের একদেশ। আবার মানুষের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই মানুষের ধর্ম্ম। রাজনীতির চর্চ্চা দ্বারা ধর্ম্মহানির আশঙ্কা নাই। রাজনীতির চর্চ্চা অর্থাত্ নিজের দেশের শাসন প্রণালী কি ভাবে চালিত হইবে তাহাতে মত প্রকাশ করিবার অধিকার, প্রত্যেক শিখেরই আছে। আর তাহা করা প্রত্যেক শিখেরই কর্ত্তব্য (১)। গুরুগোবিন্দ জাফরনামায় ক্রতু বিমুখতার জন্য ঔরঙ্গজীবকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। রাজার কর্ত্তব্যপালনে দৃষ্টি রাখিবার, আর ক্রতুচ্যুত রাজাকে ধর্ম্মপথে আনিবার অধিকার প্রজার আছে ইহা গুরুগোবিন্দ মনে করিতেন। এই জন্য তিনি সকলকেই শস্ত্র ধারণের আদেশ দিয়াছেন—

শস্ত্রোঁ কী অধীন হৈ রাজ
যো ন ধরহি সো বিগারহি কাজ।

গীতগোবিন্দ (রহেত নামা)

রাজনীতিতে আগ্রহ শিখগণের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার ফল। যাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহার আধিপত্যই শিখ স্বীকার করে। অন্যের আধিপত্য শিখ স্বীকার করে না। অতএব রাজার প্রচলিত নীতি তাহার অনুকূলে কি প্রতিকূলে, শিখ সে বিষয়ে সর্ব্বদাই জাগরুক।

রাজনীতিতে ঔদাস্য হিন্দুর মজ্জাগত দোষ। যে পাতশাহার আদেশে তাহার দেব মন্দির সকল বিচূর্ণিত হইতেছে তাহাকেও "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া অভিনন্দিত করায় কোনও অসঙ্গতি, সে দেখে নাই। রাজনীতিতে আগ্রহই যদি হিন্দুর থাকিত তবে ত্রিশ কোটি লোক অধ্যুষিত এই দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পর পদানত থাকিত না।

(১) Teja Singh—Sikhs and Organisation—P. 8.

সংঘ প্রেমকে গুরুগোবিন্দ রাষ্ট্রপ্রেমের উপরে স্থান দিয়াছেন—কারণ ধর্ম্মের প্রেরণা মানুষকে যেরূপ গভীর ভাবে স্পর্শ করে, তাহার অন্তরের আশংসা ও আদর্শের সহিত ধর্ম্মনীতির সম্পর্ক যেরূপ ঘনিষ্ট, রাষ্ট্রনীতির সহিত সংযোগ তাদৃশ অন্তরঙ্গ নহে। কিন্তু তাই বলিয়া গুরুগোবিন্দ রাষ্ট্র প্রেমকে অস্বীকার করেন নাই। রাষ্ট্রনীতির সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে বলেন নাই। শিখের জীবনে রাষ্ট্র প্রেমের স্থান আছে। এমন কি হিন্দুকে নাগরিকের কর্ত্তব্য শেখান, হিন্দু সমাজে রাজনীতিতে আগ্রহ জন্মান, গুরুগোবিন্দের অন্যতম প্রধান কার্য্য বলিয়া বলা যাইতে পারে।

নাগরিকের অধিকার দাবী করিবার অপরাধেই তাহার বৃদ্ধ পিতা ধর্ম্মপ্রাণ তেঘ বাহাদুর ক্রূরকর্ম্মা ঔরংজীবের আদেশে ঘাতুকের হস্তে প্রাণ দেন। নাগরিকের অধিকার রক্ষা করিতে গিয়াই তাহার জীবন সর্ব্বস্ব চারিটি শিশু পুত্রেরই জীবনদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হয়। হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের শোচণীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া মুসলমানগণ মহরম পর্ব্বের অনুষ্ঠান করেন। মনুষ্য যাহাতে পশুর মত নিষ্ঠুর না হয় সে কথা মনে করাইয়া দেওয়াই মহরম পর্ব্বের সার্থকতা। কিন্তু নৃশংসতা ও বর্ব্বরতায় সিরহিন্দ কারবালাকে বহু বহু অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইসলাম গ্রহণ না করিবার অপরাধে, মাত্র সাত বৎসর বয়স্ক শিশু জোরাবর সিংহ ও নয় বৎসর বয়স্ক শিশু ফতে সিংহকে সিরহিন্দ নগরে ইষ্টকে প্রোথিত করিয়া জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয় (১)। ইষ্টক প্রাচীরে প্রোথিত সেই অসহায় বালক দুইটির দারুণ আর্ত্তনাদ আজিও বাতাসে বাতাসে নিশ্বসিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে, 'ঈশ্বরের আদেশ যদি মানুষকে এত নিষ্ঠুর করিতে পারে তবে দুর্ব্বল অসহায় শিশু কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ?'

শিশু পৌত্রদ্বয়ের জীবন্ত সমাধির কথা শুনিয়া, দেবকীর মত কারারুদ্ধ মাতা গুর্জ্জরী দেবীর সংজ্ঞা লোপ হইল—মৃত্যুর কৃপা

(১) Kartar Singh—Life of Guru Govinda Sinha—P. 198.

মর্ম্মান্তিক যাতনার হাত হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিল (১)। পিতা তেঘ বাহাদুরকে পূর্ব্বেই হত্যা করা হইয়াছিল। পত্নী জীতোজীর কোনও সন্ধান নাই। অজিত সিংহ ও যুঝার সিংহ নামক বালক পুত্রদ্বয় চমকৌরের রণ ক্ষেত্রে চক্ষুর সম্মুখেই অনন্ত শয্যায় শায়িত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দের আপনার বলিবার আর কেহই রহিল না।

সাধারণ মনুষ্য এরূপ অবস্থায় হয় বিকৃত মস্তিষ্ক হয়, নতুবা আত্মহত্যা করে। অসাধারণ মানুষের ও অতঃপর জীবনে অন্য কোনও আকর্ষণ থাকে না, ক্রতু পালনে স্পৃহা থাকে না। আর্য্য জাতিকে অনন্ত বিপদের মধ্যে অসীম ধৈর্য্য শিখাইবার জন্যই যাঁহার আবির্ভাব, চারিটি শিশু পুত্রের যুগপৎ হত্যায়ও তিনি অবসন্ন হইলেন না। সুখ দুঃখ সকলই পরমেশ্বরের দান মনে করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা গ্রহণ করিলেন। "নির্দ্বন্দ্বো নিত্য-সত্ত্বস্থঃ" গুরুগোবিন্দ, এই দুঃখ বহন করিবার শক্তি যিনি দিয়াছেন, এই গুরুতর কর্ত্তব্য পালনের গৌরব তাঁহাকে যিনি দিয়াছেন, সেই অকাল রুদ্রকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—

আজ মুঝপরসে, তেরী আমানত,
আদা হুয়ী।
বেটোঁকী জান, বতন কী খাতর,
ফিদা হুয়ী॥

গীতগোবিন্দ (রহেত নামা)

তুমি আমার উপর যে ভার ন্যস্ত করিয়াছিলে তাহা আজ সিদ্ধ হইল। দেশের জন্য (নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য) পুত্রগুলিকে আমি বলি দিলাম। এখানে "বতন কী খাতর" "দেশের জন্য" এই কথাটি বিশেষরূপে লক্ষণীয়। ধর্ম্মের জন্য বলি দিলাম একথা এখানে তিনি বলেন নাই - দেশের জন্য বলি দিলাম এই কথাই বলিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগকে ভিত্তি রূপে গ্রহণ করিয়াই তো তিনি শিখ

(১) বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরুগোবিন্দ সিংহ—P 74.

সংঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের জন্য আত্মত্যাগও তাহার অনভিপ্রেত ছিল না। "বতন কী খাতর" শব্দ তাহাই সূচিত করে।

এক দেশে যাহারা বাস করে তাহারা মিলিয়া একটি রাষ্ট্র গঠন করে। দেশের ব্যবধানের কথা ভুলিলে তাহাদিগকে চলিবে না। বঙ্গদেশের মুসলমানের সম্পত্তি অপহৃত হইলে, তুরস্ক দেশের মুসলমান আসিয়া তাহা বাহির করিয়া দিতে পারে না। সে কাজ পারিলে বঙ্গদেশের হিন্দু অথবা বঙ্গদেশের মুসলমানই পারিবে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ বিসূচিকায় আক্রান্ত হইলে, জাপান হইতে বৌদ্ধ ডাক্তার আনিয়া তাহার চিকিৎসা সম্ভবপর হয় না। বঙ্গদেশের বৌদ্ধ হিন্দু বা মুসলমান ভিষগ দ্বারা চিকিৎসাই সম্ভবপর ব্যবস্থা। একধর্ম্ম পন্থীদের পরস্পর আকর্ষণ যতই প্রবল হউক না কেন, সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একদেশবাসীদের পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। ইহাতে যিনি নারাজ তিনি পরমেশ্বরকে জগতের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে বলুন। একদণ্ডেই যাহাতে সমস্ত ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া আসিতে পারা যায়, সেই ক্ষমতা মানুষকে দিতে বলুন।

হাফেজ জে খুব-রুইয়ান,
কিসমত জুজ্ আন কদর নিস্ত্,
গর নিস্ত্ অত্ রজাই
হুকম-এ কজা বিগরদান।

হাফেজ

হাফেজ, এর চেয়ে বেশী অনুগ্রহ সুন্দরীরা কাহাকেও করেন না। তাহাতে যদি তুমি সন্তুষ্ট হইতে না পার তবে বিধাতার বিধান বদলাইয়া লও।

যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, যে পর্য্যন্ত দেশের দূরত্বও থাকে আর মানুষের গতিশক্তিরও সীমা থাকে, সে পর্য্যন্ত এক এক দেশের অধিবাসীকে নিয়াই এক একটী পৃথক রাষ্ট্র হইবে। দেশটী বড় অথবা ছোট হইতে পারে, তদনুযায়ী রাষ্ট্রটী বড় অথবা ছোট হইবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থাকিবেই। একটী সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড লইয়া

রাষ্ট্র গঠন না করিলে, সেই রাষ্ট্র দ্বারা দেশের শাসন সংরক্ষণ যথা-যথ চলিতে পারে না।

একটী নদী অথবা একটী পর্ব্বতকে দেশের সীমানা ধরিয়া সাধা-রণতঃ রাষ্ট্র গঠন করা হয়। কিন্তু একভাষাভাষীদিগকে লইয়া রাষ্ট্র গঠনই অধিকতর সঙ্গত। মাতৃভূমির সহিত মাতৃভাষার সম্বন্ধ নিকটতর।

নদী পর্ব্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক সীমানাই থাকুক, আর ভাষাভেদ-রূপ স্বাভাবিক সীমানাই থাকুক, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থাকিবেই। রাষ্ট্রগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া একটী "মহারাষ্ট্র" গঠন করিতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রগুলির ব্যষ্টিত্ব ও নিজত্ব একেবারে লুপ্ত হইবে না। বাঙ্গালী ও জাপানী, কাফ্রী ও ইংরেজ, সকলে যখন একই মাতৃভাষায় আলাপ করিবে, সেই দিনের কল্পনা দৃষ্টির অতীত। দ্বিতীয় একটী ভাষা অধ্যবসায় দ্বারা আয়ত্ত করিলেও তাহা মাতৃ ভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না, আর আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের পক্ষেই দ্বিতীয় একটী ভাষা শিখিবার সুযোগ অথবা বুদ্ধিও নাই। মাতৃভাষায়ই লিখিতে পড়িতে জানে না, এমন লোকের সংখ্যাও বর্ত্তমানে অল্প নহে—দ্বিতীয় একটী ভাষা সার্ব্বজনীন মাতৃভাষা হইবার কল্পনা ইউতোপিয়ার কাহিনী মাত্র।

অতএব অন্ততঃ মাতৃভাষা ভেদে রাষ্ট্র ভেদ থাকিবেই। আর একভাষাভাষী সমস্ত লোক যে একই ধর্ম্ম পথের পথিক হইবে এমন কোন নিয়মও নাই। পরমেশ্বর ও বোধ হয় তাহা চান না—তাই তিনি জনে জনে ভিন্ন ভিন্ন রুচি দিয়াছেন।

একই রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মতন্ত্রাবলম্বী লোক বাস করিবে। তাহারা যদি পরস্পর কলহ করিতে থাকে তবে রাষ্ট্রের কার্য্য সুচারু-রূপে চলিতে পারে না—রাষ্ট্র যে জন্য গঠিত হইয়াছে তাহা নির্ব্বা-হিত হয় না। যাহাতে মনুষ্যত্ব লাভের পথ সকলের জন্যই সমান উন্মুক্ত থাকে, এক ব্যক্তি আর একজনের উপর নিপীড়ন করিতে

না পারে, ইহাই রাষ্ট্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের কার্য্য যথাযথ নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক প্রজারই সাহচর্য্যের আবশ্যক। রাষ্ট্রকে সে সাহচর্য্য যে দেয় না, সে সহযোগ যে করে না, তাহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইতেছে। রাজা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মনে করিয়া সে সাহচর্য্য রুদ্ধ করিবার নৈতিক অধিকার কোন ও প্রজারই নাই। ধর্ম্মের ক্ষেত্র ও রাজনীতির ক্ষেত্র পৃথক্ রাখিতে হইবে। তাহা যে করে না সে শুধু যে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হয় এমন নহে, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যও ধর্ম্ম জীবনের অঙ্গ বিধায়, সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম হইতেও বিচ্যুত হয়।

রাজনীতির সহিত ধর্ম্ম নীতিকে জড়াইয়া ফেলিবে না। এই জন্য গুরুগোবিন্দ স্পষ্ট আদেশ দিয়া গিয়াছেন—

দীন শাহ ইনকো পহিচানে।
দুনীপতি উনকো অনুমানে ॥

গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

একজনকে—দীনের (ধর্ম্মের) মালিক ও অপরকে দুনিয়ার মালিক বলিয়া জানিবে।

অবশ্য রাজার আনুগত্য যেমন প্রজার কর্ত্তব্য, প্রজার সহযোগের উপর যেমন রাজার ন্যায্য দাবী আছে, তেমন রাষ্ট্রেরও কর্ত্তব্য, প্রজার ধর্ম্মতন্ত্রের উপর কোনও রূপ হস্তক্ষেপ না করে, আর ধর্ম্ম বিষয়ে সকল প্রজারই স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। যে রাজা তাহা করে না, যে রাষ্ট্র কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্ম-পন্থীর জন্য কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি করে, প্রজার আনুগত্যের নৈতিক অধিকার তাহার আর থাকে না।

এই কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্যই গুরু গোবিন্দ ঔরংজীবকে পত্র লিখেন। পারসিক ভাষায় পদ্যে লিখিত সেই পত্রই জাফর-নামা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি তাহাতে বলেন যে প্রজার ধর্ম্মচর্চ্চায় হস্তক্ষেপ

করিবার অধিকার রাজার নাই। হিন্দুর উপর অত্যাচার করিয়া তুমি রাজধর্ম্ম বিচ্যুত হইয়াছ, কেবল ইহাই নহে, তুমি বল যে কোরাণের আদেশ অনুযায়ীই তুমি মূর্ত্তিপূজায় বাধা দিয়া থাক। তোমার এই ভণ্ডামি দেখিয়া হজরত মহম্মদও সন্তুষ্ট হইবেন না। মূর্ত্তিপূজাই যদি তোমার দ্বেষের কারণ হইয়া থাকে তবে তুমি শিখদের উপর অত্যাচার করিতেছ কেন? শিখেরা তো মূর্ত্তিপূজক নয়। আমি তো বুত-পুরস্ত (পৌত্তলিক) নই, আমি তো বুত-শিকন (অপৌত্তলিক)।

এই অনুযোগের উত্তর ঔরংজীব কিছুই দেন নাই। এই অনুযোগের দিবার মতো উত্তর তাহার কিছুই ছিল না। দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া এই পত্র ঔরংজীব পাইয়াছিলেন। তাহার দরবারে উপস্থিত হইয়াও, শির না নোয়াইয়া যে শিখ পত্র দিতে পারে, গুরু গোবিন্দ সেই শিখের গুরু। দাক্ষিণাত্যে বসিয়া তাহার উত্তর দেওয়া চলে না—কিন্তু উত্তরাপথে আসিবার পূর্ব্বেই ঔরংজীব পরলোকে গমন করিলেন (১)।

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্যই গুরুগোবিন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজত্বস্থাপনের জন্য নহে। তিনি ঔরংজীবকে লিখিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়াই আমাকে অস্ত্র ধরিতে হইয়াছে—

বা লাচারগী দরমিয়ান্ আমদম।
বা তদ্‌বির- এ তীর ও তুফঙ্গ আমদম॥
গীত-গোবিন্দ (জাফর নামা)

নিরুপায় হইয়াই আমি ইহার মধ্যে আসিয়াছি, তীর ও বন্দুক দ্বারা প্রতীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বহু যুদ্ধই গুরুগোবিন্দ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু এক গব্যূতি পরিমাণ ভূমিও তিনি দখল করেন নাই (২)। আর বাহাদুর শাহ যখন হিন্দুর উপর অত্যাচার করিতে বিরত হইল, তখন গুরুগোবিন্দও অস্ত্র

(১) Kartar Singh—Life of Guru Govinda Sinha—P. 208.
(২) Kartar Singh—Life of Guru Govinda Singh—P. 44.

ত্যাগ করিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে রাজা স্থাপন কিম্বা রাজা মুসলমান বলিয়াই তাহার উচ্ছেদের চেষ্টা, গুরুগোবিন্দের অভিপ্রায় ছিল না। ইহা অপেক্ষাও বিশদ ভাবে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

"বাব এ বাবর কো দেউ,"

গীতগোবিন্দ—বিচিত্র নাটক

রাজার প্রাপ্য কর বন্ধ করিওনা। কিন্তু তাই বলিয়া রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির কোনও সম্বন্ধ নাই, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি রাজনীতির সকল সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবে, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তিনি পোষণ করিতেন না। রাজনীতিও ধর্ম্মজীবনের অঙ্গ বটে। রাজনীতির চর্চ্চা ব্যতীত ধর্ম্ম জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। তাই তিনি সকল শিখকেই শস্ত্রচর্চ্চা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আর রাজা যদি ধর্ম্মচক্রে হস্তক্ষেপ করে কিন্তু প্রতিকারের অন্য উপায় না থাকে, তবে সশস্ত্র প্রতিরোধ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একথা জাফর নামায় তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

চুঁ কার আজ হামা হালত
দর গুজাস্ত্।
হালাল আস্ত্ বুরদান
বা শমসের দস্ত্॥

গীত গোবিন্দ (জাফর-নামা

যখন প্রতিকারের সকল পন্থা নিঃশেষিত হইয়াছে তখন তরবারিতে হস্তক্ষেপ ন্যায় সঙ্গত বটে।

যাহারা মনে করেন শিখ-সঙ্গত পঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ, পঞ্জাবের কতক অধিবাসী নিয়াই শিখ-সঙ্গত সংগঠিত, তাহাদের এই ধারণা শিখ ইতিহাসে অনভিজ্ঞতার ফল। যে পাঁচজন শিখকে নিয়

গুরু গোবিন্দ প্রথম সঙ্গত গঠন করেন, তাহাদের মধ্যে দয়ারাম ছিলেন দিল্লীর জাঠ, মুহকম চাঁদ ছিলেন দ্বারকার একজন ধোপা, সাহেব চাঁদ ছিলেন বিদরের একজন নাপিত, আর হিম্মত রায় ছিলেন পুরীর একজন কুম্ভকার (১)। ভারতের সর্ব্বপ্রদেশ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়াই শিখ-সঙ্গত গঠিত হয়। তিরোধানের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য হইতে বান্দা-বাহাদুরকে আহ্বান করিয়া তিনি সঙ্গতের পরিচালনার ভার তাঁহার উপর দেন। ভারতের জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝা যায় গুরু গোবিন্দই তাহার পত্তন করেন (২)। শিবাজী বা প্রতাপ সিংহ তাহা করেন নাই। মারহাট্টা ও রাজপুত নিয়াই তাঁহারা কাজ করিয়াছেন। ইহারা পূর্ব্ব হইতেই জাতীয়তা ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল, তাহাদের স্বাধীনতা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল না। অপর পক্ষে পঞ্চশত (৩) বর্ষব্যাপী ধর্ম্মান্ধ তুর্কী-পাঠান ও মোগল আধিপত্যের ফলে পঞ্জাব একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। মানুষ বলিতে পঞ্চনদে আর কেহ ছিল না। গুরুগোবিন্দ পঞ্চনদের এক মুষ্টি ধূলি হাতে নিয়া এক ফুৎকারে মুহূর্ত্তে তাহাকে একটি বলশালী জাতিতে পরিণত করিলেন।

ভুলে যায় সবে জাতি অভিমান
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

সে জাতির দৃষ্টি কেবল পঞ্জাবে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিখ সংঘের অধিনায়কত্ব গুরুগোবিন্দ যাহাকে অর্পন করেন, সেই গুরু-বখ্স সিংহ (বন্দা-বাহাদুর) জাতিতে রাজপুত, তাহার নিবাস মহারাষ্ট্র, আর কর্ম্মক্ষেত্র পঞ্চনদ।

---

(১) (i) Kartar Singh—Life of Guru Govinda Singh—P. 110.
(ii) Cunningham—History of Sikhs P. 103.

(২) Narang—Transformation of Sikhism— Chap. 10.

(৩) ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ নিহত হন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুগোবিন্দ জন্ম গ্রহণ করেন।

রাজনীতিতে অতন্দ্রিত আগ্রহ রাখা প্রত্যেক শিখেরই কর্ত্তব্য। তাই গুরু গোবিন্দ বলিয়াছেন—

রাজ করেগা খালসা
আকী রহে না কোই।
খ্বার হোই সব মিলেঙ্গে
বাচে শরণ যো হোই॥

শিখ রাজনীতির চর্চ্চা করিবে, তাহাতে উদাসীন হইবে না। যাহারা শিখ সংঘের শরণ লয় তাহারাই বাঁচিবে। আর সকলে ভস্ম হইয়া মিলাইয়া যাইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া গুরুগোবিন্দ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের ক্ষেত্রভেদ ভুলিয়া যান নাই, প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন ও অধিকার যে রাজার নাই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। যে রাজা এই বিধি লঙ্ঘণ করে, সে অচিরেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।

কি পৈমান-শিকন
বে-দীরং আমদন্দ।
মিয়ান তেগ ও তীর ও
তুফঙ্গ আমদন্দ॥

গীতগোবিন্দ (জাফর নামা)

যে রাজা প্রজার অধিকার ভঙ্গ করে, সে অচিরেই বিনষ্ট হয়,—তীর, তরবারি ও বন্দুকের লক্ষ্য হয়।

শত্রুপক্ষ বলিয়া থাকে "তরবারি অথবা কোরাণ" ইহাই ইসলামের শিক্ষা। মিত্রপক্ষ বলে তাহা নয় (১)। কিন্তু "কোরাণ অথবা জিজিয়া" ইহা যে ইসলামের শিক্ষা তাহা মিত্রগণও অস্বীকার করিতে পারে না (২)। ইসলামের চালকগণ এই খানেই মহাভুল

(১) Sell—Faith of Islam —P. 363.
(২) Sell—Historical Development of the Koran P. 120

করিয়াছেন। কোনও তন্ত্র বিশেষের পরিপুষ্টি করিতে গিয়া তন্ত্রান্তরকে নির্য্যাতিত করার মতন গর্হিত কাজ রাজার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারেনা। হিন্দুর উপর অত্যাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য তিনি ঔরংজীবকে অনেক অনুনয় করিয়াছিলেন।

মারা ইতিবারে
বর ইঁ কসম নিস্ত্।
কি এজিদ্ গবা আস্ত্
ইয়াজদান এক আস্ত্॥

গীতগোবিন্দ (জাফর নামা)

মানুষ যদি মানুষের উপর ধর্ম্মের নামে অত্যাচার করে, তবে (সকলের পিতা) ঈশ্বর এক বলিয়া বিশ্বাস তাহার আছে একথা বলা চলে কি ?

কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"। তাই গুরুগোবিন্দ বলিলেন "তোমরা নিজেরা সংঘবদ্ধ হও। রাজা যেমন কর আদায় করিয়া শক্তিশালী হয়, সেই রূপ গুরুর কর "দশবন্ধ" দিয়া তোমরা গুরুকে শক্তিশালী করিয়া তোল। তাহা হইলেই রাজা আর ধর্ম্মের নামে তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। নতুবা চিরকাল ধরিয়াই তোমরা উত্পীড়িত হইতে থাকিবে।

যো বাবেকা দাম ন দেবৈ
তিন তে গহি বাবর কো লেবৈ।
দেই দেই তিনকো বড়ী সজাই
পুন লৈহৈ গ্রহি লুট বনাই॥

বিচিত্র নাটক

যাহারা প্রভুর দান না দেয়, তাহাদিগকেই ধরিয়া বাবরের নিকট লইয়া যাইতে পারে। আর তাহাদিগকেই বড় সাজা দেয়, আর তাহাদিগকেই লুটিয়া লয়।

ধর্ম্মের নামে উত্‌পীড়নের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা গুরুগোবিন্দই আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছেন।

গুরুগোবিন্দের শিক্ষা হইতে আমরা যদি নিজদিগকে বঞ্চিত করিতে না চাই, যে উদ্দেশ্য নিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার অভিলাষ যদি আমাদের থাকে, তাহা হইলে তিনি যে ষট্‌বিধ সংস্কারের স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন আমাদিগকে নিরন্তর তাহা পালন করিতে হইবে। সেই ষট্‌-সংস্কার এই—

(ক) দৈনিক—স্বাধ্যায়

ষট্ কর্ম্মের প্রথম কর্ম্ম হইল স্বাধ্যায় বা গুরু-গ্রন্থ পাঠ। জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহার অনুষ্ঠান ও যত অধিক হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। এই জন্য প্রত্যহই অন্ততঃ একবার গুরুগ্রন্থের কতক অংশ প্রত্যেকের পক্ষেই অবশ্য পঠনীয়।

জাতীয়তা দুই প্রকারের—একটী দেশ প্রেমের উপর অবস্থিত অথবা রাষ্ট্রীয়। দ্বিতীয়টী শাস্ত্র প্রেমের উপর অবস্থিত অথবা ধার্ম্মিক।

যাহারা একই দেশে বাস করেন, পরস্পরের সুবিধার জন্য, আর বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা মিলিয়া একটী সংঘ গঠন করেন, তাহার নাম রাষ্ট্র বা শাসন-তন্ত্র (State)।

আবার ধর্ম্ম গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়াও লোক ভিন্ন ভিন্ন সংঘবদ্ধ হয়। যেমন যাহারা বেদের অনুসরণ করে তাহারা এক সংঘভুক্ত, যাহারা কোরাণের অনুসরণ করে তাহারা এক সংঘভুক্ত, আর যাহারা বাইবেলের অনুসরণ করে তাহারা এক সংঘভুক্ত।

রাষ্ট্রের কাজ হইল লোকের অধিকার (Right) রক্ষা। কোনও একজন লোক যেন এমন কাজ করিতে না পারে যাহাতে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, ইহাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা

প্রভৃতি নিবারণ করাই State এর কর্ত্তব্য। তাহার মূলমন্ত্র হইল (Do not do to others, as you would that they should do to you.) অন্য হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর না, অন্যের প্রতিও সেরূপ ব্যবহার করিও না। ইহা অভাবাত্মক।

অপর পক্ষে শাস্ত্রমূলক সংঘ ভাবাত্মক। তাহা লোককে কর্ত্তব্য (Duty) শিখায়। তাহার মূলমন্ত্র (Do to others as you would that they should do to you.) তুমি অপর হইতে যেমন ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিও।

রাষ্ট্র (State) বলেন চুরি করিও না, শাস্ত্র বলেন দান কর। রাষ্ট্র বলেন হিংসা করিও না, শাস্ত্র বলেন সেবা কর।

রাষ্ট্র সাধারণতঃ সমষ্টিগত কাজ লইয়াই ব্যস্ত। আর শাস্ত্র ব্যষ্টিগত (ব্যক্তিগত) কাজ লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু সমষ্টিগত (সর্ব্ব সাধারণের) কাজও ব্যষ্টি (ব্যক্তির) দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই জন্য ব্যষ্টিকে উন্নত করিতে প্রবৃত্ত হয় যে শাস্ত্র, তাহার মহিমা, রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী।

পরন্তু একদেশে বাস করার দরুণ যে মিলন তাহা অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গ। শাস্ত্রমূলক যে মিলন, উভয়ের আদর্শের ঐক্য আছে বলিয়া, তাহা অন্তরঙ্গ। এই জন্য একদেশবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মিলন অপেক্ষা, ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দু হিন্দুতে, বা ভিন্ন প্রদেশবাসী মুসলমানে মুসলমানে প্রীতি গভীর।

দেশ মূলক সংঘে আর শাস্ত্রমূলক সংঘে অনেক সময় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। "আমি প্রথমে হিন্দু—পরে ভারতবাসী" না আমি "প্রথমে ভারতবাসী—পরে হিন্দু" এই সমস্যার উদয় হয়।

দেশ বলিতে শুধু একখণ্ড মৃত্তিকাকে বুঝায় না। দেশ বলিতে দেশের ইতিহাস, সাহিত্য, কৃষ্টি ও আদর্শকে বুঝায়। ইহারা শাস্ত্র গ্রন্থের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত। কারণ শাস্ত্রই আদর্শ স্থাপন

করে, সেই আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে গিয়াই ইতিহাসের গঠন হয়, আর সাহিত্যে তাহাই লিপিবদ্ধ হয়।

এই জন্য দেশমূলক সংঘ অপেক্ষা শাস্ত্রমূলক সংঘকেই সুধীগণ প্রাধান্য দিয়াছেন। আমি প্রথমে হিন্দু, পরে ভারতবাসী, প্রথমে মুসলমান, পরে ভারতবাসী, ইহাই অধিকাংশ লোকের অন্তরের আশংসা।

কিন্তু যাহাতে দেশমূলক সংঘের সহিত শাস্ত্রমূলক সংঘের সমস্যা সংঘর্ষে পরিণত না হয়, এজন্য তাহারা উভয়ের গণ্ডী পৃথক্ রাখিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন Render unto Caesar the things that are Caesars and unto God, the things that are Gods.

ধর্ম্ম কার্য্য করিতে গিয়া রাজার খাজনা বন্ধ করিও না। উহাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিভিন্ন।

গুরু গোবিন্দ বলিয়াছেন—

বাদ-এ বাবারকে দেও
আপ করে পরমেশ্বর সোউ।
দীন-শাহ-ইনকো পহিচানে
দূনী-পতি উনকো অনুমানে॥

গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

এই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ইহাই নিয়ম, যে রাষ্ট্র কখনও লোকের ধর্ম্ম মতের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান কাহারও ধর্ম্ম পালনে রাষ্ট্রপতি কোনও বাধা জন্মাইবে না, রাষ্ট্রের ইহাই প্রথম কর্ত্তব্য।

অপর পক্ষে ধর্ম্ম সংঘ ও কখন ও রাজ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। রাজাকে আপনার কার্য্য করিয়া যাইতে দিবে। ইহার একটি মাত্র

ব্যতিক্রম আছে। রাষ্ট্র যদি কখনও ধর্ম্ম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, ধর্ম্ম-সংঘ তখন প্রতিবাদ করিবে।

জিজিয়া স্থাপন করিয়া ঔরংজীব হিন্দু প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই জন্য গুরু গোবিন্দ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, গুরু গোবিন্দ ও অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করেন।

দেশ মূলক সংঘের জন্য যেমন একটি দেশ থাকার আবশ্যক, শাস্ত্র মূলক সংঘের জন্য ও একটি শাস্ত্র থাকা আবশ্যক। কথাটা নিছক সত্য, কিন্তু এই দুর্ভাগ্য দেশে তাহাও বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে।

"মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা" বলিলে উপহাস বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হিন্দু ও পার্শীর অবস্থা এইরূপ হইয়াই পড়িয়া ছিল। হিন্দু ও পার্শী শাস্ত্র মূলক সংঘ বটে, কিন্তু ইহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র ছিল না। বেদ ইহাদের সংঘের মূল শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু তাহা নামে মাত্র। প্রথমতঃ বেদের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না—সকলে বেদ পড়িতে পারিত না। যাহা সকল ব্যষ্টির মধ্যে ঐক্য বন্ধনের মূলসূত্র, তাহাতে সকলেরই সমানাধিকার থাকা আবশ্যক। ভিত্তিস্থানীয় শাস্ত্রের উপর মমতা বোধ জাগ্রত না হইলে সংঘের উপর মমতা বোধ কেমনে জাগ্রত হইবে? যে কখনও বেদ কী তাহা চোখে দেখে নাই বা কানে শোনে নাই, তাহার পক্ষে বেদের জন্য আন্তরিক প্রীতি জন্মান অস্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ বেদ যাহারা পড়িতে পারিত তাহাদের পক্ষে ও বেদ পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দৃঢ় ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অবশ্য প্রথম যুগে বেদে প্রবেশের নামই ছিল উপনয়ন (ও নবজাত), আর আহ্নিক সন্ধ্যোপাসনার উদ্দেশ্যই ছিল বেদ মন্ত্রের পাঠ। কিন্তু

পরবর্ত্তী যুগে আহ্নিক সন্ধ্যায় (Daily meditation) অধিকাংশ পৌরাণিক শ্লোক আসিয়াই বেদ মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া লয়। কয়েকটী বেদ মন্ত্র তাহাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে বটে, কিন্তু সমগ্র বেদ পাঠের প্রথা দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিলেই চলে।

বিশেষতঃ বেদের সকল অংশই যে সমান পূজ্য, লোকে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল। কেহ ঋগ্বেদের, কেহ যজুর্ব্বেদের, কেহ সামবেদের প্রশংসা করিতেন। হিন্দুগণ অথর্ব্ববেদের ভার্গব শাখাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, পার্শীগণ ভার্গব শাখা ব্যতীত অন্যান্য সকল বেদই ত্যাগ করিয়াছিল।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সকল বেদের সার সঙ্কলন করিয়া গীতার অমৃতবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে গীতা সর্ব্ব মান্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সামাজিক জীবনে গীতার কোন স্থান হয় নাই। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গীতার জন্য কোনও স্থান নাই। গীতার মন্ত্র পাঠ করিয়া এই সব সংস্কারের অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয় না। সামাজিক জীবনে গীতা প্রতিষ্ঠার ভার নিয়াছিলেন গুরুগোবিন্দ।

দেশ ছাড়া যেমন রাষ্ট্র গঠন হয় না, গ্রন্থছাড়া তেমন ধর্ম্ম চক্র গঠন হয় না। একথা হজরত মহম্মদ যেমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর কোনও পয়গম্বর তেমন করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

সকল মুসলমানের জন্য কোরাণের দ্বার উন্মুক্ত। বাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্ব্বিশেষে সকলেই কোরাণ পড়িতে পারে। সকলে পড়িতে পারে কেবল এমন নহে, সকলের পক্ষেই কোরাণ প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য। আর কোরাণের সকল অংশই সমান সম্মাণের অধিকারী, এজন্য কোরাণের যে কোনও অংশ পড়িয়াই নমাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে।

কিন্তু প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া নমাজ পড়িতে হয় বলিয়া, প্রত্যেক মুসলমানের প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া কোরাণ পাঠ হইয়া থাকে। কোরাণের সহিত প্রত্যেক মুসলমানেরই সাক্ষাত্ পরিচয় আছে। এই জন্য কোরাণকে অবলম্বন করিয়া যে কোনও দেশের যে কোনও মুসলমানই অন্য দেশের যে কোনও মুসলমানের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে পারে।

"অহেল-এ-কিতাব" (লোক— of / এর পুস্তক) "একই পুস্তকের লোক" বলিয়া সকল মুসলমানকে সম্বোধন করিয়া, হজরত মহম্মদ, ধার্ম্মিক সংঘের যোগ সূত্র কি তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোরাণই ইসলামের ভিত্তি ভূমি।

Koran is the great bond of Islam. No matter from what race the convert may have come, no matter what language he may speak, he must learn in Arabic and repeat by rote, portions of the Koran in every act of Public worship—Sell—Faith of Islam—P. 81.

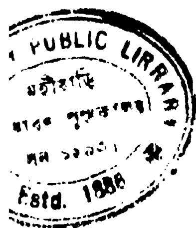
কোরাণই ইসলামের যোগ সূত্র। যে কোনও জাতির লোকই সে হউক না কেন, তাহার মাতৃভাষা যাহাই হউক না কেন, মুসলমান হইলেই, উপাসনার কালে কোরাণের ভাষা আবৃত্তি করিয়াই তাহাকে আরাধনা করিতে হইবে।

The Musalman is not an isolated individual. The Tunesian, the Algerian, the Moroccan, the Sudanese are not individuals whose horizon stops at the artificial boundaries created by diplomatists and geographers. To whatever political formation they may belong, they are first and foremost citizens of

Islam. They belong morally, religiously, intellectually to the great Moslem Father-land of which the Capital is Mecca, and whose ruler—theoretically undisputed is the commander of the faithful. (১)

একজন মুসলমান কখনও একাকী নয়। তুনেসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো বা সুদান যে দেশই তাহার নিবাস স্থল হউক না কেন, তাহার সম্পর্ক কেবল সেই দেশের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ নহে। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমা রেখা সে গ্রাহ্য করে না। দেশ যথায়ই হউক না কেন, সে প্রধানতঃ ইসলামেরই নাগরিক। ধর্ম্ম, নীতি ও সংস্কৃতিতে সে সেই রাজ্যের প্রজা, যাহার রাজধানী মক্কা নগরী আর যাহার রাজা খলিফা।

ধর্ম্ম চক্রে শাস্ত্র গ্রন্থের আবশ্যকতা গুরু গোবিন্দ ও বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থকেই প্রত্যক্ষ গুরুরূপে দর্শন করিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন।



আজ্ঞা ভয়ী অকাল কা
তব চালায়া পন্থ।
সব শিখোঁকা হুকম হৈ
গুরু মানিয়ে গ্রন্থ॥

গীতগোবিন্দ (রহেতনামা)

শিখ মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নাই। গুরু গ্রন্থই সেখানে বিগ্রহের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজিত।

গ্রন্থ শেবকী মানিয়ে
প্রকট গুরুকী দেহ।
যিন কে হৃদ্ শুধ হৈ
খোজ শব্দমে লেহ॥

গীতগোবিন্দ (রহেত নামা)

(১) Andre Servier —— Islam and the Psychology of the Musalman P. 3.

গুরু গ্রন্থের পাঠ প্রত্যেক শিখের প্রাত্যহিক নিত্য কর্ম্ম।

সদ্ গুরু-গিরাঁ,

শিখ নিত পঠে।

সন্তনামকো,

মুখতে রটে।

গীতগোবিন্দ (সূর্য্যপ্রকাশ) (১)

আসুন আমরা গ্রামে গ্রামে গুরুদ্বার স্থাপন করিয়া তাহাতে গ্রন্থ-শেব প্রতিষ্ঠা করি। আর প্রত্যহ গৃহে গৃহে গ্রন্থ-শেব পাঠ করিতে থাকি। তাহা হইলে গুরুগ্রন্থ গীতার সাহায্যে হিন্দু-পার্শী-শিখ-বৌদ্ধ ও জৈন এই পাঁচটী বৈদিক সম্প্রদায় একত্র সম্মিলিত হইয়া জগতে আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

(খ) পাক্ষিক—————দীবান

ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধ্যায়ের স্থান ও আবশ্যকতা মোটামুটি একরূপ স্বীকৃত হইয়াছিল। হিন্দু, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধের তো কথাই নাই, আমার পরিচিত কয়েক জনপার্শী বন্ধুও প্রত্যহ গীতা পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু—অব্যতিক্রমে প্রত্যেকের পক্ষেই ইহা আহ্নিক পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিশেষতঃ সংঘগত জীবনে গীতার কোনও স্থান দেওয়া হয় নাই। সংঘগত জীবনে স্বাধ্যায় গ্রন্থের স্থান প্রতিষ্ঠা করাই গুরুগোবিন্দের প্রধান কার্য্য।

সকলে সম্মিলিত হইয়া একযোগে উপাসনা করিবার প্রথা হিন্দু ও পার্শীগণ একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল। অথচ মিলিত হইয়া

(১) গুরুমত সুধাকর—P. 611.

যৌথ ভাবে একই প্রার্থনা ক্রিয়ায় যোগদ্বারা পরস্পর প্রীতি যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, সংঘ বন্ধন যেরূপ দৃঢ় হয় আর কোনও কার্য্য দ্বারা সেরূপ হইতে পারে না। যৌথপ্রার্থনাকে ধর্ম্ম চক্রের জীবন স্বরূপ বলা যাইতে পারে। গুরু গোবিন্দ সিংহ যৌথ প্রার্থনার প্রবর্ত্তন দ্বারা আর্য্যজাতির দেহে পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

সেমিতিক জাতির ভিতর যৌথ প্রার্থনার প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমানগণ শুক্রবারে, ইহুদিগণ শনিবারে, আর ইসাহিগণ রবিবারে সম্মিলিত হইয়া যৌথ-প্রার্থনা করিয়া থাকে। বার অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যবস্থা আর্য্যগণ সধারণতঃ করেন নাই। রবিবার হইতে শনিবারের কোনও প্রত্যক্ষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। আর্য্যগণ তিথি অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে আর্য্যগণ প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সম্মিলিত হইয়া যৌথ প্রার্থনায় যোগ দিত। এই জন্য সত্রের নাম ছিল দর্শ-পৌর্ণমাসী। দর্শ শব্দের অর্থ অমাবস্যা। তথাগত গৌতমবুদ্ধ সংঘের মহিমা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার শ্রেষ্ঠ বাণী ত্রিশরণ মন্ত্র প্রত্যেক বৌদ্ধ আজও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়া বলে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি"। তিনি সমাবৃত্ত (Periodic) সম্মেলনের প্রথা প্রচলিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমবস্যায় ও পূর্ণিমায় মিলনের নাম তিনি দিয়াছিলেন প্রাতি-মোক্ষ (১) অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান মোক্ষের দিকে মানুষকে লইয়া যায়। গুরুগোবিন্দ ও এই প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত (২)

(১) Winternitz—Indian Literature Vol. II—P. 23.

(২) গির্দ মি আয়েন্দ দর মাহা দুবার।

বহর জিকর এ খাস এ পরবর্দিগার॥

নন্দলাল—জিন্দগী নামা॥

বিশিষ্ট উপাসনার জন্য ইহারা মাসে দুইবার করিয়া সম্মিলিত হয়।

করেন। এই পক্ষান্তিক সম্মিলনের নাম গুরু গোবিন্দ দিয়াছিলেন দেবান অর্থাৎ দেব সভা। ইহাতে যোগ দেওয়া প্রত্যেক শিখের অবশ্য কর্ত্তব্য—না দিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। গুরুগ্রন্থের যে কোনও অংশ সমবেত ভাবে পাঠ করিয়া দিবান ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—গুরু গ্রন্থই যে সংঘের একমাত্র অবলম্বন, তাহা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়। ঋগ্বেদ নিদেশ করিয়াছিলেন,—

সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানী।
সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্॥

ঋগ্বেদ—১০ ১৯১—২

তোমরা একমন ও একপ্রাণে একই সমিতিতে মিলিত হইয়া একই মন্ত্রদ্বারা উপাসনা করিও।

দিবান সমিতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গুরু গোবিন্দ ঋগ্বেদের এই আদেশ প্রতিপালনের নিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আর্যজাতি আবার পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। তান্ত্রিক যুগে প্রচলিত ভৈরব চক্রের মূলেও ছিল যৌথ উপাসনার প্রবর্ত্তনা। গুরু গোবিন্দের ভৈরব চক্রে যাহারা যোগ দিতেন সেই কালান্তক অকালীদের ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া শত্রুর হৃদয়, ভয়ে ও দৈন্যে অবসন্ন হইয়া পড়িত। নব কুরুক্ষেত্রে সিংহ-বিক্রম নব ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি, গুরু গোবিন্দই করিয়াছিলেন। তাহার মূলে ছিল পক্ষান্তিক দিবানোপাসনা। দিবান প্রথা এখন কেবল মাত্র শিখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হিন্দু-পার্শী-বৌদ্ধ-জৈনাত্মক অবশিষ্ট বৈদিক সমাজ ও যদি শিখের সহিত একই দিবানে মিলিত হইয়া, গীতার পাঞ্চজন্য যুক্তকণ্ঠে ও মুক্তকণ্ঠে নিনাদিত করে, তবে সেই তুমুল সিংহনাদে শত্রুর প্রাণস্পন্দন থামিয়া যাইবে। জগতের আধিপত্য আর্য্যের হাতে ফিরিয়া আসিবে। দিবান প্রথার উপযোগিতা যে বুঝিতে পারে না,

সে পশুর ন্যায় মূঢ়, শিশুর ন্যায় অসহায়। গুরুগোবিন্দের বাণী সেই কথাই আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয়।

লাগে— দিবান মূল নাহি যাবৈ
রহেত বিনা প্রসাদ বুতাবৈ !
সুহা পহিন লয় নিশাবার
কহৈ গোবিন্দ সিংহ সে খ্বার ॥ (১)
গীতগোবিন্দ (রহেতনামা)

দিবান আরম্ভ হইলে, যে তাহাতে গিয়া যোগ দেয় না, যে আচার পালে না, কিন্তু প্রসাদ বাটিতে যায়, যে রঙ্গিন পোষাক পড়িয়া নেশা খাইয়া চপলতা করে, গোবিন্দ সিংহ বলেন সে নিরতিশয় জঘন্য।

(গ) মাসিক—দশবন্ধ

দেশপ্রেম মূলক যে সংঘ তাহার নাম রাষ্ট্র (State)। রাষ্ট্র রক্ষার জন্য রাজা কর স্থাপন করেন। পৌরাণিক কালে আয়ের ⅙ ভাগ রাজাকে দিতে হইত। এই জন্য রাজার নাম ছিল ষড়্-ভাগহর্ত্তা। রাজস্ব আদায় ব্যতীত কোনও রাজ্যই চলিতে পারে না।

ধর্ম্ম-চক্রও একটী সংঘ। এই সংঘের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ করের প্রয়োজন। পূর্ব্বকালে পূজা-পার্ব্বণে পুরোহিতকে যে দক্ষিণা দেওয়া হইত, পুরোহিতের ব্যক্তিগত ব্যয় নির্ব্বাহ তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। ধর্ম্ম সংঘের অভ্যুদয়ার্থই সেই ধন ব্যয়িত হইবে, ইহাই ছিল দক্ষিণা প্রদানের উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি এই দক্ষিণ সংঘের জন্য ব্যয় না করিয়া আত্মসাৎ করিত, স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাকে 'দেবল' ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করিয়া পতিত করা হইয়াছে। এই জন্য পূজারি ব্রাহ্মণকে, আজও সমাজ অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করে। নতুবা দেবার্চ্চনার মত পবিত্র কার্য্য যাহারা নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকে হেয় মনে করিবার কি হেতু আছে ?

(১) কুহন সিং—গুরুমত সুধাকর P. 424

কালক্রমে যাহারা দেবস্ব আত্মসাৎ করে, এরূপ দেবলের সংখ্যাই সমাজকে ছাইয়া ফেলিল। সংঘ রক্ষার জন্যই যে দক্ষিণার প্রয়োজন লোকে তাহা ভুলিয়া গেল। হিন্দু ও পার্শী সমাজ হইতে ধর্ম্ম-চক্র এক প্রকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। "শিরো নাস্তি শিরঃ পীড়া" সংঘই ছিল না, কাজেই সংঘের জন্য কোনও ব্যয়েরও প্রয়োজন ছিল না।

গুরু গোবিন্দ সিংহ সংঘের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। আর সংঘের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ করের স্থাপন করেন। এই করের নাম হইল দশবন্ধ। রাজ্যের যাহা কিছু আয় তাহার হিসাব এক কেন্দ্রস্থলে সঙ্কলিত করিতে হয়। আয়ের প্রত্যেকটী পয়সা এই কেন্দ্রিয় হিসাবে জমা পড়িবে, আর ব্যয়ের প্রত্যেকটী কপর্দ্দকও এই কেন্দ্রিয় আফিস হইতে মঞ্জুর হইবে। এই নিয়ম যে অবহেলা করে, সেই রাজ্য দুদিনও টিকিতে পারে না। ধর্ম্ম চক্র সম্বন্ধেও সেই কথা। যে গুরুদ্বারের যাহা কিছু আয়, তাহা যদি সেই গুরুদ্বারের জন্যই ব্যয়িত হয়, কেন্দ্রিয় আফিসে যদি তাহার কোনও হিসাব নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে এইরূপ স্ব স্ব প্রধান সংস্থান দ্বারা ধর্ম্মচক্রের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইয়া থাকে। এই জন্য গুরুগোবিন্দের ব্যবস্থা, প্রত্যেক গুরুদ্বারের যাহা কিছু আয়, তাহা কেন্দ্রিয় অফিস অমৃতসরের অকাল তখ্তে (অকাল সিংহাসনে) জমা দিতে হইবে ; আর যাহা কিছু ব্যয়, তাহার অনুমতি অকাল তখ্ত হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য তিনটী প্রান্তীয় গুরুদ্বার—পূর্ব্বে পাটনা, দক্ষিণে অবিচল নগর (নাঁদের), আর পশ্চিমে কেশগড়, ত্রিকোণ ভারতবর্ষের এই তিনটী প্রধান গুরুদ্বারের মধ্যবর্ত্তিতায় এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আর ইহা সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয় কিনা, তাহা দেখিবার জন্য শিখ-সঙ্গত বর্ত্তমানে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি (১) নামে একটী কার্য্যকারী সভা

(১) Teja Singh—Sikhs and Organisation P. 4.

স্থাপন করিয়াছেন। আশা করা যায় যে গুরুদ্বারগুলির কেন্দ্রী-করণে এখন আর কোনও ত্রুটি থাকিবে না।

দশবন্ধ নিজ নিজ পল্লীস্থ গুরুদ্বারে প্রদান করিতে হয়। পল্লীস্থ গুরুদ্বার তাহা অমৃতসরের অকাল-তখ্তের হিসাবে জমা দিবার ব্যবস্থা করিবে।

যাহার যাহার আয়ের দশমাংশ দেবস্ব-রূপে দিতে হইবে বলিয়াই ইহার নাম দশ-বন্ধ করা হইয়াছে বলিয়া অনেকে বলেন। কেহ কেহ মনে করেন দশজনের নিকট হইতে আদায় হয় বলিয়াই ইহার নাম দশবন্ধ। আয়ের $\frac{১}{৩০}$ অংশ, অর্থাৎ প্রতিমাসে একদিনের আয় গুরুদ্বারে অর্পন করিলেও দশবন্ধ প্রথা প্রচলিত থাকে। সংক্রান্তি দিন তাহার অনুষ্ঠান করিলেই চলে।

হজরত মহম্মদ সংঘের জন্য যে কর স্থাপন করেন তাহার পরিমান আয়ের $\frac{১}{৪০}$ অংশ। ইহার নাম জাকাত। রোজা নমাজ হজ প্রভৃতির ন্যায় মুসলমানের পঞ্চবিধ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে জাকাত ও অন্যতম। সংঘস্থ দুঃস্থ ব্যক্তিগণের ক্লেশ লাঘবার্থ ব্যয়িত হয় বলিয়া ইহাকে বর্ত্তমানে কেহ কেহ Poor-rate বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংঘের শক্তি বৃদ্ধিই দশবন্ধ স্থাপনের যথার্থ উদ্দেশ্য। এই জন্য দশবন্ধ যে দেয়না, গুরু গোবিন্দ তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

দশবন্ধ-এ গুরু নাহি দেবই
ঝুট বোল যো খায়।
কহই গোবিন্দ সিংহ লালজী
তিস্‌কা কুছ ন বিষয়॥ (১)

---

(১) কুহন সিং—গুরুমত সুধাকর P. 426

যে দশবন্ধ দেয় না, আর প্রবঞ্চনা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, গোবিন্দ সিংহের মতে তাহার কোথাও স্থান নাই।

গুরুদ্বারে অর্পণ করিবার জন্য যে পাত্রে দশবন্ধ সঞ্চিত করা হয়, তাহার নাম গোলক। যে ব্যক্তি গোলক পাত্র রাখে না, গোবিন্দ সিংহ তাহাকে নারকী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

গোলক রাখৈ না যো
ছলকা করৈ ব্যাপার।
কহৈ গোবিন্দ সিং লালজী
ভোগে নরক হাজার॥ (১)

যে ব্যক্তি গোলক রাখে না, আর ছল দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, গোবিন্দ সিংহ বলেন হে লালজী (নন্দলাল) সেই ব্যক্তি হাজার নরক ভোগ করে।

(ঘ) ষান্মাসিক—মেলা

প্রত্যেক গ্রামের শিখগণ পক্ষান্তে যাহাতে মিলিত হয় তজ্জন্য গুরু গোবিন্দ দিবানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরন্তু প্রত্যেক দেশের শিখগণও যাহাতে নিয়মিত সময় অন্তে একত্র মিলিত হইতে পারে গুরু গোবিন্দ তাহার জন্য মেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেস, কনফারেন্স প্রভৃতি দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, গুরু গোবিন্দের ব্যবস্থিত মেলা দ্বারাও তাহাই সম্পন্ন হইত। অর্থাৎ সমাজের সম্মুখে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সমাজ বৃদ্ধগণ একত্র মিলিত হইয়া তাহা সমাধানের চেষ্টা করিতেন।

বহুলোকের মিলন স্থল বলিয়া ইহার নাম ছিল মেলা। আবার গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকের মত নিয়া সমস্যার সমাধান করা হইত। (অপিচ গরিষ্ঠ সংখ্যায়ই গুরুর বাস) এই জন্য এই মিলনকে "গুরুমতা" বলিয়াও অভিহিত করা হইত।

---

(১) কুহন সিং—গুরুমত সুধাকর P. 430

গরিষ্ঠ সংখ্যাকের মত গ্রহণের পদ্ধতিও ছিল একটু নূতন রকমের। যত লোক মিলিত হইবে, তাহারা মিলিয়া পাঁচজন প্রধান ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। এই পাঁচজনকে গুরুগোবিন্দের প্রথম পঞ্চ শিখের অনুকরণে বলা হয় "পাঁচ পিয়ারা"—প্রিয়-পঞ্চক। এই প্রিয় পঞ্চকের মধ্যে তিন বা ততোধিক ব্যক্তি যাহা নির্ণয় করিবে, তাহাই সেই মেলার গুরুমতা বলিয়া গৃহীত হইবে।

সমাজ বৃদ্ধদিগের মতামত নিয়া সমস্যা নির্ণয়ের প্রথা আর্য্য সমাজে নূতন নহে। মহারাজা অশোকের সময় বৌদ্ধ-সঙ্গত আহ্বান করিয়া ত্রিপিটকের পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছিল। সম্রাট কনিষ্কের সময় আবার সঙ্গত আহ্বান করিয়া হীনযান ও মহাযানের বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মহারাজা উদয়ের সময় জৈন-সঙ্গত আহ্বান করিয়া দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদের বিবাদের মীমাংসা করা হইয়াছিল। মহারাজ আর্ত্তক্ষত্রের সময় সভা আহুত হইয়া, পার্শী আচার-সূত্র বেন্দিদাদের বিবাদের মীমাংসা করা হইয়াছিল।

সভা আহ্বান করিয়া বিবাদ মীমাংসার প্রথা অতি পুরাতন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। পাঁচজন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা উহা মীমাংসা করিবার সহজ পন্থা গুরু গোবিন্দই প্রবর্ত্তিত করেন—

কাম পরত যো কুছ কভি
করত গুরুমতা মিলকর সভি॥
গীত গোবিন্দ (রহেত নামা)

বিশেষতঃ—নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে এরূপ মেলা মিলাইতে হইবেই এরূপ আবৃত্তির নিয়ম প্রচলিত করাই গুরু গোবিন্দের বিশেষত্ব।

শীত ও গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য যখন নাই, সেই শরতে ও বসন্তেই এরূপ মেলা করিবার বিধান। শরতে দীপালি অমাবস্যা আর বসন্তে দোল পূর্ণিমাই, এরূপ মেলার দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। (১)

(১) Macauliffe—Sikh Religion Vol—1 (Introduction)

স্বাধীনতা শিক্ষা দিবার জন্যই গুরু গোবিন্দ অবতীর্ণ। কোনও ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী থাকা গুরু গোবিন্দের অনভিপ্রেত। সমাজের যাহা কিছু সমস্যা তাহার মীমাংসা নিজদিগকেই করিয়া নিতে হইবে। ইহার ব্যবস্থা করিয়া গুরু গোবিন্দ আর্য্য জাতিকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়াছিলেন।

গুরুমতার আর একটী গৌণ ফল এই যে, স্মৃতির কোনও বিধানকেই শিখগণ চূড়ান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য নন। সমুদ্র যাত্রা সিদ্ধ কিনা, বিধবা বিবাহ প্রশস্ত কিনা, শিখগণ "গুরুমতা" করিয়া তাহা স্থির করিয়া লয়। জাতি-পংক্তি-গোত্র-কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া গুরু গোবিন্দ যেমন শিখগণের অবাধ সঞ্চারের বিঘ্নরাশি দূর করিয়া দিয়াছিলেন, গুরুমতার প্রবর্ত্তন দ্বারা সেইরূপ গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে দেশাচারের অনাবশ্যক বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্যাম দেশীয় রাজার জল আচরণীয় কিনা, বিংশতি সংহিতা ঘাটিয়াও তাহার কোনও নির্দ্দেশ না পাইয়া শিখকে জড়বৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। গুরুমতা দ্বারা সে অক্লেশেই তাহার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া লয়। অপর কোনও ধর্ম্ম তন্ত্রে গুরুমতার মতো গণতন্ত্র-মূলক কোনও ব্যবস্থা নাই। গুরুমতা শিখ গুরুর বিশেষত্ব। গুরু অপেক্ষা অধিক পূজনীয় শিখের নিকট আর কেহই নয়—আবার গরিষ্ঠ সংখ্যক শিখকে গুরুর প্রত্যক্ষরূপ বলিয়া মনে করিতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায়, গুরুমতার প্রবর্ত্তন শিখ পন্থায়ই সম্ভবপর হইয়াছে।

সিং সুরহেত পাঁচ যাহা মিলে
মম স্বরূপ সো দেখো ভলে॥

গীত গোবিন্দ (রহেত নামা)

যেখানে আচার-পরায়ণ পাঁচ জন শিখ উপস্থিত আছে, সেখানে আমিই উপস্থিত আছি জানিবে।

যাহারা বলেন ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে এদেশে Democracy (গাণপত্য) ছিল না, গুরুগোবিন্দের এই আদর্শ পঞ্চায়ত প্রথা দেখিয়া তাহাদের কী বলিবার আছে জানি না।

ইহাকে ধর্ম্মনৈতিক গাণপত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে যাওয়া বৃথা। মহাভারতের যুগেই ক্রুরকর্ম্মা নৃপতি রাজা কংসকে নিধন করিয়া, বাসুদেব গোবিন্দ যাদব বংশে রাজনৈতিক গাণপত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। গণরাজ্যে মন্ত্র গুপ্তির আবশ্যকতা কত অধিক, শান্তি পর্ব্বের ১০৭ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে। শান্তি পর্ব্বের ৮১ তম অধ্যায়ে মহর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে "সংঘমুখ্যোঽসি কেশব" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। গাণপত্যের প্রবর্ত্তক বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম রাখা হয় "পাঞ্চজন্য"। গুরুগোবিন্দ সেই পাঞ্চজন্যই আবার মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

(ঙ) বার্ষিক—তীর্থ যাত্রা

তীর্থ যাত্রার ব্যবস্থা প্রায় সকল ধর্ম্মেই আছে। এক মহাতীর্থে সকলের একত্র মিলন দ্বারা সভ্যগণ স্বীয় সংঘের শক্তি বুঝিতে পারে। দেশ বিদেশ হইতে সমাগত সকলের একত্র অবস্থিতির কী উল্লাস, তাহা যিনি কুম্ভমেলায় গিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। সে উল্লাসের আস্বাদ যিনি পাইয়াছেন, তীর্থ যাত্রার উন্মাদনা তিনি ছাড়িতে পারেন না।

কিন্তু "গুণ না হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়"। অন্যের পক্ষে যাহা শক্তি বৃদ্ধির হেতু, হিন্দুর নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহাই তাহার বলক্ষয়ের যন্ত্রে পরিণত হয়।

হজ তীর্থস্থলে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে একত্রিত দেখিয়া নিজেদের সংখ্যা-বাহুল্য প্রত্যক্ষ করিয়া মুসলমান দ্বিগুণ উৎসাহ লইয়া ফিরিয়া আসে।

অপরপক্ষে হিন্দুর তীর্থস্থল ও একটী নহে, আর একটী নির্দ্দিষ্ট কালে তথায় যাইবার দৃঢ় ব্যবস্থাও নাই। ফলে হিন্দুর পক্ষে তীর্থযাত্রা বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে ব্যক্তির ক্লেশ হয়, সমষ্টির বিশেষ কোনও লাভ হয় না।

এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য গুরুগোবিন্দ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যে এক অমৃতসরেই সকল তীর্থের সমাবেশ। অমৃতসরের অমৃত সরোবরে স্নান করিলে সকল তীর্থ গমনের ফল লাভ করা যায়। আর নির্দ্দিষ্ট দিনে—বিজয়া দশমীর দিনে—তথায় সকলের সমবেত হইবার দিন। অমৃতসরই নিখিল বিশ্বের মহামানবের মিলনক্ষেত্র।

সকল মানবের ঐক্য সম্পাদনের জন্যই শিখ সংঘের প্রতিষ্ঠা। যে কেহই বৈশ্বানরযজ্ঞ অনুষ্ঠানের অভিলাষী সেই শিখ-সংঘে যোগদান করিবে। শিখ-পন্থা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক ইহাই প্রত্যেক শিখের আন্তরিক কামনা। কাবুল কান্দাহার মদিনা মক্কা ইরাণ তুরাণ সকলই শিখের করায়ত্ত হইবে ইহাই নানকের ভবিষ্যদ্বাণী। (১)

কবে আমরা দেখিব যে অমৃতসরের হরিমন্দির কেবল আর্য্যজাতির মিলন ক্ষেত্র না হইয়া, সমগ্র মানব জাতির মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আর সেই মহামিলনের প্রধান ঋত্বিক্ গুরু গোবিন্দের চরণ কমল ধ্যান করিয়া শান্তি ও শক্তি আহরণ করিব।

প্রত্যেক দেশের শিখগণ যান্মাসিক মেলায় মিলিত হইয়া নিজেদের সমস্যার সমাধান করুক, আর পৃথিবীর সকল দেশের শিখগণই বিজয়া দশমীর দিন (২) অমৃতসরের পবিত্র তীর্থে মিলিত হইয়া শিখ সংঘের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকুক।

(১) Cunningham—History of the Sikhs—P. 467
(২) Cunningham—History of the Sikhs—P. 150

(চ) আজীবন—পাহুল

গুরু গোবিন্দ কর্ত্তৃক বিহিত ষষ্ঠ কর্ত্তব্যের নাম পাহুল বা শুদ্ধি। প্রত্যেক শিখের কর্ত্তব্য জীবনে অন্ততঃ একটী অশিখকে শুদ্ধিদ্বারা শিখ-সংঘে প্রবিষ্ট করিয়া লওয়া। আর যত বেশী লোককে পাহুল প্রদান করিতে পারা যায় তাহাই মঙ্গল।

খণ্ডে কী পাহুল জিসৈ
সো শস্ত্রোকী ধার।
করে জীবকা আপনি
প্রারব্ধ অনুসার॥

গীতগোবিন্দ (রহেত নামা)

খড়্গের ধার যেমন যত বাড়াও তাহাই ভাল, শুদ্ধির অনুষ্ঠানও তেমনই যত বাড়াও তাই ভাল।

নিষ্কাশন সংঘের পক্ষে যক্ষ্মা রোগ সদৃশ। যাহার কেবল ব্যয় আছে আয় নাই, সে যেমন দুদিনেই দেউলিয়া হয়, যে দেহযন্ত্র খাদ্য হইতে পুষ্টি আহরণ করিতে পারে না, তাহার মৃত্যু যেমন অনিবার্য্য, সেইরূপ যে সংঘ কেবল বর্জ্জন করিতে জানে গ্রহণ করিতে জানেনা, তাহার অন্তিম সময় নিকটবর্ত্তী। হিন্দু ও পার্শী সমাজ-ব্যূহ হইতে লোক বাহির হইয়া যাইতে পারিত নূতন লোক ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত না। অনিচ্ছাকৃত কোনও ত্রুটির জন্য, কিম্বা বল প্রয়োগে বাধ্য হইয়া যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, সে অথবা তাহার সন্তান সন্ততিগণ, নিতান্ত আগ্রহান্বিত থাকিলেও, হিন্দু পার্শী সমাজের দ্বার চিরদিনের জন্য তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ থাকিত। এই আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে গুরু গোবিন্দই আর্য্য-জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

পাহুল দ্বারা তিনি যে কেবল ধর্ম্মান্তরিত দিগকেই ফিরাইয়া আনিতেন তাহাই নহে। যাহারা আজন্ম খৃষ্টান অথবা মুসলমান

অথচ বৈদিক সংঘে যোগ দিতে যাহাদের আগ্রহ আছে, তাহাদিগকে ও পাহুলদ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে গুরুগোবিন্দের আজ্ঞা ছিল।

মুসলমান হুয়ে ভাক্ষ ধরৈ
মিলনপন্থমে যো হিত করৈ।
তৌ ইহ উচিত খালসে বীচ
পাহুল লহৈ উচ কি নীচ্॥

গীতগোবিন্দ (সূর্য্য প্রকাশ)

মুসলমান হইলে ও যে ব্যক্তির শিখ পন্থার উপর শ্রদ্ধা আছে, সে উচ্চ হউক নীচ হউক, তাহাকে পাহুল দিয়া সংঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে।

পাহুল-সংস্কারের ভূরি প্রয়োগদ্বারা শিখ-সংঘ অমিত বল লাভ করিতে পারিয়াছিল। পাহুল সংস্কারকে সাধারণতঃ শিখগণ অমৃত-সংস্কার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃই মৃতপ্রায় আর্য্য-সমাজকে পুনর্জ্জীবনদানে ইহা অমৃতের ন্যায়ই কার্য্য করিয়াছিল।

যাহাতে পাহুল সংস্কারের বহুল প্রচার হয়, এই জন্য পাহুলদানের বিধান ও গুরু গোবিন্দ অত্যন্ত সহজ করিয়াছিলেন।

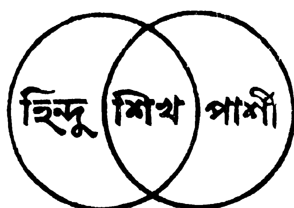
পাঁচজন শিখ একত্র মিলিয়া একটী পাত্রে জল রাখিয়া তাহার মধ্যে একটী খণ্ডা (দ্বিধার খড়্গ) লইয়া পরমগুরুর (বাহিগুরুর) নাম স্মরণ পূর্ব্বক দীক্ষার্থীর মস্তকে ও অঙ্গে সেই জল ছিটাইয়া দিলেই পাহুলক্রিয়া সম্পন্ন হইল। যে কোনও পাঁচ জন শিখই মিলিত হইয়া পাহুল প্রদান করিতে পারে। তজ্জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন নাই—ব্রতনিয়ম পুরশ্চরণ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

এক দিকে দীক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি সহজ করিয়া দিয়া, অপর দিকে অন্ততঃ একজন অশিখকে দীক্ষা প্রদান প্রত্যেক শিখের পক্ষেই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, গুরু গোবিন্দ শিখ-তন্ত্র বিস্তারের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শিখ-পন্থা জগৎময় ছড়াইয়া পড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। খ্রীষ্ট পন্থা কেবল মিশনরি ছাড়া আর কেহ প্রচার

করে না। কিন্তু ইসলাম তন্ত্র প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানই নিজ কর্ত্তব্য মনে করে। এই জন্য আফ্রিকা মহাদেশে প্রচার কার্য্যে খ্রীষ্ট পন্থা ইসলামের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। (১) "পাহুল প্রদান যত বেশী পারা যায়, তাহা প্রত্যেক শিখেরই কর্ত্তব্য" গুরু গোবিন্দ স্পষ্ট ভাষায় এই আদেশ জানাইয়া দিয়া, ইসলাম অপেক্ষাও অধিক প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

গুরু গোবিন্দের তিরোধান হইতে সার্দ্ধ-দ্বিশত বৎসরও অতীত হয় নাই। শিখ তন্ত্রের আশানুরূপ প্রসার না দেখিয়া বিষণ্ণ হইবার কারণ নাই। শিখের গৌরবের দিন সকলই এখনও সম্মুখে।

শুদ্ধি প্রথা হিন্দু শাস্ত্রের ও পার্শী শাস্ত্রের অনুমোদিত কিনা, তাহা লইয়া হিন্দু ও পার্শী সমাজে প্রবল বাদানুবাদ চলিতেছে ; অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। তাহাদের এ বাদ প্রতিবাদের প্রয়োজন নাই। শুদ্ধির ভার তাহারা শিখদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। একবার শিখ হইয়া বৈদিক চক্রের গণ্ডীর ভিতর যে আসিয়া পড়িয়াছে, গো-গঙ্গা-গায়ত্রীর উপর শ্রদ্ধা যাহার জন্মিয়াছে, বেদের মহাভাষ্য ভগবদ্‌গীতা যাহার স্বাধ্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে পরে হিন্দু অথবা পার্শী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কোনও আপত্তির কথা উঠিতেই পারিবে না। হিন্দু ও পার্শী রূপ দুইটী পূর্ণ বৃত্তের প্রত্যেকটীরই অর্দ্ধাংশ লইয়া শিখ চক্র গঠিত।



হিন্দুর সহিত শিখের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া কলাপ চলিতে পারে, ও চলিত আছে। (২) শিখ গণের বিবাহাদি অনুষ্ঠানে

(১) Stoddard—The Rising tide of Colour-P 65.
(২) (i) Govinda Das—Hindu Ethics-P. 30
(ii) Khalsa Review-7th. November, 1935.—P. 29.
(iii) Griffin—Ranjit Singh—P. 65

পুরোহিতের কার্য্য অনেক সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতই নিষ্পন্ন করিয়া থাকে (১)। অতএব হিন্দু হইতে শিখ হওয়া, বা শিখ হইতে হিন্দু হওয়া, শৈবের পক্ষে শাক্ত হওয়া, অথবা শাক্তের পক্ষে শৈব হওয়ার মত নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র। তাহাতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত অদ্ভুত কিছুই নাই। একই পরিবারে এক ভ্রাতা শিখ ও অন্য ভ্রাতা হিন্দু থাকিতে পারে। উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন। এই জন্য হিন্দুর রক্ষাও শিখের কর্ত্তব্য বলিয়াই গুরু নির্দেশ করিয়াছেন।

রাখহু অব হিন্দুকী টেক।
নহি জগমহি রহৈ ন এক॥

বিচিত্র নাটক

এখন হিন্দুকে টিকাইয়া রাখ। নতুবা জগতে একজন ও হিন্দু থাকিবেনা। পার্শীর সহিত অভিন্নতা তো আর ও স্পষ্ট !

গুরু কহে ও জেন্দ হৈ যোই।
বন ইয়ে হৈ হামারা শিখ তোই॥

রহেত নামা।

গুরু কহেন, যিনি পার্শী তিনি তো শিখই বনিয়াছেন।

হিন্দু, পার্শী ও শিখের এই রূপ সাম্যতা দেখিয়াই বোধ হয় ঔরংজীবের ন্যায় কপট মুসলমান এই তিনকে সমান বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন। শাহনামাতে পার্শী রাজা-বাদশাহের গৌরব কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সুলতান মামুদ কবি ফেরদৌসিকে হস্তিপদতলে বিচূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। গাথার উপদিষ্ট সুফিবাদের ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া হাফেজের কাব্য পাঠ করিতে ঔরংজীব (ও ইকবাল) নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যায় যে পাহুল গ্রহণ দ্বারা প্রথম শিখ হইলে পর, হিন্দু ও পার্শী সংঘে প্রবেশের পথে আর কোনও বাধাই থাকে না।

---

(১) Macauliffe—Sikh Religion Vol. 1 (Introduction)

অতএব পাহুলকে কেবল শিখ সংঘে প্রবেশের দ্বার মনে না করিয়া, হিন্দু ও পার্শী সংঘে প্রবেশের সিংহদ্বারও মনে করা যাইতে পারে। পাহুলের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া পুরুষ সিংহ গুরু গোবিন্দ হিরণ্যাক্ষের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, হিরণ্য লোলুপ দানবের বেদহিংসার শক্তি বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন।

গুরু গোবিন্দের আদর্শ ছিল জগৎময় শিখ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন।

যাহা তাহা তুম ধরম বিথারো
দুষ্ট দুঃখিয়ান কো পাকড় পাছাড়ো॥
গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

তুমি সর্ব্বত্র ধর্ম্ম বিস্তার করিতে থাক। দুঃশীল পীড়ক দিগকে ধরিয়া আছাড় দাও।

পাহুলের প্রবর্ত্তন দ্বারা অন্তিম পয়গম্বর গোবিন্দসিংহ, লোক সংগ্রহের স্বপ্ন, সফল করিবার পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন। এই প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া আমরা যেন কুপথে না যাই।

"মহান্ দাশরথঃ পন্থাঃ।
মা পার্থ কুপথং গমঃ॥"
পঞ্চদশী গীতা-৪-১০৯

সকলেরই একই স্বাধ্যায় পাঠ, একই গুরুদ্বারে উপাসনা, একই দীবানে মিলন, আয়ের নির্দিষ্ট অংশ একই উদ্দেশ্যে ব্যয়, গুরুমতা দ্বারা একই সমস্যার সমাধান, একই সময়ে একই তীর্থে ঐক্যালিঙ্গন দ্বারা সংঘ শক্তি এরূপ বিপুল বর্দ্ধিত হইবে, যে শিখ জগতে অজেয় হইয়া থাকিবে।

হজরত মহম্মদ মানবজাতির ঐক্য সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিলেন আর্য্যকে অনার্য্য করিয়া, আর গুরু গোবিন্দ চাহিয়াছিলেন অনার্য্যকে আর্য্য করিয়া। গ্রন্থ-গুরু বেদ, আর গুরু-গ্রন্থ গীতার সমাবেশ বশতঃ আর্য্য সাধনা যদি শ্রেষ্ঠ সাধনা হইয়া থাকে, তবে গুরু গোবিন্দের

চেষ্টাও শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা। বিশেষতঃ ইসলাম তন্ত্রে হিন্দু পার্শীর স্থান নাই। শিখ তন্ত্র আরবীয় কৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নাই।

হিন্দু পার্শী সম্মেলনের চেষ্টার প্রতীকই গুরু গোবিন্দের লৌহো-পবীত (কড়া-বলয়)। হিন্দুর উপবীত স্কন্ধে থাকে, পার্শীর উপবীত থাকে কটিতে। এই দ্বিবিধ যজ্ঞ সূত্রই উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। বীরশ্রেষ্ঠ গুরু গোবিন্দ পটের অন্তরালে উপবীত ধারণ করিতে চাহিলেন না। আয়সোপবীত প্রকাশ্য ভাবে মণিবন্ধে ধারণ করিতে হয়। হিন্দুর যজ্ঞোপবীত কার্পাস সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত, পার্শীর যজ্ঞোপবীত উর্ণা দ্বারা নির্ম্মিত। ঔরংজীবের অনুচরগণ সহজেই তাহা ছিড়িয়া ফেলিতে পারে। গুরুগোবিন্দ বিধান দিলেন লৌহসূত্রের উপবীত ধারণ করিতে। মনিবন্ধে আয়স বলয় (১) প্রত্যেক শিখের অবশ্য ধারণীয়।

সঞ্চরণের সুবিধার জন্য কচ্ছ পরিধান। আর শক্তিমত্তার প্রতীক স্বরূপ কৃপাণ ধারণও প্রত্যেক শিখেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কঙ্কণ, কচ্ছ ও কৃপাণ প্রত্যেক শিখের আবশ্যক ভূষণ—কড়া, কৃপাণ ও কচ্ছ দ্বারা শিখকে চিনিতে পারা যায়।

অশৌচকালে ক্ষৌর কর্ম্ম হয় না। আর পরাধীন জাতি নিত্য অশুচি (২)। এই জন্য অপদস্থ অবস্থায় কেশ ধারণ করিয়া স্বীয় অবস্থার কথা সর্ব্বদা মনে জাগ্রত রাখা ও গুরুগোবিন্দের অভিপ্রেত। যাহারা কেশ ধারণ করে, তাহাদিগকে কেশধারী শিখ বলে। কেশ আচড়াইবার জন্য তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কও রাখিয়া থাকে।

---

(১) সাধারণতঃ লৌহ বলয়ই শিখগণ ধারণ করেন। কিন্তু ধাতু নির্ম্মিত উপবীতই গুরু গোবিন্দের অভিপ্রেত মনে হয়। তাহার প্রিয় শিষ্য অকালীগণ পিত্তল বলয় ধারণ করে। (শরৎ চন্দ্র রায়—শিখ গুরু ও শিখ জাতি—P. 79)

(২) তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরু গোবিন্দ সিংহ—P. 253.

যাহারা কেশ ধারণ করে না, তাহাদিগকে সহজধারী শিখ বলে। তাহারা কঙ্কণ (কড়া), কচ্ছ ও কৃপাণ ধারণ করে।

আয়সোপবীত ধারী শিখ, হিন্দু ও পার্শীর সমন্বয় দ্বারা, আর্য্য জাতিকে আবার গৌরবের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

আয়া হুকম অকালদা
হাত বান্ধা গাণা।
মঁয় পান্থ কর খালসা
বিচ দোহ জাহানা॥

গীতগোবিন্দ

অকালের হুকুম আসিয়াছে। এই দুই জগতের মধ্যে (হিন্দু জগত্ ও পার্শী জগত্) আমি নির্ম্মলপন্থা রূপ সেতু স্থাপন করিয়া, সখ্য সূত্রে উহাদের হাত বাঁধিয়া দিলাম।

তিনটী মহা গ্রন্থকে আর্য্য সভ্যতার মূলগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। তাহারা বেদ, মহাভারত ও গ্রন্থশেব। বেদ আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি ভূমি। মহাভারতে উহার বিকাশ; আর গ্রন্থশেবে উহার পরিণতি। মহাভারতের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের গীতা, আর গ্রন্থশেবের চূড়ামণি গোবিন্দ সিংহের গীত-গোবিন্দ। বেদের সার সংগ্রহ করিয়া গীতা রচিত হইয়াছিল। আর সামাজিক জীবনে গীতার প্রয়োগের জন্য গীত গোবিন্দম্ রচিত হইয়াছিল। গীতার শিক্ষা হইতে গরিষ্ঠ ফল লাভ করাই গুরুগোবিন্দের কৃতিত্ব।

বেদ, মহাভারত ও গ্রন্থশেব এই তিনটী পুস্তকের অনন্য সাধারণ বিশেষত্ব আছে। বেদ জগতের আদিম গ্রন্থ—মানবের সর্ব্বপ্রথম চিন্তাধারার পরিচয়। মহাভারতের মত বিপুল গ্রন্থ জগতে আর নাই। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের Encyclopœdia—বিশ্বকোষ। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, মহাভারতে না পাওয়া যায়, এমন কোনও তত্ত্বই নাই। "যা নাই ভারতে তা

নাই ভারতে।" এত বিপুলতা সত্বেও নায়ক নায়িকাগণের প্রত্যেকটীর চরিত্রের বিশেষত্ব মহাভারতে এমন সুষ্ঠু রক্ষিত হইয়াছে, যে বিংশ শতাব্দীর ফরাসী ছোট গল্পও এবিষয়ে উহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই (১)। গ্রন্থশেবও শাস্ত্রগ্রন্থের এক নূতন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। একজন মাত্র গ্রন্থকারের রচিত পুস্তক ইহা নহে। বেদের ন্যায় ইহাতে বহুতর তত্ত্বদর্শী ঋষির রচনার সংগ্রহ আছে। জ্ঞানদেব, জয়দেব, কবীর, প্রভৃতি যে সমস্ত ভক্তগণের বাণী ইহাতে সংগৃহীত আছে, তাহাদের মধ্যে কেহই পয়গম্বর নহেন। এই জন্য কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন যে গ্রন্থশেবের গুরুত্ব, পলগ্রেভের Golden Treasury অথবা চয়নিকার অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। গ্রন্থশেবে কেবল আধ্যাত্মিক পদাবলী সংগৃহীত আছে বলিয়াই যে ইহার গুরুত্বের দাবী করা হইতেছে এমন নয়। যিনি এই পদাবলী সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাদিষ্ট অবস্থায়ই ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আদেশ অনুযায়ী ইহার একটী মাত্র বর্ণও পরিবর্ত্তন করা অপেক্ষা, গ্রন্থশেবের গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করাই গুরু অর্জ্জুন গরীয়ান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। (২) গ্রন্থশেব বোধ হয় ভবিষ্যৎ যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুস্তকের আদর্শ স্বরূপ। একটী মাত্র পুস্তককে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া দাবী করিলে এই যুগে আর সে কথা কেহ শুনিবে না। বরং প্রত্যাদিষ্ট অবস্থায় অনেক গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া যে পুস্তক রচনা করা যায়, তাহাকে প্রত্যাদিষ্ট পুস্তক বলিয়া লোকে মানিতে পারে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে, প্রত্যেক ভাষা হইতেই গ্রন্থশেবের পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছিল। বাংলা, মারাঠা, গুজরাট কেহই বাদ যায়

(১) Vaidya Mahabharata—a criticism

(২) (i) প্রবাসী—১৩৪১ অগ্রহায়ণ P. 174 (ক্ষিতিমোহন সেন)

(ii) গুরু অর্জ্জুনের সংগ্রহ গুরু গোবিন্দ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

নাই। (১) এমন কি ইসলাম পন্থী শেখ ফরিদ ও ভিকনের পদাবলী ও গ্রন্থশেবে সংগৃহীত করিয়া গুরু অর্জ্জুন সপ্তদশ শতাব্দীতেই Theosophical Societyর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বেদের সার উপনিষদ্। মহাভারতের সার গীতা। আর গ্রন্থশেবের সার গীত-গোবিন্দ। উপনিষেদের দৃষ্টি অতীতের দিকে, গ্রন্থশেবের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে; গীতা উভয়ের সংযোগ সেতু। বেদ ও গীতার ন্যায় গীত-গোবিন্দম্ ও যে আমাদের পরম আদরের ধন, তাহা কেবল সেই বুঝিতে পারে না, জাতি-গঠনের চিন্তা যাহার মনে কখনও স্থান পায় নাই।

কেহ কেহ মনে করেন শিখ পন্থা অবৈদিক। তাহা ভুল; বেদের প্রতিবাদের জন্য গ্রন্থশেব রচিত হয় নাই, বেদের সমর্থনের জন্যই রচিত হইয়াছিল। এই জন্য গুরু নানক সম্বন্ধে গুরু গোবিন্দ বলিয়াছেন—

জিনৈ বেদ পড়িও
সো বেদী কহায়ে।
তিনৈ ধরম কে করম
নিজে চলায়ে॥

গীত গোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

যেহেতু তিনি বেদে অভিজ্ঞ ছিলেন এই জন্য তাঁহার (গুরু নানকের) উপাধি ছিল "বেদী।" এই জন্য তিনি স্বয়ং ধর্ম্মের সংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই গ্রন্থশেবের মূলমন্ত্র "এক ওঁ সত্‌নাম।" এই মূলমন্ত্র স্মরণ করিয়াই গ্রন্থশেবের আরম্ভ, আর এই মূল মন্ত্রই শিখদের সকল ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।

(১) Macauliffe—Sikh Religion Vol 1. Introduction—

S. B. G.

প্রাচীন পন্থায় প্রণবের উচ্চারণে জন সাধারণের অধিকার ছিল না। গুরু নানক জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রণবের অধিকারী করিয়াছিলেন।

বেদের মূলমন্ত্র ওঁ কার। এই ওঁ কারকে সর্ব্বসাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত করিবার তাৎপর্য্য, বেদকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা। এই দৃষ্টিতে দেখিলে নানক দেবকে স্বামী দয়ানন্দের অগ্রণী বলিয়া বলা যাইতে পারে।

নানকদেব শিখ সমাজ স্থাপন করেন। আর সেই শিখ সমাজকে সিংহ-সঙ্ঘে পরিণত করেন গুরু গোবিন্দ। কেবল এই একটী মাত্র কার্য্যই তাঁহাকে জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। (১)

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যোগেশ্বর গোবিন্দ ক্লৈব্য পরিত্যাগ করাইয়া অর্জ্জুনকে ক্ষাত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই লীলার পুণরভিনয় করিয়া গুরু গোবিন্দ সিংহ নব কুরুক্ষেত্রে সহস্র সহস্র মানবকে ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন—নূতন ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিলেন। গুরু গোবিন্দের এমনই মহিমা যে মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিখগণের শরীরাবয়বেরও আশ্চর্য্য বিকাশ দেখা গেল। (২)

পঞ্জাবী ক্ষত্রিয় বা জাঠের কথা ছাড়িয়াই দিলাম; যে পাঁচজন শিখকে গুরুগোবিন্দ প্রথম পাহুল প্রদান করেন, শিষ্যত্ব গ্রহণের দক্ষিণা স্বরূপ স্বীয় মস্তক গুরুচরণে নিবেদন করিয়া যাঁহারা গুরুগোবিন্দের অগ্নি-মন্ত্রের দীক্ষা সার্থক করিয়াছিলেন, যে শিষ্য-পঞ্চককে গুরু গোবিন্দ সর্ব্ব প্রথম সিংহ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন,

(১) Vaswani——In the Sikh Sanctuary—P. 30.

(২) A living spirit possesses the whole Sikh people and the impress of Govinda has not only elevated and altered the constitution of their minds, but has operated materially and given amplitude to their physical forms. Cunningham--History of the Sikhs—P. 123.

সংঘ-মিত্র যাহারা ইতিহাসে "পাঁচ পিয়ারা" নামে বিখ্যাত, তাহাদের মধ্যে তিন জন, না ছিলেন ক্ষত্রিয়, না ছিলেন পঞ্চনদের অধিবাসী।(১) ভাই হুকমচাঁদ ছিলেন দ্বারকার (গুজরাত) একজন ধোবা, সাহেব চাঁদ ছিলেন বিদরের (বেরার) একজন নাপিত, আর হিম্মৎ রায় ছিলেন পুরীর (উড়িষ্যা) একজন কুমার। (২) গুজরাট বা উড়িষ্যার বীরত্বের খ্যাতি নাই। আর ধোবা নাপিত কুমার তো হিন্দু সমাজের অবজ্ঞার পাত্র। ইহারাই হইলেন প্রথম শিখ। ইহাদেরই সন্তান সন্ততির সিংহ গর্জ্জনে পাঠানের হৃদয় কম্পিত হইয়াছে, জার্ম্মানীর অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে। (৩) বঙ্গদেশে মাতা যেমন বর্গীর ভয় দেখাইয়া দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়ায়, আফগাণ মাতা শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে আজও বলিয়া থাকে "হরি সিংহ নালুয়া আসিতেছে।" (৪)

গীতার উপদেশ গুরু গোবিন্দেই সফল হইয়াছে। গুরু গোবিন্দ সিংহই শ্রেষ্ঠ শিখ—শ্রীকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য।

হাফেজের ভাষায় বলা যাইতে পারে গুরুগোবিন্দ অপেক্ষা অনুগত সেবক শ্রীকৃষ্ণের আর কেহই নাই।

কস্ দর জাহান না দারদ
এক বন্দা হাম চুঁ হাফিজ।
জিরা কি চুঁ তু শাহী
কস্ দর জাহান না দারদ ॥

হাফেজ

(১) Kartar Singh—Life of Guru Govinda Singh—P 111.

(২) বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরুগোবিন্দ সিংহ—P 41

(৩) (i) The Gurudwara Reform movement (Desa Sevak Book Ageney)

(ii) বেনীপ্রসাদ—গুরুগোবিন্দ সিংহ (হিন্দী)—187.

(৪) (i) Latif—History of the Panjab—P. 483.

(ii) নন্দকুমার দেবশর্ম্মা—শিখোঁকা উত্থান ঔর পতন—P 143.

এই পৃথিবীতে হাফেজের মত অনুচর আর কাহারওই নাই। কেন না তোমার মত রাজ্যশ্রী ও এই পৃথিবীতে আর কাহারও নাই।

শ্রীকৃষ্ণই শিষ্যের উপযুক্ত গুরু। আর গোবিন্দ সিংহই গুরুর উপযুক্ত শিষ্য।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যজনক উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গুরু গোবিন্দ বলিয়াছেন—

তেঘোঁ হি বল কৃষ্ণ লৈ
কংস কেশী পাকড় গিরায়।
বড়ে বড়ে মুনি দেবতে
কোই যুগ তিন্ হি তান তায়া॥
গীতগোবিন্দ (ভগবতকী বার)

শ্রীকৃষ্ণ তরবারির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কংস কেশীকে ধরিয়া আছড়াইয়াছিলেন। যুগ যুগ ধরিয়া মুনি দেবতাগণ তাঁহারই সঙ্গীত (গীতা) গান করিয়া আসিতেছে।

বেদের যাহা অভিপ্রায়, গীতার যাহা শিক্ষা, গুরু গোবিন্দ তাহা অবহেলা করেন নাই, বরং উহাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

He came to fulfil and not to destroy. তিনি আর্য্য তন্ত্রকে পরিপূর্ণতা দিতে আসিয়াছিলেন, উচ্ছেদ করিতে আসেন নাই।

বেদ, গীতা ও গীতগোবিন্দ এই তিনটী গ্রন্থই আর্য্যতন্ত্রের প্রস্থান ত্রয়। আনুষ্ঠানিক জীবনে বেদ, ব্যক্তিগত জীবনে গীতার স্থান। গীত গোবিন্দ, উহাদেরই প্রয়োগ শিক্ষা দিবে। দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়া কাণ্ডে আমরা বেদের (ও পৃশ্নি-গাথাত্মক অথর্ব্ববেদের) মন্ত্র ব্যবহার করিব। গীতা হইতে আমাদের জীবনের আদর্শ কি তাহা ঠিক করিয়া লইব। প্রত্যহ তাহা স্মরণ করিব। আর আমাদের সামাজিক জীবন কেমনে গঠন করিব, গীতগোবিন্দ

আমাদিগকে সেই কথা বলিয়া দিবে। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে বেদমন্ত্র, সায়াহ্ণে গীতা, - আর মধ্যাহ্ণে গীতগোবিন্দ পাঠ করিয়া আমরা আর্য্যতন্ত্রের প্রস্থান ত্রয়ের সহিত সংযোগ রাখিতে চেষ্টা করিব।

সুবিশাল আর্য্যজাতি বহু বহু ধর্ম্মবীরের অবদানে পবিত্রীকৃত। কিন্তু তন্মধ্যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আর সংঘধর গুরু গোবিন্দ সিংহই— আর্য্য সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে সময়োপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিয়া ছিলেন। ধর্ম্মজীবনের সমগ্র রূপ আর কেহই দেখেন নাই—সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আর কেহ লক্ষ্য করেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আমরা রাজা রামমোহন রায়ের মহিমা গান করিয়া থাকি। কিন্তু গুরু গোবিন্দের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্যের সদ্ভাব তাহাতে আছে কি? বিশেষতঃ প্রেরিত গ্রন্থই যে দেশাতিগ জাতীয়তার ভিত্তি ভূমি, একমাত্র প্রেরিত গ্রন্থের আশ্রয়েই যে ব্যষ্টিগণ সমষ্টিগত ঐক্যের আস্বাদ লাভ করিতে পারে, রাজা রামমোহন তাহা লক্ষ্য করেন নাই। তাই ব্রাহ্ম সমাজে ঐক্য বন্ধন তেমন দৃঢ় নয়। আর কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধ্যেই ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ সীমাবদ্ধ। কেতাব পড়া বাবুদিগকে ছাড়াইয়া জাতির প্রাণে, জন সাধারণের প্রাণে তাহা স্পন্দন জাগাইতে পারে নাই।

স্বামী দয়ানন্দ এই ত্রুটি পরিহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার দৃষ্টি কেবল বেদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। গীতায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বেদ বিষয়ে যে প্রসিদ্ধ সমালোচনা আছে—

যাবানর্থ উদপানে
সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু
ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥
গীতা—২—৪৬

"বেদ মানুষের জন্য ; মানুষ বেদের জন্য নয়। 'মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় কি না' এই লক্ষণ দ্বারাই যে বেদের ব্যাখ্যার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি নির্ণয় করিতে হইবে," স্বামী দয়ানন্দ তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। এইজন্য নিয়োগ প্রথার বিশদীকরণে, তাঁহাকে সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছে। অপর দিকে গুরুগোবিন্দ সিংহ "গুরুমতা" সংস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া, বেদব্যাখ্যা বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট পন্থারই অনুসরণ ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন।

ভক্তি যোগের পরাকোটিতে অধিরূঢ় দুইজন মহাপুরুষের তুলনা আর নাই—মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য, আর প্রভুপ্রিয় রামকৃষ্ণ। প্রেমের সম্বেগে আত্মহারা হইয়া, বিশ্বজগত ভুলিয়া গিয়া ইহারা নিরন্তর বিশ্বনাথের সঙ্গসুখেই কালাতিপাত করিতেন। ভক্তির তীব্রতায় (Intensity) কৃষ্ণচৈতন্য অনুত্তর। মাধুর্য্য রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ একমাত্র তাহাতেই দেখা যায়। ভক্তির বিস্তারে (Extensity) রামকৃষ্ণ অনুত্তম। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভক্তি রসেরই তিনি আরাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণচৈতন্য ও রামকৃষ্ণ সমাজ সংগঠনে শক্তি নিয়োগ করেন নাই। ব্রহ্মার সৃষ্টি-শক্তি, বিষ্ণুর পালন-শক্তি আর শিবের সংহার-শক্তি একমাত্র গুরু গোবিন্দেই সমাবিষ্ট হইয়াছিল।

আবার হিন্দু ও পার্শীর মিলন গুরু গোবিন্দই নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল পারসীক কৃষ্টির আশয় (Spirit) নিরাকারোপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন নয়। পারসীক পোষাক দুকুল (পায়জামা) ও চণ্ডাতক (কচ্ছ) ও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড গোবিন্দ সিংহের রচিত। ইহা "দশম পাতশাহকা গ্রন্থ" বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ইহার কতক অংশ (জাফরনামা) পারসীক ভাষায় রচিত। আর্য্য পিতামহদের মূল ভাষার অন্যতর শাখা পারসীকে, গুরুগোবিন্দ কালাতীত রুদ্রের অনুগ্রহ বর্ণনা করিতেছেন।

কি উরা গরুর আস্ত
বর মুল্ক ও মাল।
ও মারা পনাহ্ আস্ত
ইয়াজদান অকাল॥

গুরুগোবিন্দ—জাফর নামা।

ঔরংজীব মাল ও মুলুক লইয়া ব্যস্ত। আর যজনীয় অকালই আমার আশ্রয়।

শিখের মত একটী শক্তিশালী সংঘকে হিন্দু মনে করিবার আগ্রহে অনেক হিন্দু উল্লসিত হন। আর শিখেরা যখন বলে "আমরা হিন্দু নই" তখন হয় বিরক্তিতে তাহাদিগের সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করেন; নতুবা তাহাদের অস্বীকার সত্ত্বেও শিখদিগকে হিন্দু প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পরেন। তাহার ফলে, শিখেরা আরও জোর করিয়া বলিতে বাধ্য হয় যে আমরা হিন্দু নই। দৌলত রায় প্রণীত গুরু গোবিন্দের জীবন চরিত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সরদার করতার সিংহ লিখিয়াছেন "গুরুগোবিন্দকে হিন্দু বলিয়া প্রমাণ করা অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মাত্র"। (১)

গুরুগোবিন্দ যে হিন্দু নন, শিখেরা যে বৈষ্ণব, শাক্ত, রামানুজী, বা রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের মতো হিন্দুতন্ত্রেরই আর একটী শাখান্তর মাত্র নহে, সে কথাটা খুবই সত্য। হিন্দু ও পার্শী এই উভয় শাখার সম্মেলনের জন্যই গুরু গোবিন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব তাঁহাকে শুধু হিন্দু বলিয়া গণ্য করিলে, পার্শী প্রভাব অস্বীকার করার দরুণ কথাটা তেমনই মিথ্যা হয়, যেমন পায়জামা পরিহিত দেখিয়া তাঁহাকে শুধু পার্শী বলিয়া গণ্য করিলে, তাহার হিন্দু সংশ্রব অস্বীকার করার দরুণ মিথ্যা বলা হয়। গুরু গোবিন্দ হিন্দু ও পার্শী, অথর্ব্ব বেদের এই উভয় শাখার কৃষ্টির সম্যক সংমিশ্রণের ফল। অতএব তাঁহাকে শুধু হিন্দু

(১) Kartar Singh—Life of Guru Govinda Singh—P. 286

বলা, অথবা শুধু পার্শী বলা চলে না, তাঁহাকে হিন্দু ও পার্শী দুইই বলিতে হয়। তিনি বৈদিক সাধনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি—শুধু হিন্দুও নহেন, শুধু পার্শীও নহেন. তিনি হিন্দু-পার্শী ও পার্শী-হিন্দু।

অবশ্য শিখদের মধ্যেও কেহ কেহ গুরুগোবিন্দকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে গুরুদ্বারে দেব মূর্ত্তি রক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর জাতিভেদের প্রথাও অলক্ষ্যে শিখ সমাজে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল (১)। কোনও কোনও হিন্দুর নিকট, ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু পার্শীর নিকট এই প্রথাগুলি ক্লেশকর। আর এই প্রথাগুলির অবশ্যম্ভাবি পরিণাম, শিখ সংঘকেও হিন্দু সমাজের ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিয়া দুর্ব্বল করা। গুরু গোবিন্দের সাধনাকে ব্যর্থ করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা বলবৎ উপায় আর কিছুই নাই। যাহারা, শিখেরা "হিন্দু নই" বলিলেই ব্যথিত হ'ন, তাহারা ভাবিয়া দেখিবেন যে শিখ-সংঘের বৈশিষ্ট্য রক্ষা দ্বারাই হিন্দু সমাজ লাভবান হইতে পারে, শিখের বৈশিষ্ট্য লোপ দ্বারা নহে। শিখদিগকে আরও কয়েক জন হিন্দু বলিয়া ধরিয়া লইলে, হিন্দুর সংখ্যা সাময়িক কিছু বাড়িতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য যদি শিখের বৈশিষ্ট্য লোপ পায়, শিখ যদি অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো নিশ্চল হইয়া পড়ে, তবে তাহাতে পরিণামে হিন্দুরই ক্ষতি। শিখসংঘেই আর্য্যজাতির প্রাণশক্তি, বৈদিক ধর্ম্মচক্রের বিকাশের বীজ নিহিত আছে। বৈশিষ্ট্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে, বিকাশের প্রেরণার অভাবে, শিখ-সংঘও হিন্দু ও পার্শী সমাজের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে—বৈদিক সংঘের প্রাণ দীপ নির্ব্বাপিত হইবে। (২)

(১) (i) Macauliffe – Sikh Religion Vol.—1 (Introduction)
(ii) Farquhar—Modern Religious Movements in India P. 340.

(২) Macnicol – Indian Theism P. 136.

সুখের বিষয়, সিংহ-সভা, অকালী-আন্দোলন, শিরোমণি-গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি প্রভৃতি সংস্থা যথা সময়েই শিখের বৈশিষ্ট্য রক্ষায় ব্রতী হইয়াছেন। (১)

শিখ সংঘকে বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলাতে যাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, তাহাদের বিবেচনার জন্য রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত হইতে দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। "ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার অনেক মহোদয় আমার 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বক্তৃতার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ডাক্তার বক্তৃতা হইবার কিছুদিন পরে আমাকে বলিয়াছিলেন যে 'তুমি যখন বলিলে যে ঋগ্বেদের হিন্দু ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন আকার হইলেও তাহা এক' আমি মনে করিলাম ইহা অতি অসম্ভব কথা। কিন্তু যখন তুমি বলিলে যে 'বালক রামচন্দ্র ও প্রৌঢ় রামচন্দ্র ভিন্ন আকার হইলেও একই রামচন্দ্র' তখন আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম।" (২)

প্রকৃত পক্ষে হিন্দুতন্ত্র ও শিখতন্ত্রের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। শিখের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ক্রিয়া ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। (৩) যৌথ উপাসনায় যোগদান ও সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা এই দুইটী বিষয় বাদ দিলে, একজন নির্ম্মলা শিখ ও একজন গোড়া হিন্দুর মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। (৪) শিখ ও হিন্দুগণ পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকে। (৫)

---

(১) The Gurudwara Reform Movement (The Desh Sevak Book Agency) P. 163.

(২) রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত P. 87.

(৩) Macauliffe—Sikh Religion, Vol—I, P—LVII (Introduction) S. B. E. Series.

(৪) i) Wilson—Essays on the Religion of the Hindus Vol—II, P. 142

(ii) Macnicol—Indian Theism—P. 154

(৫) Govinda Das—Hindu Ethics—P. 30

শিখগণ দীপালি ও হোলি পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। (১) অতএব যাহারা বলেন যে শিখগণ "গোবধ ও ত্বক্‌চ্ছেদ বিহীন মুসলমান" (২) তাহারা পল্লবগ্রাহী, কেবল শ্মশ্রু-কেশ দেখিয়া বিচার করেন। তাহাদের অন্তর্দৃষ্টিও প্রখর নহে, শিখ সাহিত্যের সহিতও তাহাদের পরিচয় নাই।

শিখ সাহিত্য তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের ধর্ম্মতন্ত্রের ইতিহাসও তাহারা অভিনিবেশসহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

গুরু নানক শিখ সমাজ স্থাপন করেন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা কবীরের অনেক বাণী গুরুগ্রন্থে সংগৃহীত আছে। অতএব নানকদেবকে ছাড়িয়া প্রথমতঃ মহাত্মা কবীরের কথাই ধরা যাউক। অনেকে বলেন যে কবীর জাতিতে মুসলমান (জোলা) ছিলেন। আর তিনি হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটী ধর্ম্মতন্ত্রকে একত্র মিলাইতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু কবীরের উপর ইসলামের প্রভাব নাম মাত্র ছিল বলিলেই হয়। তিনি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ রামানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার ইষ্ট মন্ত্র ছিল "রাম"। তদুপরি কর্ম্মফল ও জন্মান্তরে স্থির বিশ্বাস থাকায় কবীরের উপর ইসলামের প্রভাব নাই বলিলেও চলে। (৩)

এই তো গেল কবীরের কথা। নানক তো হিন্দু-তন্ত্রের আরও নিকটবর্ত্তী। তাহার মূল মন্ত্র "এক ওঁ সত্ নাম" বেদেরই অনুবাচন। নানক মূর্ত্তি পূজা পরিহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুর দেবতা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। (৪)

(১) Macauliffe—Sikh Religion. Vol. II—P. 79
(২) (i) Raja Gopal Chariar—The Vaishnava Reforms of India P. 118.
(ii) Vaswani—In the Sikh Sanctuary—P. 84.
(৩) Farquhar—Out lines of Religious Literature P. 333
(৪) (i) Farquhar—Religious Literature of India—P. 337
(ii) Macnicol—Indian Theism P. 149

গুরু গোবিন্দ তো হিন্দু তন্ত্রের দিকে আরও একপদ অগ্রসর হইয়া চণ্ডীর স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। (১)

গুরু গোবিন্দই শিখ সংঘের নিয়ন্তা। উহার বর্ত্তমান রূপ গুরু গোবিন্দই দিয়াছেন। অতএব যাহারা শিখতন্ত্রে ইসলামের প্রভাব দেখিতে পান, তাহাদের দৃষ্টি শক্তির প্রশংসা করিতে পারা যায় না।

অবশ্য শিখ হিন্দু নহে। শিখতন্ত্রের এমন অনেক উপাদান আছে (যেমন মূর্ত্তি পূজার বিরোধ) যাহা হিন্দুর সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু অহিন্দু বলিয়াই তাহা অবৈদিক নহে। মঘবান জরথুস্ত্রের আশীর্ব্বাদে ভার্গব বেদের সহিত পরিচয় যাহার ঘটিয়াছে, তিনিই জানেন, যে আঙ্গিরস বেদই অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব নহে; ভার্গব বেদও তাহার অঙ্গ। বেদে শুধু দেব পূজার বিধান আছে এমন নয়, অসুর পূজার বিধানও বেদে আছে। অতএব অহিন্দু হইলেই অবৈদিক হইবে এমন মনে করা অসঙ্গত।

শিখ সঙ্গতের যে সমস্ত আচার অহিন্দু, তাহা নানক দেব ভার্গব বেদ হইতে আহরণ করিয়াছিলেন। এই জন্য মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছিলেন, যে গুরু নানক স্বয়ং খিজির হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২)

মুসলমান পৌরাণিকগণ মঘবান জরথুস্ত্রকেই খিজির নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। খিজির শব্দের অর্থ চির-সবুজ, চির-জীবন্ত। সংস্কৃত ভাষার 'হ'কার, জেন্দে 'জ' কারে পরিণত হয়। যেমন অহম্—অজেম্ (আমি), বাহু—বাজু (হাত)। অতএব জেন্দের 'জরত্' শব্দটী সংস্কৃতের 'হরিত্' শব্দকে মনে করাইয়া দেওয়া অস্বাভাবিক নয়।

(১) Farquhar—Outlines of Religious Literature P. 339

(২) Cunningham—The History of the Sikhs—P. 56.

উষ্ট্র শব্দের অর্থ আভা বা কিরণ। ইহা উষা শব্দের সহিত সম্পৃক্ত। জরথুস্ত্র (জরত্ + উস্ত্র) শব্দের অর্থ যাহার আভা হরিত (সবুজ)। অতএব জরথুস্ত্র ও খিজির একার্থক শব্দ। জরথুস্ত্র ইরাণের পয়গম্বর। সমস্ত সূফীগণ খিজির দ্বারাই অনুপ্রাণিত হ'ন বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। (১) সূফী আন্দোলন পারস্য দেশেই জন্মলাভ করিয়াছিল। পারস্যের সম্পর্কে আসিবার পূর্ব্বে, জরথুস্ত্রের অনুপ্রাণনার পূর্ব্বে, ইসলামে সূফীবাদের উদ্ভব হয় নাই। আর পারসীক সিয়া সম্প্রদায়েই খিজিরের বেশী আদর। তাহারই উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদের নবাবগণ আজও প্রতিবৎসর ভাদ্র মাসে বেরা পার্ব্বর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

কোরাণ ও ধর্ম্মগুরু খিজির সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে ইহুদিতন্ত্র প্রবর্ত্তক মহাত্মা মুসা হজরত খিজির হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) বিনা রূপকে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে হজরত মুসা জারথুস্ত্র তন্ত্রের অনুকরণেই ইহুদীপন্থা রচনা করিয়াছিলেন। হজরত মহম্মদ আবার ইহুদী পন্থাকে সংস্কার করিয়াই, ইসলামের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

সেমিতিক বংশীয় মুসা ও মহম্মদের পক্ষে যদি মঘবান জরথুস্ত্রের অনুকরণ করা সম্ভবপর হইয়া থাকে, তবে আর্য্যবংশীয় গুরু নানকের পক্ষে মঘবান জরথুস্ত্রের অনুসরণ আরও স্বাভাবিক। শিখ-তন্ত্রে জারথুস্ত্র পন্থার প্রভাব না দেখিয়া, ইসলামের প্রভাব যাহারা অনুমান করেন, তাহারা ময়-সভায় দুর্য্যোধনের ন্যায়, কাচখণ্ডে জলের আশঙ্কা দ্বারা প্রতারিত হন।

বিশেষতঃ যদিও গুরু নানক পুরাণ ও কোরাণ এক, বারবার এই কথা বলিয়া মুসলমান কৃষ্টির প্রতি মৈত্রী ভাব প্রদর্শন

(১) Browne—Literary History of Persia—Vol II P. 498

(২) কোরান— সুরা—18—65

করিয়াছেন, কিন্তু কতিপয় ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে পরবর্ত্তীকালে শিখগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। আহাম্মদ শাহ আবদালি বিজয় গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া, শিখ-চক্রের কেন্দ্র স্বরূপ অমৃতসরের হরিমন্দির অপবিত্র করিয়াছিলেন। তথায় গোবধ করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরের প্রকাণ্ড মন্দির চূর্ণ করিয়া ভগ্নাবশেষের উপর ঔরংজীব মসজিদ নির্ম্মাণ করিলে পর আত্মপ্রত্যয়হীন হিন্দুরা নিজদিগকে নিরুপায় মনে করিয়া সেই মসজিদের পাশে ছোট করিয়া একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। শত্রুর অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবার পাত্র শিখ নয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ আফগান সৈন্যদ্বারা শূকর বধ করাইয়া সেই রক্তে মন্দির ধৌত করিয়া তাহারা হরিমন্দির শোধন করিয়া লইয়াছিল। (১) আজও নিহং শাখার শিখগণ উষ্ণীষের মধ্যে একটি বরাহ দন্ত গুজিয়া রাখে। মুসলমান স্পৃষ্ট কোনও খাদ্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বরাহদন্ত ছোয়াইয়া ঐ খাদ্য শুদ্ধ করিয়া লয়। (২) অকালীরা অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, মুসলমানের ডাকনমাজ শুনিলেই তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিত। (৩) অতএব শিখকে ইসলামভাবাপন্ন মনে করিবার কোনও কারণ বেদপন্থীর নাই।

অবশ্য সামাজিক সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া মানুষকে শুধু মানুষ বলিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ইসলামে যেমন, শিখ সঙ্গতেও তেমনই প্রবল।

---

(১) Cunning ham--History of the Sikhs—P, 149.

(২) বিনয়কৃষ্ণ সেন—হিন্দুসংগঠন-P. 27.

(৩) (i) শরত্‌চন্দ্র রায়– শিখগুরু ও শিখজাতি P. 121.

(ii) Griffin—Ranjit Sing P. 136.

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

মহাবীর কর্ণ অশ্বত্থামাকে বলিয়াছিলেন—

সূতো বা সূতপুত্রোবা
যো বো স্যো বা ভবাম্যহম্
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম
মদায়ত্তং পৌরষম্ ॥
বেণীসংহার।

আমি সূতই হই, আর সূত পুত্রই হই, আমি যে বা সেই হই না কেন, তাহাতে কি আসে যায়? পৌরুষই আমার আয়ত্ত! তাহাদ্বারাই আমার বিচার করিও।

কর্ণের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া শিখও বলিতে পারে—

সম্পদ্ সাহস, সঙ্গী তরবার,
সমুদ্র বাহন নক্ষত্র কাণ্ডারী।
ভরসা কেবল শক্তি আপনার
শয্যা রণক্ষেত্র গুরু ত্রাণকারী॥

গোত্র কুল জাতির সকল গরিমা চূর্ণ করিয়া, কেবল নিজের শক্তির উপর ভরসা রাখিবার যে শিক্ষা ইসলাম দিয়া থাকে, ব্যক্তিগত শক্তির পূর্ণতম বিকাশের পক্ষে ইসলাম যে কোন ও বাধা দেয় না—জন্মতঃ কলু বলিয়া শাস্ত্র চর্চ্চায় কাহাকেও বাধা দেয় না, জন্মতঃ তাতী বলিয়া শস্ত্র চর্চ্চায় কাহাকেও বঞ্চিত করে না, ক্রীতদাসের পুত্র বলিয়া কাহারও সিংহাসনের অধিরোহণের পথ বন্ধ রাখে না, ইহার ফলে মুসলমান সমাজ বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ সামাজিক ভেদ দ্বন্দ্ব একরূপ গ্রাহ্য করেনা বলিয়া মুসলমানের জগন্ময় অবাধ সঞ্চারের কোনও প্রতিবন্ধক নাই।

বিবাহের জন্য তাহাকে গোত্রকুলের বিচার করিতে হয় না, খাদ্য গ্রহণের পূর্ব্বে পাচকের পিতৃকুলের সন্ধান নিতে হয় না, পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য তাহাকে পুরোহিতের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয় না। প্রসারের

কোনও বাধা না থাকায় জলে নিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দুর ন্যায় ইসলাম মুহূর্ত্তেই চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বাড়ীর কাছে বর্ম্মাদেশের বৌদ্ধদের সহিত হিন্দুর কত নিকট সম্বন্ধ। কিন্তু তথার অধিবাসী হিন্দু একজনও মিলে না। আর চট্টগ্রামের অসংখ্য মুসলমান বর্ম্মায় গিয়া বর্ম্মী বিবাহ করিয়া বর্ম্মী মুসলমানে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। হিন্দুদের মধ্যে নমঃশূদ্র কৃষিজীবি; মুসলমান অপেক্ষা তাহারা অধিক কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু পদ্মায় নূতন চর পড়িলে একমাসের ভিতর তাহাতে দুই সহস্র মুসলমান গিয়া ঘর বান্ধে, নমঃশূদ্র একজনও যায় না। ধোপা, নাপিত, পুরোহিত, বৈবাহিক স্বঘর, কোথায় পাইবে তাহাই ইতস্ততঃ করিতে থাকে। (১) মুসলমানের মতো শিখও কোনও বাধা বিঘ্ন মানে না, তাই সে বিশ্বজয়ী শক্তিলাভ করিয়াছে।

তাই বলিয়া মুসলমানের অনুকরণে শিখ সংগ গঠিত হইয়াছে এরূপ অনুমানের হেতু নাই। লিঙ্গায়েত বা বীর-শৈব সম্প্রদায় মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত। তাহারা ভক্তিযোগের পথিক, কিন্তু মূর্ত্তি পূজার বিরোধী। জাতিভেদ তাহারা মানে না, সকল বর্ণের লোক এক সঙ্গে আহার করে। তাহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। (২) শিখ-সঙ্গত এই বীর শৈব সম্প্রদায়েরই উত্তরাধিকারী।

তবে বীর-শৈবগণ নিরামিষাশী। গুরু হর-গোবিন্দের সময় হইতেই আমিষগ্রহণের প্রথা শিখ সমাজে প্রচলিত হইতেছিল। বৈরাগী বান্দার আশ্রমে ছাগ বলি দিয়া গুরুগোবিন্দ এই প্রথা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। (৩) বীর-শৈব

(১) বিনয় কৃষ্ণ সেন—হিন্দু সংগঠন P. 71

(২) (i) Farquhar—Outline of Religious History. P. 263.

(ii) Macnicol - Indian Theism P. 179.

(৩) Kartar Singh—Life of Guru Govinda Singha.—P. 244

পথ ও তান্ত্রিক-পথের সংযোগ দ্বারা গুরু গোবিন্দ অমোঘ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাই স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

সপ্তশৃঙ্গ তিহ নাম কহাবা।
পাণ্ডুরাজ যহি যোগ কমাবা॥
তহি হাম অধিক তপস্য সাধী।
মহাকাল কালিকা আরাধী॥

গীত গোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

পাণ্ডুরাজ যেখানে যোগ সাধন করিয়াছিলেন, আমিও সেই সপ্ত শৃঙ্গ পর্ব্বতে মহাকাল কালিকার তপস্যা করিয়াছি।

লিঙ্গায়েত ও তান্ত্রিক অর্থাৎ শৈব ও শাক্ত মতের সম্মিলন ও বিকাশ দ্বারাই গুরু গোবিন্দ শিখ-সঙ্গত গঠন করিয়াছিলেন। মহানির্ব্বান তন্ত্রে যে ভেদহীন পঞ্চম বর্ণের (সামান্য) কথা বর্ণিত আছে, শিখ সমাজই সেই পঞ্চম বর্ণ।

চত্বারঃ কথিতাঃ বর্ণাঃ
আশ্রমা অপি সুব্রতে।
কৃতাদৌ কলিকালেতু
বর্ণা পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

মহানির্ব্বান তন্ত্র ৮-৪

কলিযুগে চারিটী বর্ণস্থলে পাঁচটী বর্ণ প্রবর্ত্তিত হইবে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ বৈশ্যঃ
শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূত সংস্কারে
পঞ্চানাম্ অধিকারিতা॥

মহানির্ব্বান তন্ত্র ৮-২২৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য এই পাঁচটী বর্ণই, কৌল সংস্কারের অধিকারি। এই সামান্যগণ (Democrats) ব্রাহ্মণের

ন্যায় শাস্ত্র-চর্চ্চা, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শস্ত্র-চর্চ্চা আর বৈশ্যের ন্যায় কৃষি-চর্চ্চা করিবে।

সামান্যানাং তু বর্ণানাং
বিপ্রবৃত্তি অন্যবৃত্তিষু।
অধিকারোঽস্তিদেবেশি
দেহ যাত্রা প্রসিদ্ধয়ে॥

মহানির্ব্বান তন্ত্র ৮-১১৩

সকলেই চক্রোপাসনায় সমবেত হইবে।

তত্বচক্রং চক্ররাজং
দিব্য চক্রং তদুচ্যতে।
সত্য সংকল্পকা ব্রাহ্মা
এবাত্রাধিকারিণঃ॥

মহানির্ব্বান তন্ত্র ৮ ২০৬

ইহাতে বর্ণভেদ কুলভেদ নাই।

যে কুর্ব্বন্তি নরাঃ মূঢ়াঃ
দিব্য চক্রে প্রমাদতঃ।
কুলভেদং বর্ণভেদং
তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥

মহানির্ব্বান তন্ত্র ৮-২১৯

রুচিভেদে মূর্ত্তি ভেদ দ্বারা গৃহ বিবাদের আশঙ্কা নাই।

ন ঘটস্থাপনাত্রাদি
ন বাহুল্যেন পূজনম্।
সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবেন
সাধয়েৎ তত্ত্বসাধনম্॥

মহানির্ব্বান তন্ত্র ৮-২১০

চক্রোপাসনার ফল শতগুণ সমধিক।

পুরশ্চর্য্যা শতেনাপি
শবমুণ্ডচিতাসনাৎ।
চক্র মধ্যে সকৃৎ জপ্তা
তৎ ফলং লভতে সুধীঃ॥

মহানির্ব্বান তন্ত্র ৮-১১৯

আর ইহারা নিরন্তর শুদ্ধি ক্রিয়ায় তৎপর থাকিবে—

শতভিষেকাৎ যতপুণ্যং
পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি।
তস্মাৎ কোটি গুণং পুণ্যং
একস্মিন্ কৌলিকেকৃতে॥

মহানির্ব্বান তন্ত্র—১৪-১৮৭

শত অভিষেকের যে পুণ্য, শত পুরশ্চর্য্যার যে পুণ্য, এক জনকে আর্য্যকুলে আনয়ন করিবার পুণ্য তাহা অপেক্ষা কোটিগুণে অধিক।

তন্ত্রে যে আদর্শ কল্পনায় অবস্থিত, শিল্পী গুরুগোবিন্দ তাহাকেই রূপ দিয়াছেন, জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। তিনি পৈতৃক ধন খাটাইয়া বাড়াইয়াছেন, ঋণের জন্য পরের নিকট হাত পাতেন নাই।

পঞ্জাবের মন্ত্রী ডাক্তার স্যার গোকুল চাঁদ নিরঙ্গের Transformation of Sikhism নামক পুস্তক বিশ্ববিখ্যাত। এই পুস্তক লিখিয়া তিনি Bern বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ph. D. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন "যেমন কোনও প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইলে লোকে অস্ত্রাগার হইতে সকল পুরাতন অস্ত্র বাহির করিয়া লয়, মুসলমান আক্রমনের প্রতিরোধ জন্য শিখ-সমাজও তাহাই করিয়াছে, আর্য্য জাতির যাহা কিছু

হিতকর বলকর প্রথা, তাহা একত্র করিয়া পরিষ্কার করিয়াছে। অস্ত্র তাহার নিজেরই, মুসলমান আক্রমনের ফলে তাহা বাহিরে আনা হইয়াছে, এই মাত্র। মুসলমান হইতে তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। হিন্দু সমাজ লৌহ স্বরূপ, শিখ গুরুগণ তাহাকে ইস্পাতে পরিণত করেন, আর গুরু গোবিন্দ ঐ ইস্পাত দ্বারা তরবারি বানাইয়াছেন।" (১)

বোধ হয় এই কথা স্মরণ করিয়াই কোনও কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে ইসলামের প্রভাব হিন্দু সমাজকে স্পর্শ করে নাই—বলিলেই চলে। ইসলাম হিন্দু সমাজের কোনও আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সমর্থ হয় নাই। (২)

অপর পক্ষে মুসলমান সমাজের উপর হিন্দু প্রভাব সম্বন্ধে একজন মুসলমান লেখক লিখিয়াছেন যে অনেকের পক্ষে হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইবার গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল—Nothing pleases them more than when they are mistaken for Hindus. [Muslim Review—March 1932, P. 7.]

রক্তহীনতা বশতঃ আর্য্যজাতি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। গুরুগোবিন্দ তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন। এ যে কত কঠিন কার্য্য, যথার্থ জাতীয়তা যাহার হৃদয়ে আছে, কেবল তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন।(৩)

যুগ যুগান্তের জড়তা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজ আবার দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছে, গুরু গোবিন্দ তাহাদের নেতা। (৪)

(১) Nirang—Transformation of Sikhism. P.1.

(২) (i) Farguhar—Outline of Religious Literature. P. 2.
(iii) McKenzie—Hindu Ethics P. 181.

(৩) বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - গুরুগোবিন্দ সিংহ P. 71

(৪) Macauliffe—Sikh Religion—Vol. I (Introduction.)

উপযুক্ত সেনা পাইলে তাহা পরিচালনা করিবার জন্য সেনাপতি বহু না হউক কতক মিলে। কিন্তু যিনি সমাজের হীণ শ্রেণিকে সৈনিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, কামার কুমারকে ক্ষত্রিয়ে পরিণত করিতে পারেন, সেরূপ সেনাপতি গুরু গোবিন্দ ছাড়া আর কেহ হয় নাই। (১)

কেহ কেহ হিন্দু সমাজকে একটি বিরাট অষ্টাপদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহার গণ্ডীর ভিতরে যে আসিয়া পড়ে তাহার আর নিস্তার নাই। তাহার সমস্ত রক্ত চুষিয়া লইয়া, হিন্দু সমাজ আপনার পুষ্টি সাধন করে, আর জীর্ণাবশিষ্ট কঙ্কাল গুলিকে ফেলিয়া দেয়। (২) তাতার, চীন, দ্রাবিড়, হূন, সৌবীর কত বিচিত্র গোষ্ঠীই স্বতন্ত্রতা হারাইয়া এই বিরাট সমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে।

তাহারা বলেন ইসলাম-কৃষ্টিকে কবলিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই শিখ-আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গুরু গোবিন্দ এই আন্দোলনের নেতা—এই খানেই তাহার অবতারত্ব।

হিন্দু, পার্শী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, সকলকে ইসলাম পরাজিত করিয়াছে। একবার ইসলামের সরল সহজ স্বচ্ছন্দ গতির আস্বাদ পাইলে আর কেহ আচার বাহুল্যের সহস্র বন্ধনের অধিকারে ফিরিয়া আসিতে চায় না। (৩) কিন্তু শিখ-সঙ্গত ইসলামকে পরাজিত করিয়াছে। পুরাতনের ইন্দ্রিয়-সংযমের সহিত, নবীনের স্বচ্ছন্দ-গতির যোগ ঘটাইয়াছে, ধর্ম্মনীতির ও রাজনীতির বিচ্ছেদ দূর করিয়া মনুষ্যজীবনকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। একমাত্র শিখ-তন্ত্রই

(১) Macauliffe - Sikh Religion — Vol. V — P. 100.

(২) (i) Vincent Smith—History of India — P. 368.

(ii) Macauliffe—Sikh Religion, Vol—I (Introduction)

(৩) Stoddard — The Rising Tide of Colour — P. 65.

ইসলামের গতি প্রতিহত করিতে সমর্থ—কারণ ইসলামের গতি প্রতিহত করিবার জন্যই তাহার উদ্ভব। ইসলামের কোন অংশ গুরুগোবিন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা দেখিলেই চলিবেনা, বরং কোন অংশ তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাই বেশী লক্ষণীয়।

কিন্তু তাই বলিয়া গুরু গোবিন্দ মুসলমানের উচ্ছেদ কামনা করিতেন, এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক। তিনি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। পর পীড়নের জন্য নহে। প্রথমতঃ "নিজের প্রতি যে ব্যবহার চাও, অন্যের প্রতিও সেই ব্যবহার করিও" (সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি) জীবনের এই মূলমন্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করা মনুষ্যত্বের হানিকারক বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

যা কউ ছুট গয়ে ভ্রম উরকা।
তিহ আগে হিন্দু কিয়া তুরকা॥

গীতগোবিন্দ (চৌবিশ অবতার)

যাহার হৃদয়ের ভ্রান্তি নিরস্ত হইয়াছে তাহার নিকট হিন্দু ও তুর্কের পার্থক্য কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে যাহাদিগকে একই দেশে বাস করিতে হইবে, তাহাদিগকে একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিতে হয়। তাহারা যদি পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ আত্ম কলহে শক্তির অপব্যয় করে, তবে এরূপে শক্তির অপব্যয় যাহাদের হয় না এরূপ একটী তৃতীয় পক্ষের অধীনতায় তাহাদিগকে চিরদিন কাটাইতে হইবে। একই পরিবারের অধীনে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে যেমন পরিবারস্থ অপর কাহারও অন্যায় আব্দারও সময় সময় সহ্য করিতে হয়, নতুবা পরিবার বন্ধন শিথিল হইয়া পরিণামে তাহাকেই দুর্ব্বল অসহায় করিয়া ফেলে, সেইরূপ একই দেশে, একই রাষ্ট্রে বাস করে বলিয়া হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর প্রীতি রক্ষা করিয়া চলা উচিত। নতুবা

হিন্দুস্থানের রাষ্ট্র কখনই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না। তাই গুরু গোবিন্দ বাহাদুর শাহকে বলিয়াছিলেন

খায়ে খাওয়ায়, হাসে, দোনো কের।
দেয় উপদেশ যথা হিত হের॥ (১)

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরেরটা খাইবে ও খাওয়াইবে। মিলিয়া মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আর পরস্পরের যথাহিত উপদেশ দিবে। এই ধারণারই পুনরাবৃত্তি করিয়া মহাত্মা গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকে মুসলমানের সকল সর্ত্ত মানিয়া লইয়া শাদা কাগজে সহি করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। উভয়কেই বলশালী করিয়া গুরুগোবিন্দ হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন।

একই দেশে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানাবিধ সম্প্রদায়ের বাস। উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকাই স্বাভাবিক। সেই কিন্তু প্রতিযোগিতা যাহাতে ঈর্ষা-কলুষিত হইয়া শত্রুতায় পরিণত না হয়, একে অপরের অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষা না করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সমাজ-পতিদের কর্ত্তব্য। এবিষয়ে বীরবলের দৃষ্টান্ত বেশ শিক্ষাপ্রদ। কথিত আছে সম্রাট আকবর একদিন ভূমিতে একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া সভাসদদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "এই রেখাটীকে স্পর্শ না করিয়া, ছোট করিয়া দিতে পার কি?" সকলেই চিন্তা করিতে লাগিল "ইহার কতক অংশ মুছিয়া ফেলিতে পারিবনা, অথচ ইহাকে ছোট করিব কিরূপে?"

ধীমান্ বীরবল ইতস্ততঃ না করিয়া উহার পার্শ্বেই বড় করিয়া একটী রেখা টানিয়া দিলেন, পূর্ব্বের রেখাটী ছোট হইয়া পড়িল। হিন্দু যদি মুসলমান হইতে প্রভাবশালী হইতে চায়, তবে যেন মুসলমান হইতে অধিক গুণ অর্জ্জন করিবার দিকেই তাহার প্রবৃত্তি যায়, মুসলমানের অনিষ্ট করিতে রত না হয়। মুসলমান যদি হিন্দু

(১) তিন কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরু গোবিন্দ সিংহ – P.300

হইতে বড় হইতে চায়, তবে যেন নিজে বড় হইয়াই তাহা হয়, হিন্দুকে ছোট করিয়া বড় না হয়। পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট করিতে থাকিলে, তাহারা উভয়েই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, পরিশেষে উভয়েই একসঙ্গে ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। যে শক্তি বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণে ব্যয়িত হইত পারিত, তাহার অপপ্রয়োগ নিজের পায়ে কুড়াল মারা। এক বাহুদ্বারা অপর বাহুকে আঘাত করিতে থাকিলে তাহাতে নিজের ক্ষতি, অপরের লাভ। ইহাকে রাজনৈতিক আত্মহত্যা বলা যাইতে পারে। মুসলমান যদি গোহত্যা করিয়া হিন্দুর মনে কষ্ট দেয়ও, তথাপি হিন্দুর পক্ষে প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত হইবেনা।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি
লোভোপহত চেতসঃ।
কুলক্ষয় কৃতং দোষং
মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥
কথং নং জ্ঞেয় মস্মাভিঃ
পাপাদস্মান্ নিবর্ত্তিতুম।
কুলক্ষয় কৃত দোষং
প্রপশ্যদ্‌ভির্জনার্দ্দন॥

গীতা-১-৩৮

রাষ্ট্রশক্তির হানি যাহাতে হয় মুসলমানগণ লোভ মোহবশতঃ যদি তেমন কার্য্য করেও, তথাপি রাষ্ট্র শক্তি হানির কুফল যাহারা বুঝিতে পারি, এমন আমরা কেন সেরূপ পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিব না?

লোক-সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রও যেমন, ধর্ম্মচক্রও তেমন আর একটী সংস্থা। মনুষ্য জাতির ঐক্য সম্পাদনই উভয়ের উদ্দেশ্য। ইহারা পরস্পরের অনুযোগী—প্রতিযোগী নহে। এ বিষয়ে পরিস্ফুট ধারণা

যাহার নাই, তাহারাই এই উভয় সংস্থার মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া মনুষ্যের জীবনকে বিষময় করিয়া তুলে। জিজিয়া সমর্থক আরংজেব-সদৃশ মুসলমানই এ বিষয়ে প্রধান দোষী। মুসলমানের গুণ গুলি রক্ষা করিয়া দোষ গুলি পরিহার করিবার উপায় দেখাইয়া দিয়া, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের বিবাদের যে সমাধান গুরু গোবিন্দ করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য মানব সমাজ গুরু গোবিন্দের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মানব জাতির ঐক্য সাধন গুরু গোবিন্দের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজনীতির ও ধর্ম্ম নীতির বিবাদ দূর করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। বিবদমান বৈদিক শাখাদ্বয় হিন্দু ও পার্শীর সমন্বয় দ্বারা মানব জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ তিনি প্রশস্ত করিয়াছেন। রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্রের বাণী তাহাতেই সার্থক হইয়াছে। ভার্গব বেদের বিলোপ দ্বারা বেদের যে অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল গুরুগোবিন্দ তাহা পূরণ করেন —বেদ উদ্ধার করেন।

গুরুগোবিন্দ পারসিক কৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তুকুল ও কঞ্চুক (পায়জামা ও আচকান) পরিধান করিতেন, বর্ণভেদ মানিতেন না, সাকারোপাসনার সমর্থন করিতেন না, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ভারতীয় কৃষ্টি পরিত্যাগ করেন নাই। ভারতীয় সাধনার একটী বিশিষ্ট তত্ত্ব যে অবতারবাদ তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল।

যব যব হোত অরিষ্ট অপারা।
তব তব দেহ ধরত অবতারা॥

গীত-গোবিন্দ (চৌবিশ অবতার)

যখন যখন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন অবতার দেহ ধারণ করেন। (১)

---

(১) যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

গীতা—৪-৭

তিনি পর্শু-রাম (জরথুস্ত্র), রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে, অবতার বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। বেদের প্রচারক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়াছেন।

বেদ বনায়া কহো
সন্ত সহায়া কহো
মূরকে মারায়া কহো
পাঞ্চজনকী বাজায়া হৈ ॥
অকালস্তুত।

আর ধর্ম্মের বেদমূলকত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মা চারহি বেদ বনায়ে।
সর্ব্ব লোক তিহ করম চলায়ে ॥

গুরু গোবিন্দ — বিচিত্র নাটক

বেদ কোরক, গীতা প্রস্ফুটিত কুসুম, আর গীতগোবিন্দ উহার শাকম্ভর ফল। কোরকের পরিণতি কুসুম আর কসুমের পরিণতি ফল। একে তিন, তিনে এক। যে ব্যক্তি বেদ ত্যাগ করিয়াছে, সে গীতগোবিন্দের মহিমা বুঝিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি গীতগোবিন্দ ত্যাগ করে, সে বেদের ফল লাভ করিবে না।

বেদ ও গ্রন্থশেবের মূলতত্ত্ব আবার গীতায়। গীতাকে সমাজ গঠনে নিয়োগ করিয়া, গীতার আদর্শে একটী সম্প্রদায় গড়িয়া তোলাই গোবিন্দ সিংহের শ্রেষ্ঠ অবদান।

শিখের জীবনের আদর্শ গীতার মধ্যেই নিহিত। গীতাই তাহাকে বাচিবার শক্তি ও মরিবার সাহস দিবে। শান্তি-পুষ্টি-অভ্যুদয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মেই সে গীতার মন্ত্র স্মরণ করিবে। গীতার মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি তিনি করিয়াছেন, গোবিন্দ সিংহ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

দশম কথা ভগবদ্‌তকী
ভাষা করি বানায়ি।
অপর বাসনা নাহি প্রভু
ধর্ম্ম যুদ্ধ চায়ি॥

গীতগোবিন্দ—কৃষ্ণাবতার।

ভগবানের সার্ব্বজনীন বাণীই আমি লৌকিকভাষায় প্রচার করিয়াছি। হে প্রভু, আমার অন্য কোনও বাসনা নাই, আমি কেবল ধর্ম্মযুদ্ধই চাই।

হিন্দু-পার্শীর সম্মিলনেব দ্বারা ও সম্মিলনের জন্য সমুদ্ভূত শিখ-সিংহ গীতার জীবনই যাপন করে। গীতাই বেদান্তের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আর কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানরূপ যোগ-ত্রয়াত্মক বেদান্ত-তন্ত্রই ধর্ম্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা। যে কোনও ধর্ম্মতন্ত্রই বেদান্ত হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারে।

ইহুদি-ইসাহি-ইসলামাত্মক সেমিতিক পন্থাত্রয় যে শ্রেয়সের আশ্বাস দিয়া থাকে, বেদান্ত তাহা প্রদানে অক্ষম নয়। পরং ধর্ম্মের পরিপূর্ণরূপ, একমাত্র বেদান্তেই সুপ্রকট। বেদান্ত না জানিলে যোগত্রয়েব পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় না। অতএব কোনও তন্ত্রের সহিত তন্ত্রান্তরের যে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহার সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না। বেদান্তে বিচক্ষণতা না থাকিলে, কোনও ধর্ম্মতন্ত্র হইতেই উহার চরম সার্থকতা আদায় করিতে-পারা যায় না।

আরাধিতো যদি হরিস্ তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্ তপসা ততঃ কিম্॥

হরির আরাধনা করিলে অন্য তপস্যার কী প্রয়োজন? আর হরির আরাধনা না করিলে অন্য তপস্যায় কী ফল?

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

বেদান্তপঞ্চক জানা থাকিলে তোরা-ইঞ্জিল-কোরাণের প্রয়োজন কী? আব বেদান্তপঞ্চক না জানিলে তোরা-ইঞ্জিল-কোরাণ দ্বারা লাভ কী?

পুণ্যভূমি সপ্তসিন্ধুদেশে এই বেদান্ততন্ত্রের আবির্ভাব হয়। ভারতীয় আঙ্গিরসগণ ও ইরাণীয় ভার্গবগণ উহার বাম ও দক্ষিণ অঙ্গস্বরূপ। বেদান্ততন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বৈদিক ঋষি আত্মহারা হইয়া গাহিয়াছেন--

চত্বারি শৃঙ্গাস্ ত্রয়ো অ স্য পাদাঃ,
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসঃ অস্য।
ত্রেধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি,
মহান্ ভর্গঃ মর্ত্ত্যান্ আবিবেশ ॥

ঋগ্বেদ ৪-৫৮-৩

জ্ঞানযোগের বর্ধমান, কর্ম্মযোগের গৌতম, আর ভক্তিযোগের যুগল অবতার রামচন্দ্র ও জরথুশ্ত্র, এই চারিজন তীর্থঙ্কর বেদান্তের চারিটী শৃঙ্গস্বরূপ। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, এই তিনটী মার্গ ইহার তিনটী চরণসদৃশ। ভারতীয় ও পারসিক, এই দুইটি কৃষ্টি ইহার দুইটী মস্তক। সপ্তসিন্ধুর সপ্তশাখা ইহার সপ্তবাহুসদৃশ। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকাল জুড়িয়া ইনি অবস্থিত। বৃষভগর্জ্জনের ন্যায় ওজস্বান্, গীতার পাঞ্চজন্য, বেদান্তের বাণীকে বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ মানবকে শক্তি ও শান্তি দান করুক।

যদ্ ইহাস্তি তদ্ অন্যত্র যন্ নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।

মহাভারত ১-২-৩৯০

বিশ্বের উদ্ধারের জন্য গণধর গুরুগোবিন্দ এই তীর্থঙ্কর-পঞ্চকের প্রতিকৃতি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। ইহাদের প্রত্যেকে এক একটী বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ। গৌতম ও বর্ধমান উভয়েই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। এ বিষয়ে ইহারা উভয়েই

গার্হস্থ্যাশ্রমাবলম্বী রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র হইতে পৃথক্। কিন্তু গৌতম ও বর্ধমানের মধ্যেও পরস্পর পার্থক্য কম স্ফুট নহে। গৌতম বানপ্রস্থ যতি। আর বর্ধমান ভিক্ষু সন্ন্যাসী। গৌতম মঠে বাস করেন, আর বর্ধমান অনির্দ্দিষ্ট অরণ্যে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ান। গৌতম আত্মশক্তি বিকাশার্থে ধ্যানের সুবিধার জন্য নির্জনে থাকেন, কিন্তু লোকোপকারের জন্য সর্ব্বদাই লোকালয়ে আসেন। বর্ধমান লোকসমাজের ধার ধারেন না। লোকালয়ে আসেন বলিয়া গৌতমের পরিচ্ছদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহা অনাড়ম্বর 'ঢলা পরিচ্ছদ—(ক) কৌপীন ও (খ) নিচোল। ১) চীবর (লেঙটি) ব্যতীত কোনও পরিধানের প্রয়োজন বর্ধমানের নাই। গৌতম শ্মশ্রু-গুম্ফ-কেশ মুণ্ডিত করেন, বর্ধমান ক্ষুরের ব্যবহার করেন না। গৌতম লোকহিতের জন্য ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, লোকোপকারের জন্য উত্‌সুক হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছেন। বর্ধমান নিমীলিত লোচনে আত্মচিন্তায় মগ্ন। বেলুড় মঠের যতি, আর বদরিকাশ্রমের নাগা সন্ন্যাসীর তুলনা করিলেই, এই উভয়ের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র উভয়েই গৃহস্থ, উভয়েই ক্ষত্রিয়, রাজন্য। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য কেবল অল্প নয়। রামচন্দ্র মুক্ত-পদ্মাসনে উপবিষ্ট, জরথুস্ত্র বীরাসনে বসিয়া আছেন। রামচন্দ্রের পরিধানে সীবন-রহিত পরিচ্ছদ—শাট (ধুতি) ও পট (চাদর)। জরথুস্ত্রের পরিধানে দেহের ভঙ্গি অনুসারে কাটা ছাটা পরিচ্ছদ——দুকুল (পায়জামা) ও কঞ্চুক (আচকান্)। রামচন্দ্রের মস্তকে মুকুট (hat) আর জরথুস্ত্রের মস্তকে কিরীট (cap)। রামচন্দ্রের বর্ণ শ্যাম আর জরথুস্ত্রের বর্ণ শ্বেত। রামচন্দ্র আছেন পূবে আর

(১) কৌপীন—যাহা কুপের মত আকৃতি বিশিষ্ট। লুঙ্গি নামে পরিচিত। নিচোল—ঢোলা আলখিল্লা।

জরথুস্ত্র আছেন পশ্চিমে। হিন্দু ও পার্শীর পার্থক্য ইহাদের মধ্যে প্রতিভাত।

আর যাহার দেহের বর্ণ নব জলধরের কথা মনে করাইয়া দেয়, যাহার অধরে মুরলী, মাথায় শিখিপুচ্ছ, গলায় বনফুলের মালা, যিনি পীতধটী পরেন, ত্রিভঙ্গিমঠামে দাঁড়ান, আর নাগের মাথায় নৃত্য করেন, সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ যাঁহাতে, তাঁহার অনন্যসাধারণত্বের কথা কি আর খুলিয়া বলিতে হয়। যতদিন মানুষের সৌন্দর্য্য বোধ আছে, যতদিন সে কুন্থ-কিঞ্চোলকের মত নিরিন্দ্রিয়, অথবা জড়োন্মত্তপিশাচবত্ অরসিক হইয়া না যায়, ততদিন হৃষীকেশ কেশবের মদনমনোহরবেশ মানুষের চিত্তবসন অপহরণ করিয়া লইবেই। যিনি আর্য্যকৃষ্টির কেন্দ্রস্থল, গিরির মত বিপুল আর্য্যকৃষ্টি যিনি অবলীলাক্রমে হস্তে ধারণ করিয়া আছেন, সেই পুরুষোত্তম বাসুদেবের সৌন্দর্য্যবর্ণনার নিষ্ফল প্রয়াস গুরুগোবিন্দ করেন নাই। কেবল তাহারই পাঞ্চজন্য আবার মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহার দশম (সার্ব্বজনীন) বাণী, আবার দশজনকে শুনাইয়া দিয়াছেন।

দশম কথা ভগবত্ কী
ভাষা করি বনায়ি।
অপর বাসনা নাহি প্রভু
ধর্ম্মযুদ্ধ চায়ি॥

ভগবানের সার্ব্বজনীন বাণীই আমি লৌকিক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছি। কারণ আর্য্যজাতিকে ধর্ম্ম-যুদ্ধে উৎসাহিত করাই আমার একমাত্র বাসনা।

পাঞ্চজন্যের তুমুল নির্ঘোষ গুরুগোবিন্দের মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়াও, যাহাকে জাগরিত করিতে পারে না, সে নিদ্রিত নহে, সে মৃত।

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

মানুষের জীবনের কর্ম্মগুলি ত্রেধা-বিভক্ত—ব্যক্তিগত জীবনের কর্ম্ম, জাতীয় জীবনের কর্ম্ম, ও আন্তর্জ্জাতিক জীবনের কর্ম্ম। বর্দ্ধমান ব্যক্তিগত জীবন লইয়া ব্যাপৃত, রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র জাতীয়তার প্রতিনিধি, গৌতম আন্তর্জাতিকতার আদর্শ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির অভ্যুদয় পরস্পর সাপেক্ষ। ব্যষ্টির অভ্যুদয় ছাড়া সমষ্টির অভ্যুদয় হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা সমষ্টির কল্যাণকেই (Greatest Good of the greatest number) জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাও ব্যষ্টির কল্যাণকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অপর পক্ষে সমষ্টিই ব্যষ্টির পরিপার্শ্ব। প্রতিবেশের উৎকর্ষ বিনা ব্যষ্টির উৎকর্ষ সম্ভবপর নয়। নরখাদক আষ্ট্রেলিয়দিগের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর মত মহাপুরুষের আবির্ভাব অসম্ভাবিত। অতএব যাহারা ব্যক্তির পরিপূর্ণতাকেই (perfection of the Individual) জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাও সমষ্টির কল্যাণকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির উৎকর্ষ পরস্পর সাপেক্ষ বিধায়, ব্যক্তিগত জীবনের সহিত জাতীর জীবনের কিম্বা জাতীয় জীবনের সহিত আন্তর্জ্জাতিক জীবনের প্রকৃত বিরোধ নাই। তবে জাতীয় স্বার্থের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থকে, কিঞ্চ আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থের নিকট জাতীয় স্বার্থকে বলি দেওয়াই আত্মবিকাশের নিয়ম। নতুবা মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয় না— মানুষ যাহা হইতে পারিত তাহা হইতে পারে না।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখম্ অস্তি।

ছান্দোগ্য উপনিষত্।

আন্তর্জ্জাতিক জীবনই বরিষ্ঠ জীবন। কিন্তু সর্ব্বময় বিশ্বমানবতায় পৌঁছিতে হইলে জাতীয়তার ভিতর দিয়াই পৌঁছিতে হয়। যে নিজের জাতিকেই ভালবাসিতে জানে না, সে বিশ্বের সকল জাতিকে

ভালবাসিবে ইহা সম্ভবপর নয়। আজ এই জাতীয়তার যুগে, আর্য্যজাতীয়তার যুগল আদর্শ, তীর্থঙ্কর ধর্ম্মরাজ বেন **রামচন্দ্র ও ঋভু জরথুস্ত্রকে** নমস্কার করিয়া, আসুন আমরা ধন্য হই।

নারায়ণং জরথুস্ত্রং রামভদ্রম্ নরোত্তমম্।
অথর্ব্বানৌ নমস্কৃত্য ততো জয়ম্ উদীরয়েৎ ॥

ওঁ সত্ রুদ্র অকাল।



গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত :—

Prof. Devendra Kumar Banerjee, M.A.

Chittagong College. The 10th.

December, 1932.

Your book embodies a scholarly and masterly assimilation of the principles of the Vedic and the Islamic or rather the Avestan Cults and brings out into prominence the delicious truth that the Islamic and the Vedic religions being fundamentally the same, the brotherly and natural relation between the followers of Rama Chandra and Zarathushtra should be re-established and the deplorable and deep-seated antagonism between the bigoted Hindus and Muhammadans brought about only by parasitical accretions of ages should be annihilated root and branch, and proper fraternal feeling restored as between an Indian and an Indian.

Your book will be hailed with delight by all lovers of humanity. It deserves wide circulation and sincere appreciation among the Muhammadans and the Hindus alike.

Sd/-Devendra Kumar Banerjee.

Babu Jnan Chandra Banerjee,

of the Board of Review, "Modern Review."

Darjeeling, 10-10-1932.

"The author's sentences are clear-cut and cryptic, and though pregnant with meaning, require amplification in order to be intelligible to the ordinary reader—so much by way of comment.

What has impressed me profoundly is the author's deep-learning, in the bye-paths of Persian, Islamic and Zoroastrian literature—which are generally taboo to the educated Bengali Hindu. A real *entente cordiale* between Hinduism and Islam is only possible through finding out a common meeting-place for their opposed cultures, as the author has clearly shown. Indeed, his ideas are all up-to-date, and remarkably free from the taint of orthodoxy, and his analysis of the mutual relation between Islam and Hinduism, between the Semitic and Aryan cultures, and between nationalism and internationalism shows a keen insight. Every proposition enunciated by the author has been supported by authority—which greatly enhances the value of the book".

Sd/- Jnan Chandra Banerjee.
10.-10-32.

সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক,—শ্রীযুক্ত শ্রীধর মজুমদার, এম এ,

Rampurhat. (Birbhum)

Bengal, India.

Dated-15. 1. 1932.

I thank you very much that you have presented me a copy of your "Rama Chandra and Zarathushtra." I have gone through the whole book with much interest both religious and social. The book has given ample proof of your vast erudition regarding the principal religions of the world. Cry for unity has been raised from every quarter, and your book has made an intelligent solution to help such unity.

Sd/-Sridhar Majumdar.

Babu Kalipada Maitra.

Additional Chief Presidency Magistrate

Munshiganj. (Dacca)

19. 1. 33.

Ever so many thanks for your nice little book "Rama Chandra and Zarathushtra" which you have so kindly sent to me. I quite see that the Arabic culture is born of the Persian culture which again owes its origin to the old Aryan and the Vedic culture. It is quite easy to argue on paper that all roads lead to Rome or that the underlying or the basic principle of theology is the same. But it is now almost a counsel of despair to convince the militants to sink their own petty and personal differences and to work for a common ideal—an ideal of a fusion of Vedic and Islamic culture. If your book can be of any help to open the eyes of the contending races to sink their petty and personal differences, your name will be handed down to posterity as a man who meant peace and wanted peace and paved the way to it. May you prosper and help in the recon-ciliation of factions apparently irreconcilable.

Sd/-Kali pada Maitra.

সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ঃ—

Rajbari.

26. 1. 33.

The exposition is masterly, clear and convincing. The conclusions are broad-based on a wide and liberal outlook of life and things in general. Unquestionably your booklet has thrown a flood of light on the question of Indian nationalism from a new angle of vision. I have gone through it with great pleasure, and, I must acknowledge, with profit.

Sd/- Jogesh Chandra Choudhuri.

Babu Satish Chandra Ghosh,

Retired Deputy Magistrate.

Bogra.

23. 10. 32.

The book was an agreeable surprise to me. I am indeed very glad to read your book and to see learned and original ideas in it. You have opened by it a new field for thought and study and your idea of bringing harmony between the Hindus and Mussalmans by a study of the common culture of the two is surely a good one

Sd/- Satish Chandra Ghosh.

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার :—

Suri, (Birbhum.)

The 12th December, 1932

My dear Jatindra Babu,

My best thanks are due to you for the kind gift of your book, "Rama Chandra and Zarathushtra." As a humble member of the service I cannot help being proud of such erudition in a brother officer and I congratulate you most heartily on your scholarly work.

Yours sincerely,

Sd/- G. D. Sarkar.

Babu Gopeswar Banerjee,

Retd. Sessions Judge.

Jessore.

28. 9. 32.

It is a scholarly book, thoughtful and well-written ; and shows your deep erudition.

Sd/-Gopeswar Banerjee.

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ—১৩৪১

হিন্দুর অবতার রামচন্দ্র ও ইরাণীয় ধর্ম্মগুরু জরথুষ্ট্র এবং তাহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমতের বিস্তৃত আলোচনাই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে জরথুষ্ট্র মতবাদের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মমতের সম্বন্ধ—বিশেষ করিয়া ইসলাম মতের সহিত জরথুষ্ট্র মতের অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধ, এবং সেই সূত্রে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা—এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া হিন্দুর ও মুসলমানের পরস্পর বিরোধ দূর করিবার সহায়তা করা গ্রন্থকারের এই গ্রন্থ প্রণয়নের অন্যতম সাধু উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের সমস্ত মত ও ব্যাখ্যার সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও গ্রন্থখানিকে আমরা আন্তরিক ভাবে প্রশংসা করি। ইহা গ্রন্থকারের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। হিন্দু মুসলমান ও ইরাণীয় ধর্ম্মসাহিত্য তিনি তুল্য ভাবে আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে আলোচ্য বিষয় নির্দ্দেশক পংক্তি এবং তাহার একটী বিস্তৃত সূচী সংযোজিত হইলে পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইত।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

গৌড় দূত—১৭ই আষাঢ়—১৩৪০

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, লিখিত "রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্র" শীর্ষক একখণ্ড পুস্তিকা পাঠ করিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইলাম। তাঁহার জ্ঞান গভীরতা, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা এবং দূর দর্শনের সুখ্যাতি সঙ্কোচ অসম্ভব।

* * * * *

পণ্ডিত যতীন্দ্র মোহনের সিদ্ধান্ত জেন্দাভেস্তা বেদেরই এক ধারা। তাঁহার মতে বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, পারশ্য প্রভৃতি স্থান পাঞ্জাবের ন্যায় ভারতবর্ষেরই অংশ গণ্য হইত। বর্ত্তমান রাজনৈতিক সীমার কোনও মূল্য নাই। Aryans ও Iranians একই জাতি।

যতীন্দ্রবাবু ইক্ষ্বাকু হইতে যেমন সূর্য্যবংশ, ইলা হইতে যেমন চন্দ্র বংশ তেমন যম হইতে অগ্নি বংশের উদ্ভব নির্দ্দেশ করিয়া উহার ২৭ পর্য্যায়ে মনুশ্রী ও ৪১ পর্য্যায়ে জরথুষ্ট্র এরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সুপণ্ডিত যতীন্দ্রবাবুর যুক্তিগুলি যা তা রকমের নহে এবং উপেক্ষা করিতে গেলে অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। জ্ঞাত হইলাম যতীন্দ্রবাবু "The Ethical Conceptions of the Gatha" নাম দিয়া আরো একখানি বড় বই লিখিয়াছেন এবং তাহাতে জরথুষ্ট্রের গাথার সহিত বৈদিক সূত্র গুলির অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রমাণ ও উক্তিগুলি যে আদৌ কষ্টকল্পিত নহে, ইহাই বিশেষ আনন্দের কথা। যতীন্দ্রবাবু তাঁহার এস স্ত লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া পরীক্ষা করাইতে পারেন। আজ ৺ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের কথাই বারে বারে মনে হয়।

হিন্দু মিশন-১৩৩৯-পৃঃ-১৬৭

গ্রন্থকারের মত এই যে অথর্ব্ব বেদের একটী শাখার প্রকাশক ঋষি রামচন্দ্রের ন্যায় পারসীক ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা জরথুস্ত্র অথর্ব্ব বেদেরই একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। গ্রন্থকারের বিশ্বাস এই জরথুস্ত্র প্রচারিত পারসীক ধর্ম্মালোচনার ফলে হিন্দু মুসলমানের মিলন হওয়া সম্ভবপর।

* * * * * * * *

আমরা গ্রন্থকারের জরথুস্ত্র প্রচারিত ধর্ম্মালোচনার উদ্যমের যথেষ্ট প্রশংসা করি। অগ্নিযজ্ঞকারক অসুরোপাসক পারসীকগণের সহিত পূর্ব্বে হিন্দুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ছিল। হিন্দু স্বীয় ঔদাসীন্যে তাহা হারাইয়াছে। এই দিক দিয়া হিন্দুর চিন্তা করিবার ও কাজ করিবার অনেক বিষয়ই আছে। আশা করি বর্ত্তমান উদ্যমশীল হিন্দু এদিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন। বিষয়ের গুরুত্ব এবং পুস্তকের আকারের তুলনায় মূল্য নাম মাত্রই হইয়াছে। সম্ভবতঃ অধিক প্রচারোদ্দেশ্যেই অল্পমূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু।

"বিশ্বকোষ কার্য্যালয়"

৮৩৯, বিশ্বকোষ লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা।

৬।১।৩৫

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন—

মহাশয়ের কার্ড ও সেই সঙ্গে "রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্র" পুস্তিকা পাইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। বাস্তবিক আপনার গবেষণা ও আলোচনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। প্রাচীন পারসিক ও বৈদিক আর্য্য সমাজ সম্বন্ধে এরূপ ভাবে দার্শনিক আলোচনা পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। এরূপ গ্রন্থের বহু প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ বাহির হইতেছে। এই জাতীয় গ্রন্থে আপনার ন্যায় দার্শনিকের আনুকূল্য প্রার্থনা করি। অকারাদি বর্ণানুক্রমে আপনার অভীপ্সিত শব্দ লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বিশ্বকোষে আপনার নামেই প্রকাশিত হইবে।

বিনীত

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু।

কলিকাতা

৪।৫।৩৩

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত বলেন—

আপনার "রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্র" একখণ্ড উপহার পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনও অভিমত লিখি নাই। পারসিকেরা যাহাকে Zend বলিতেন, আমার বিশ্বাস বেদে তাহার প্রতিশব্দ 'ছন্দস্'। এই ছন্দস্ সমূহ (ছন্দাংসি) পরবর্ত্তী-কালে অথর্ব্ববেদে রক্ষিত হইয়াছিল। আপনার গ্রন্থে এই মতের সমর্থন পাইলাম এবং জরথুষ্ট্র যে অথর্ব্বা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, তাহা ও জানিতে পারিলাম। আপনার গ্রন্থে কয়েকটি নূতন কথা

পাইলাম। যদি ও সকল কথার সহিত আমি একমত নহি, কিন্তু আপনার গবেষণা প্রশংসনীয়। আশা করি আপনি এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

৺ কাশী ধাম

৭৫, পীতাম্বর পুরা

২।৩.৩৩

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ—

এই পুস্তকখানিতে আপনার বহুবিস্তৃত শাস্ত্রালোচনা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর গবেষণা ও সুযুক্তি পূর্ণ বিষয়ের পরিচয় পাইয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি সরকারী কার্য্য করিয়া এত গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় পা'ন কি রূপে? আর এ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে রীতিমত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আপনি আমাদের সার্বিসের গৌরব বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আপনার এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য খুব মহৎ সন্দেহ নাই। হিগেলের দর্শন শাস্ত্রে একটি বিষয়ের Thesis ও Antithesis, তাহার synthesis এ গিয়া সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়। আপনি সেইরূপে জরথুস্ত্র বা পার্সিকতন্ত্রকে বৈদিক তন্ত্র ও ইসলামতন্ত্রের synthesis অর্থাৎ সামঞ্জস্য ক্ষেত্ররূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আপনার অভিপ্রায় এই, হিন্দু ও মুসলমান যদি পারসিক কৃষ্টির আলোচনা করে ও তাহাদের নিজ ধর্ম্মের গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া পারসিক ধর্ম্ম অংশতঃ গ্রহণ করে, তবে উভয়ের মধ্যে বিরোধ তিরোহিত হইবে ও উভয় জাতি প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ঘটিবে কি?

ভবদীয়

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহ।

উয়ারী, ঢাকা

১৮-১১-৩৩

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র নাগ—

আপনার গ্রন্থ "রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র" পাইয়া, অতি আনন্দের সহিত তাহা পড়িয়াছি। আপনি বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে একটা নূতন আলোক আনিয়াছেন। আমার মত অনেক বাঙ্গালীই পার্শীধর্ম্ম অথবা জরথুষ্ট্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। বেদান্ত মিশ্রিত হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার এতদূর সাদৃশ্য তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আপনার গবেষণা (research) দেখিয়া প্রীত এবং বিস্মিত হইলাম। আপনি জগতে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি অনেকই আলোচনা করিয়া একরকম Comparative theology, study করিয়াছেন। এই সমস্ত ধর্ম্মই আর্য্যজাতির প্রধান ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম ও পার্শিক ধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই Communal অশান্তির সময় শান্তচিত্তে আপনার বইখানা পাঠ করিলে সাম্যমৈত্রীর পথ কিছু প্রশস্ত হইতে পারে আমার মনে এরূপ আশা হয়। ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ যোগ সাধনের ইঙ্গিত আছে। যাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে একটু চিন্তা করেন, তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই আদৃত হইবে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র নাগ।

১১৫ এ, ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীট

কলিকাতা ; ১৯-১-৩৩

ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :-

আপনার পুস্তিকা পাইয়া আনন্দিত হইলাম, তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলাম। আপনি জ্ঞানী ও বিদ্বান জানিতাম, কিন্তু আপনার জ্ঞান ও গবেষণা এত দূরগামী ও গভীর, তাহা ধারণা ছিলনা। আপনার লেখনী সার্থক হউক।

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গুরু-গ্রন্থ মালা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ক—বেদ

১। বৈদিক গীতা

বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চারিশত ঋক্, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের ক্রম অনুযায়ী সংগৃহীত, আর প্রতি তিথিতে পাঠের সুবিধার জন্য পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। বৈদিক ভাষায় প্রার্থনা নিষ্পন্ন করিবার শ্রেষ্ঠ পুস্তক। আহ্নিক সন্ধ্যাপাসনায় অপরিহার্য্য—উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারিকে দিবার জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। দেবনাগর অক্ষরে মূল, আর সঙ্গে ইংরেজী অনুবাদ। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান সমর্থভারত প্রেস
৯৪৭নং সদাশিব পেঠ, পুণা—২
পোঃ—পুণা

খ—অথর্ব্ব-বেদ

২। পৃশ্নি-গাথা

সাকার-পূজা প্রবর্ত্তক ভগবান রামচন্দ্র, ও নিরাকার পূজা প্রবর্ত্তক মঘবান জরথুস্ত্রের শ্রীমুখের বাণী। অথর্ব্ববেদের সারসর্ব্বস্ব। ভারতের ও ইরাণের প্রাচীনতম জাতীয় গ্রন্থ। দেবনাগর অক্ষরে মূল আর সঙ্গে ইংরেজী অনুবাদ। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— চেরাগ অফিস, দফগর বাট
পোঃ— নবসারি (বোম্বাই)

৩। গাথা

ইরাণের ধর্ম্মগুরু মঘবান জরথুস্ত্রের বাণী। ভার্গব বেদের বীজ মন্ত্র। দেবনাগর অক্ষরে মূল, সংস্কৃত অন্বয়, পাণিনির সূত্র দ্বারা শব্দ সাধন, ইংরেজী ও গুজরাতী অনুবাদ সম্বলিত। ধর্ম্মপিপাসু-দিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে সকল ছাত্র জেন্দভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চান, কিম্বা যে সকল সাহিত্যিক সাদি ও হাফেজের

ভাব ও ভাষার উত্স কোথায় তাহা জানিতে চান, তাহারা এই গ্রন্থ হইতে বিলক্ষণ সাহায্য পাইবেন। মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—চেরাগ অফিস, দফগর বাট
পোঃ—নবসারি (বোম্বাই)

গ—পুরাণ

৪। পঞ্চদশী-গীতা

অর্থাৎ প্রতি তিথিতে পাঠের জন্য পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীতা। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত হইয়াছে বলিয়া শ্লোকগুলির মর্ম্ম বুঝিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় না। মহাভারতের সকল অধ্যায় হইতেই বাসুদেবের বাণী সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতে সমগ্র মহাভারত পাঠের ফল লাভ করা যায়। মধ্যে মধ্যে অপেক্ষিত বৈদিক ঋক্ সংকলন করিয়া দেওয়াতে বেদের সহিত গীতার সম্পর্ক আর খুলিয়া বলিয়া দিতে হয় না। গীতা পাঠার্থীর পক্ষে অপ্রত্যাশিত, অপূর্ব্ব, অপরিহার্য্য পুস্তক। দেবনাগর অক্ষরে মূল, ইংরেজী অনুবাদ, ও ইংরেজী ব্যাখ্যা সম্বলিত, নয়শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত ভূমিকা সংযুক্ত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—সমর্থ ভারত প্রেস
৯৪৭নং সদাশিব পেঠ, পুণা—২
পোঃ—পুণা (বোম্বাই)

ঘ—পিটক

৫। ধর্ম্মপদম্ (খুদ্দক-পাঠ সহকৃত)

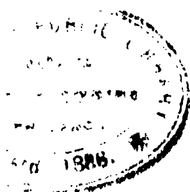
তথাগত গৌতম বুদ্ধের বাণী। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রতি তিথিতে পাঠের সুবিধার জন্য ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

[সংকলনস্থ]

৬। মূলসূত্রম্

মহাবীর বর্ধমান জিনের বাণী। জৈন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রতি তিথিতে পাঠের সুবিধার জন্য ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

[সংকলনস্থ]



ঙ—আগম

৭। গীত-গোবিন্দম্

অথবা গুরু গোবিন্দ সিংহের গীতা। এই গ্রন্থই নবজীবন দান করিয়া হিন্দু ও পার্শীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে, ও করিবে। দেবনাগর অক্ষরে মূল ও ইংরেজী অনুবাদ। মূল্য চারি আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থীজগত্-সুধার গুরুদ্বার
রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।

গ্রন্থকার রচিত অন্য পুস্তক

1. Ethical Conceptions of the Gatha.

পার্শীতন্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটনের জন্য শ্রেষ্ঠ সহায়ক। ডাক্তার ভগবানদাস লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে সমাদৃত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—জে বি করাণীস্ সন্স
২১০—২১ বড় বাজার। বোম্বাই ফোর্ট, বোম্বাই।

2. রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র

হিন্দু, পার্শী ও শিখতন্ত্রের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের অপূর্ব্ব পন্থা। জাতীয়তাবাদীর আদরের বস্তু। মূল্য দশ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান (১) আদিম গুরুদ্বার
সঙ্গত টোলা, ঢাকা।
(২) কো-অপারেটিভ্ বুক ডিপো
আশুতোষ বিল্ডিং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(৩) আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা।
(৪) ইণ্ডিয়ান বুক সোসাইটী
৫নং পাটুয়াটুলী, ঢাকা।